বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী

ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা

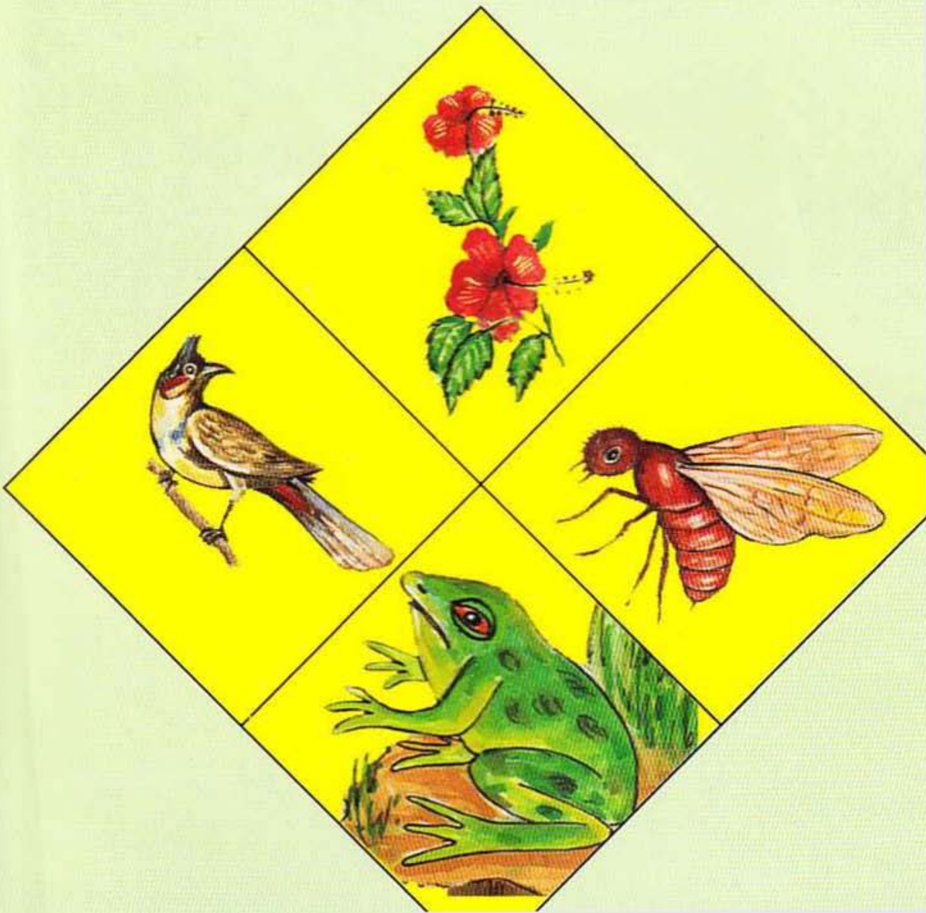

বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী

ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা

[ডি. এস-সি. (লন্ডন); ডি. আই. সি. (লন্ডন); পি. আর. এস;
মোয়াত্ মেডালিস্ট; এম. এস-সি.; গোল্ড মেডালিস্ট]

"বিশ্বপ্রভু (জ্ঞানের রাজা)
দান করে যান ইচ্ছামত
সেই সে পরমকল্যাণীয়,
জ্ঞানভারে যে হ'ল নত।"

—পবিত্র কোরান

"ধ্যানই হ'ল বিশ্বমাঝে
সুপবিত্র সবার চেয়ে
জ্ঞানীর ইহাই কাম্য প্রেয়
চায় সে হ'তে ধ্যানের নেয়ে।"

—উপনিষদ

পড়ুয়া

বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী

ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা

গ্রন্থস্বত্ব	লেখক
প্রথমপ্রকাশ	১৯৩৯
পড়ুয়া সংস্করণ	শ্রাবণ, ১৪১১/জুলাই, ২০০৪
প্রকাশক	কবির আহমেদ পড়ুয়া, ৪৫ আজিজ সুপার মার্কেট (নিচতলা) শাহবাগ ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ৮৬২১৭৬৬
প্রচ্ছদ	আনওয়ার ফারুক
মূল্য	একশো টাকা
ISBN	984-8141-50-2

উৎসর্গ

জীবনপ্রভাতে যে মহান চরিত্রের উন্নত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া,
যাঁহার আদেশক্রমে বিজ্ঞান সাধনায় রত হই,
সেই মহর্ষি, দেবোপম, পিতৃদেব মর্‌হুম
ও মগফুরের পবিত্র চরণোদ্দেশ্যে
এই ক্ষুদ্র পুস্তক উৎসর্গ
করিলাম।

ভূমিকা

শিক্ষার সম্পূর্ণতা ততদিন হইতে পারে না, যতদিন সে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা না হয়। আমাদের অন্যান্য শিক্ষা মাতৃভাষার মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইলেও, এতদিন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার সুযোগ হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয় মাতৃভাষার মধ্য দিয়া সুসম্পন্ন করিতে নির্দেশ দিয়া দেশের যে প্রভূত কল্যাণ এবং জাতির যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়, এই জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার সুযোগ তো পাওয়া গেল। কিন্তু বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাববশতঃ এই কার্য দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। সকল কথার বাংলা প্রতিশব্দ প্রস্তুত করা সম্ভবপর নহে, পাশ্চাত্য দেশেও দেখা গিয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিভিন্ন দেশে প্রায়ই অনুরূপ। এই সকল কথার প্রতিশব্দ নানা দেশে নানারূপ হইলে পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্রের একান্ত অভাব ঘটে। ইহা বাঞ্ছিত নহে বলিয়া ইংরাজ, ফরাসী, জার্মানী, ইটালী এমনকি জাপানও মূল ল্যাটিন শব্দই ব্যবহার করিয়াছে। আমরা ইতিমধ্যে অনেক ইংরাজী, আরবী, ফরাসী ও ল্যাটিন শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছি। এখনও যদি এই নূতন কথাগুলি আমরা নিজস্ব করিয়া লই, তাহা হইলে আমাদের ভাষার সমৃদ্ধিই বাড়িবে। কষ্ট-কল্পিত অনুবাদ দ্বারা চলিত কথাগুলি অবোধ্য না করাই উচিত। এই কথা মনে রাখিয়াই এই পুস্তক প্রণয়ন কার্যে রত হইয়াছিলাম, এবং ইহার মধ্যে অনেক বিদেশী কথা বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনও কোনও জায়গায় পূর্বে ব্যবহৃত বাংলা প্রতিশব্দও ব্যবহার করিয়াছি। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'চলন্তিকা' অভিধান বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

ম্যাট্রিকিউলেশনে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির আলোচনা করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, আমাদের দেশের ছেলেদের মনে, বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির প্রাথমিক জ্ঞান দান করাই কর্তৃপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ঔৎসুক্য জাগানোই এখন যথেষ্ট নহে, কারণ সে কার্য ইতঃপূর্বে নিম্নতর শ্রেণীতে সম্পন্ন হইয়াছে। এ সময় তাহাদিগকে সকল বিষয় সম্বন্ধে একটু বিশদতর পরিচয় দেওয়াই দরকার। পরীক্ষণীয় বিষয় যাহাই হউক, শিক্ষার মানদণ্ড একটু উচ্চ না হইলে বালক-বালিকাদের মনের উপর সকল বিষয়ের ছাপ তেমনভাবে পড়িবে না। এই কথা স্মরণ রাখিয়াই আলোচ্য বিষয়গুলির একটু বিশদ বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি, ইহার দ্বারা আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবে। হয়তো কর্তৃপক্ষের কেহ কেহ মনে করিবেন যে, কোনও কোনও বিষয়ের এত বিস্তৃত বিবরণ না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহাদিগের নিকট আমার নিবেদন এই যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার নামে আমরা ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার জন্য শিশুপাঠ্যের প্রণয়ন করিয়া যেন শিক্ষা-বোর্ডের উদ্দেশ্য পণ্ড না করি। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যেরূপ ধার্য হইয়াছে, তাহাতে ছাত্রদিগের প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান দিবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষা-তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে মনে হয়। আমরা যেন শিক্ষার মানদণ্ড নামাইয়া আমাদের আদর্শকে খাটো না করি।

শিক্ষণীয় বিষয়গুলি এই পুস্তকে যেভাবে সাজান হইয়াছে আমার মনে হয়, উহাই স্বাভাবিক উপায়। পৃথিবী, যাবতীয় নক্ষত্রের ন্যায় নিজেও একদিন কোনও নীহারিকার অন্তর্গত ছিল; তাহার পর এক শুভদিনে উহার আবির্ভাব ঘটে। সেই অগ্নিময় পদার্থ, ক্রমে শীতল হইলে উহার মধ্যে পাহাড়, পর্বত, পাদপ ও প্রাণীর উদ্ভব হয়। মানব ইহার পরে জন্মলাভ করিয়াছিল। তাহারও বহুকাল পরে পদার্থবিদ এবং রাসায়নিকের গবেষণা শুরু হয়। এই স্বাভাবিক ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পুস্তকের বিভিন্ন বিষয়গুলি সাজাইয়াছি। অবশ্য ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থায়, স্থান-বিশেষের সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষকগণ যে কোনও বিষয়ই প্রথমে পড়াইতে পারেন সে বিষয়ে কোনও অসুবিধা হইবে না, আশা করা যায়। পাঠক-পাঠিকার সুবিধার জন্য পুস্তকের শেষে পরিশিষ্টে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ, পুস্তক মধ্যে কতকগুলি আদর্শ প্রশ্ন ও গোড়াতেই ইহার মধ্যে ব্যবহৃত বিষয়সূচী দেওয়া হইয়াছে।

বিদেশে থাকিবার সময় নানাবিধ 'সাধারণ পাঠ্য' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, বাংলার তরুণ-তরুণীদিগকে এই বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির পরিচয় তাহাদিগের মাতৃভাষায় প্রদান করিব। বাংলায় যখন প্রথম প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি, তখন ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। আজ সেই উদ্দেশ্য, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের আকারে রূপান্তরিত হইল। ইহার মধ্যে বিজ্ঞানের সবগুলি প্রয়োজনীয় শাখার আলোচনা করা হইয়াছে। নিজের সীমাবদ্ধ শক্তি ও ততোধিক সীমাবদ্ধ জ্ঞান এ বিষয়ে আমাকে কতদূর কৃতকার্য করিয়াছে জানি না, তবে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগের কাছে যদি ইহার আদর হয়, তাহা হইলেই আমি সুখী হইব।

পুস্তকটি যতদূর সম্ভব ভুল-ভ্রান্তি-শূন্য করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি কোথাও কোনও ভ্রম প্রমাদ রহিয়া থাকে, সুধীজন এবং সহৃদয় বন্ধুবর্গের নিকট হইতে সে বিষয়ে উপদেশ পাইলে পরবর্তী সংস্করণে সে সকল নিশ্চয়ই সংশোধন করা হইবে।

এই পুস্তক প্রণয়ন কার্যে বহু ইংরাজী ও বাংলা পুস্তকের সাহায্য লইতে হইয়াছে। ঐ সমস্ত পুস্তকের গ্রন্থকারদিগের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী এবং তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই স্থানে আরও দুইএকটি কথা না বলিলে আমার বক্তব্য বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিবে। আমার বাংলা লিখার আরম্ভ হইতে বরাবর উৎসাহ দান করিয়া যিনি আজ এই পুস্তক প্রণয়নে প্রধান উদ্যোগী পুরুষ, সেই শ্রদ্ধেয় মৌলবী মঈনউদ্‌দীন হোসয়ন সাহেবকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নব-বাংলার উদীয়মান শিল্পী, গভর্নমেন্ট শিল্প বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বন্ধুবর আবদুল মঈন যেরূপ যত্ন ও তৎপরতার সহিত ইহার ব্লক নির্মাণের সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। অকালে তাঁহার মৃত্যু পূর্ববাংলাকে এক শক্তিশালী শিল্পীর খেদমত হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। আল্লাহ তাঁহার রুহকে মাগফেরাত দিন—প্রার্থনা করি।

ঢাকা হইতে ইহার প্রকাশ এই প্রথম। আশা করি, পুস্তকখানি এখানেও তেমনি সমাদর লাভ করিবে, যেমন ইহার পূর্ববর্তী সংস্করণগুলি পাইয়াছে।

ঢাকা, জানুয়ারী, ১৯৫৫ মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা

প্রসঙ্গ কথা

উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা প্রণীত "বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী" বইটি প্রকাশ করতে পারায় আমরা আনন্দিত।

বইটির ৩য় সংস্করণ ১৯৩৯ সালে মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা থেকে এবং ১৯৫৫ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পাক ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ঢাকা থেকে দ্বাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বিপুল পাঠপ্রিয়তার কারণে "বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী" বইটি হিন্দি, উর্দু ও অসমীয়া ভাষায়ও অনূদিত হয়েছিল।

অর্ধশতাব্দী পর উপমহাদেশের প্রখ্যাত জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা প্রণীত "বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী"-র ত্রয়োদশ সংস্করণ প্রকাশিত হল।

প্রাঞ্জল সাধু ভাষায় রচিত এই বিজ্ঞানবিষয়ক বইটির পাঠোপযোগিতা আজ অবধি হ্রাস পায়নি।

ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদার মহৎ উদ্যোগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য "বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী" বইটি দুই খণ্ডে পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞান চর্চায় এই বইটি বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক প্রণয়নে আগ্রহীদের অনুপ্রাণিত করবে বলে আমরা আশা করি।

প্রকাশক

বিষয়-সূচি

প্রথম পর্ব
সজি জগৎ

পাদপ-কণার কথা, ১৩; গাছ, ১৭; সূর্যমুখীর জীবন-কথা, ৩৪; ধান, ৩৮; মটর, ৪৩।

দ্বিতীয় পর্ব
জীব-জীবন

জীবনের আবির্ভাব, ৪৭; কেঁচো, ৫১; মৎস্য, ৫৩; সহনশীলতা, ৫৭; পতঙ্গ, ৫৯; রেশমের মথ, ৬৪, মৌমাছি, ৬৬; পিপীলিকা, ৬৯; মশা, ৭১; মাকড়সা, ৭৪; ব্যাঙ-এর কথা, ৭৬; প্রাণী এবং উদ্ভিদের পরস্পর সম্বন্ধ, ৮১।

তৃতীয় পর্ব
নরদেহের ইতিকথা

মানবদেহের পরিচয়, ৮৩; খাদ্য এবং উহার ক্রমপরিবর্তন, ৮৮; শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া, ৯৪; রক্তবাহী চক্র, ৯৭; স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য, ১০২; মলবাহী যন্ত্র ১০৬; রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার, ১০৯।

বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পর্ব

সজি জগৎ

"বিটপির ঐ শ্যামল পাতা
দেখলে নিয়ে জ্ঞানীর চোখ,
মনে হবে এক গ্রন্থভারী;
যেন তাহার প্রতি ওরোক
কী দিচ্ছে শিক্ষা ভগবানের
রহস্যময় তত্ত্ব জ্ঞানের!"

—সা'দী।

পাদপ-কণার কথা

জীবন কি?

জীবন কি এবং ইহার আবির্ভাব কিরূপে হইয়াছিল, সে কথা সম্পূর্ণরূপে জানা নাই। তবে জীবিত পদার্থ সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, জীবের বিশেষ গুণগুলি এইরূপে প্রকাশ করা যায় — জীব এবং জড়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, জীবমাত্রেই আহার্য গ্রহণ করে এবং উহা পরিপাক করিবার ক্ষমতা রাখে; কিন্তু জড় পদার্থ এই শক্তি হইতে বঞ্চিত। খাদ্য গ্রহণের ফলে জীবদেহ পরিপুষ্ট হয়, তাহার দেহের যে ক্ষয় প্রতিনিয়ত সাধিত হইতেছে তাহাও পূর্ণ হইয়া উঠে। জীবমাত্রেরই দেহ হইতে কতকগুলি পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে। এইগুলি জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, এবং দেহের আবর্জনাস্বরূপ উহা পরিত্যাগ করা হয়। প্রাণীমাত্রেই আরও একটি বিশেষ গুণের অধিকারী যে, সে নিজের বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে অর্থাৎ নিজের অনুরূপ জীব সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাখে। জীবমাত্রেই নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে। অবস্থার পরিবর্তন হইলেও নিজেকে এই পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চালাইয়া লইতে পারে। জীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উত্তেজনায় জীবিত পদার্থ সাড়া দিয়া থাকে।

সজিকণা (Unicellular plant) ও প্রাণীকণা (Amoeba)

জীবদেহের আলোচনা করিতে গিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারূপ পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু সৃষ্টির আরম্ভ কিরূপে হইল তাহা সন্ধান করিতে গিয়া মানব একদিন আবিষ্কার করিল যে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার পরিকল্পনা করা হয় অণু এবং পরমাণু দিয়া। জীবদেহের বিশ্লেষণ ফলেও সেইরূপ এক ক্ষুদ্রতম জীবিত কণা পাওয়া যায়, তাহা একটি জেলি সদৃশ পদার্থ দ্বারা নির্মিত ও তাহা প্রটোপ্লাজম নামে পরিচিত। ভূ-তত্ত্ববিদ পৃথিবীর ক্রমপরিবর্তন এবং জীবনের আবির্ভাব সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেও তাঁহার লিখিত ইতিহাস হইতে এই প্রটোপ্লাজম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। দেখা যায় যে, এই ক্ষদ্রতম জীবকণাগুলি উল্লিখিত জীবমাত্রের বিশেষ গুণগুলির অধিকারী। এইরূপ জীবকণা প্রাণী এবং সজি-জগতের উভয়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বৈজ্ঞানিক সজি এবং প্রাণীর মধ্যে একটি যোগসূত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। উপরে ক্ষুদ্রতম সজি-কণা এবং একটি সূক্ষ্মতম প্রাণীকণার চিত্র দিয়া ইহাদিগের সাদৃশ্য দেখান হইল।

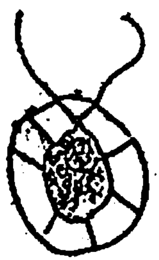

উদ্ভিদ কণা

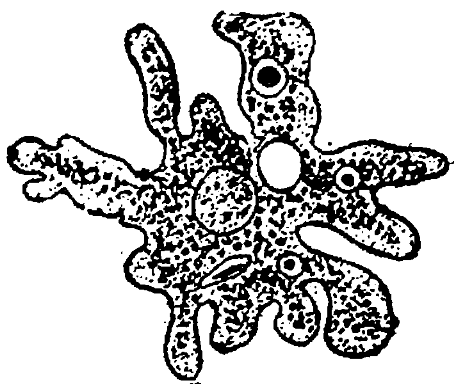

প্রাণী কণা

তোমরা পানি রাখিবার কোনও বৃহৎ পাত্রের তলদেশ কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কি? পর্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে, জলাধারের তলদেশে একরূপ অতিশয় পাতলা মসৃণ, সবুজ বর্ণের পদার্থ জমিয়া থাকে। পানির চৌবাচ্চায় এইরূপ পদার্থ জমিলে, তোমরা বলিয়া থাক যে ছ্যাৎলা জমিয়াছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই সবুজ পদার্থটি বর্তুলাকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। ইহাই সাধারণতঃ সজিকণা সদৃশ এক-সেলী উদ্ভিদ বা আলগি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উপরে ইহার চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমান বিজ্ঞানীরা বলিতেছেন যে, ভবিষ্যতে এই এক-সেলী আলগি হইতে মানুষের খাদ্য প্রস্তুত হইবে, কারণ ইহার মধ্যে প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ ও শ্বেতসারের সহিত ভিটামিনও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

হিমাটোকক্কাস ঐরূপ আর একটি পাদপ-কণিকা। এই কণিকাগুলি চারিটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। একটি আবেষ্টনী পদার্থ বা সেল-ওয়ালের মধ্যদেশে একরূপ

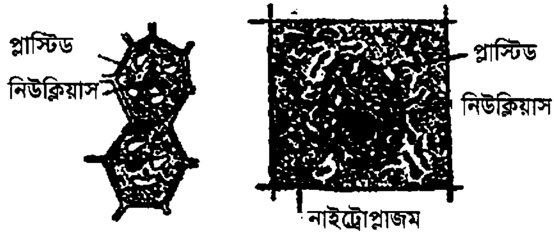

সজিকণার সমাবেশ

লালাসদৃশ পদার্থ বর্তমান। উহাই প্রটোপ্লাজম নামে পরিচিত। এই প্রটোপ্লাজমের মধ্যে যে গোলাকার ক্ষুদ্র একটি অংশ রহিয়াছে উহাই নিউক্লিয়াস এবং তাহার চতুর্দিকে যে গাঢ়তর লালা সদৃশ পদার্থ থাকে তাহার মধ্যে ঈষৎ হরিৎ বর্ণের ক্লোরোফিল মিশ্রিত রহিয়াছে, ইহাই ক্লোরোপ্লাস্ট নামে অভিহিত। এইরূপ একটি ক্ষুদ্র কণিকার দ্বারা প্রস্তুত পাদপকে এক সেলের পাদপ বলা হয়। ইহাদিগকে জীবাণুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল পাদপ আমরা দেখিয়া থাকি, উহারা এইরূপ বহু সেলের সমন্বয়ে প্রস্তুত; এবং উহার মধ্যে প্রত্যেকটি সেলই নিজ নিজ নির্দিষ্ট কার্য করিয়া চলিয়াছে। বিরাট মহীরুহের প্রথম জন্ম হয় ক্ষুদ্র একটি কণিকা হইতে, এবং এই কণিকাই মেরিস্টেম্যাটিক সেল নামে পরিচিত। এই সেলগুলি ক্রমেই সংখ্যায় বাড়িয়া চলে। প্রত্যেক সেলের মধ্যেই পূর্ববর্ণিতরূপ গাঢ় কেন্দ্রীয় পদার্থ বর্তমান। ইহাই নিউক্লিয়াস নামে পরিচিত এবং ইহার ন্যায় আরও কতকগুলি ক্ষুদ্রতর বিন্দু-সদৃশ প্লাস্টিড তথায় রহিয়াছে। সেলের অন্তর্নিহিত প্রটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম নামে পরিচিত। খালি চোখে এই সেলগুলি দেখা যায় না। অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই সেলের সকল অংশই পরীক্ষা করা সম্ভবপর। উপরের চিত্রে একস্থানে একটি ও তাহার পার্শ্বে দুইটি সেলের অন্তর ভাগ এবং তন্মধ্যে নিউক্লিয়াস দেখান হইয়াছে। বিভিন্ন বৃক্ষের সেলের আকার ভিন্নরূপ, তবে সেলের অভ্যন্তরভাগের ব্যবস্থা সর্বত্র প্রায় একরকম। এই সেলের মধ্যে কখনও কখনও অন্য পদার্থও দেখা যায়, কিন্তু ঐ সকল পদার্থ সেল হইতে নির্গত হইয়া বৃক্ষের রসদাগারে গিয়া জমিতে থাকে। ইহাই উদ্ভিদ জীবনের গোড়ার কথা। এইবার তোমাদিগকে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া ইহাদিগের প্রাথমিক কথা শেষ করিব।

উদ্ভিদকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি, প্রথম সপুষ্পক উদ্ভিদ (Phanerogam) ও দ্বিতীয় পুষ্পহীন বা অপুষ্পক উদ্ভিদ (Cryptogam)। এই উভয় শ্রেণীর উদ্ভিদই আমরা বহু সংখ্যায় দেখিতে পাই।

প্রথম শ্রেণীর সপুষ্পক উদ্ভিদগুলির সকলেই পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত হইয়া আমাদের আনন্দ বর্ধন করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ফুল পরে ফলে পরিণত হয় ও ফল দ্বারা তাহাদের বংশ-বিস্তার ঘটিয়া থাকে। জবা, দোপাটি, সূর্যমুখী প্রভৃতি ফুলগাছ যেমন এই শ্রেণীর অন্তর্গত, তেমনি আম, জাম, ডুমুর প্রভৃতিও ঐ একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অপুষ্পক উদ্ভিদের উদাহরণও তোমাদের অপরিচিত নহে। ব্যাঙের ছাতা, শেওলা, ফার্ণগাছ, শুশ্‌নি শাক, মস্ প্রভৃতি সবই অপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদের অন্তর্গত। আবার এই বিবিধ উদ্ভিদকে আরও কতকগুলি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন, সপুষ্পক উদ্ভিদের দুইটি শ্রেণী জিম্‌নোস্‌পার্ম ও এনজিওস্‌পার্ম। ইহাদিগকে যথাক্রমে নগ্নবীজ ও আবৃতবীজসম্পন্ন শ্রেণী বলিতে পারা যায়। এইরূপ নামকরণের প্রধান কারণ এই যে, এই শ্রেণীর গাছে বীজগুলি অনাবৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, যেমন পাইন গাছের বীজ। আবৃত বীজ, খোসায় ঢাকা থাকে, ইহারা আবার একবীজদলী ও দ্বি-বীজদলী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। কারণ ইহাদের কাহারও বীজ-মধ্যে মাত্র একটি দল বা দাল ও কাহারও মধ্যে দুইটি দাল বা দ্বি-বীজদল রহিয়াছে। এই সকল শ্রেণীর বিশদ বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ হইল।

অপুষ্পক উদ্ভিদকেও কতকগুলি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যেমন ফার্ণ জাতীয়, মস্ জাতীয় অথবা ব্যাঙের ছাতা জাতীয় উদ্ভিদ। ইহাদিগের সবিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তোমরা পরে এসব উদ্ভিদের পূর্ণতর তথ্য অবগত হইবে।

গাছ

দিকচক্রবালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই যে হরিতের শোভা নয়ন ও মনকে মুগ্ধ করে, তাহাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-কথা আমরা ভাবিয়া দেখি না। বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করে, পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া ফল-সম্ভারে সুসজ্জিত হয়। এই ফলের মধ্যে পাদপ-শিশু লুক্কায়িত থাকে; তাহারই সাহায্যে ইহারা স্বীয় বংশ-বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের জীবনে যে রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার কথা আমরা না ভাবিলেও উহার প্রতিটি অংশ হইতে আমরা উপকৃত হই। ইহাদের জীবন-কথার সাধারণ আলোচনা করিলে অনেক নূতন নূতন তথ্য জানিতে পারা যাইবে। বিশ্ব-স্রষ্টা তাঁহার নিপুণ হস্তের পরিচয়, এই বৃক্ষরাজির কার্যকলাপের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদিগের আলোচনায় তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম, ভক্তি এবং ভালবাসায় আমাদের মাথা স্বতঃই নত হইয়া যায়।

অঙ্কুর-উদ্‌গমন (Germination)

নিদাঘ দিনের নিদারুণ দুঃখের অবসান ঘটাইয়া হঠাৎ যে দিন বারিধারা শুষ্কভূমিকে সিক্ত করে, সে দিন যেমন চতুর্দিকে একটা শান্তি এবং সান্ত্বনার ভাব দেখা দেয়, মাটির নিচেও বিভিন্ন পাদপের বীজগুলি, তেমনই নূতন জলে স্নাত হইয়া, নব জীবনের আশায় চঞ্চল হইয়া উঠে। তোমরা বিভিন্ন বীজ লইয়া নিজেরা পরীক্ষা করিলেও তাহাদের এই নব জীবনের অপেক্ষায় বিপুল চাঞ্চল্যের পরিচয় পাইতে বিলম্ব ঘটিবে না। বিভিন্ন বীজে বিভিন্ন ভাবে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে।

অঙ্কুর উদ্গমন বদ্ধ জায়গায় পানি ও বাতাসের অভাবে হইতে পারে না। শুষ্ক স্থানে বহুকাল বীজ রাখিয়া তাহা দেখা যায়। মৃত্তিকার মধ্যে কেবল পানি ও বাতাস নহে, পরন্তু অল্পাধিক তাপেরও প্রয়োজন হয় অঙ্কুর নির্গমনের সময়। অতিশয় ঠাণ্ডা জায়গায় সহজে বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গমন হয় না। এই ব্যাপারটি একটি পরীক্ষায় সহজে প্রমাণিত হইতে পারে। একটি গ্লাস অর্ধেক পানি দ্বারা পূর্ণ করিয়া উহাতে একটি চ্যাপ্‌টা কাঠের টুকরা অর্ধেক ডুবাইয়া রাখ। ইহার উপরিভাগে একটি, পানির সঙ্গমস্থানে একটি ও পানিতে নিমজ্জিত অংশে আর একটি ছোলার দানা বাঁধিয়া উহাকে একটি অল্প গরম জায়গায় রাখিয়া দাও। দু-তিনদিন পরে দেখিতে পাইবে যে, পানির বাহিরের দানাটি অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। পানির সঙ্গমস্থানের দ্বিতীয় দানাটিতে অঙ্কুর উদ্গমন হইয়া শিশু-পাদপ জন্মাইয়াছে, কিন্তু পানির নিচে পানিমজ্জিত দানাটি ফুলিয়া উঠিয়া অঙ্কুরের উন্মেষ দেখাইলেও উহা হইতে অঙ্কুর উদ্গমন হয় নাই, প্রথম দানাটিতে পানির পরিপূর্ণ অভাব এবং তৃতীয়টিতে বাতাসের অভাবের জন্য অঙ্কুর উদ্গমন হইতে পারে নাই।

গম অথবা ভুট্টার একটি দানা সিক্ত হইলে উহার মধ্য হইতে প্রধান মূল নির্গত হইয়া মাটির দিকে ধাবিত হয় এবং পরে সেই একই স্থান হইতে ঊর্ধ্ব মুখে পাদপ-শিশুর প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান মূলের জন্মস্থান হইতে বহু সংখ্যক শাখা শিকড় (Secondary roots) সূক্ষ্ম সূত্রের আকারে নির্গত হইয়া মৃত্তিকাকে আঁকড়াইয়া ধরে, এবং পাদপ-শিশু ঊর্ধ্বমুখে বাড়িয়া ক্রমে নূতন নূতন পাতা ছড়াইতে আরম্ভ করে। এইরূপ মূলই গুচ্ছমূল নামে পরিচিত।

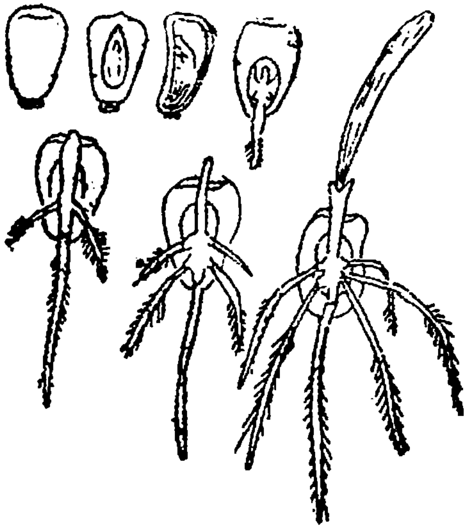
ভুট্টা শিশুর জন্মদান

মূলের পরিচয়

এই মূল লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে, উহাকে প্রধানতঃ দুই অংশে ভাগ করা যায় প্রথমটিকে মূল শিকড় বা রেডিকেল বলা হয়, উহাই ভূমির মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু পরে উহা নষ্ট হইয়া যায় এবং উহার উৎপত্তিস্থান হইতে আরও কতকগুলি শিকড় বাহির হইয়া গুচ্ছমূলের সৃষ্টি করে। একবীজদলী উদ্ভিদের মূল এই রূপেই হইয়া থাকে। মূলের প্রান্তভাগে অপেক্ষাকৃত শক্ত একটি টুপির ন্যায় আবরণ বর্তমান, উহাই মূলত্র (Root cap) নামে পরিচিত। এই মূলত্রের পরই কতকগুলি সূক্ষ্ম লোম রহিয়াছে উহাই মূলরোম (Root hair), ইহারাই মাটি হইতে রস গ্রহণ করিতে গাছকে সহায়তা করে।

একটি ভুট্টার বীজ ভিজাইয়া মাঝামাঝি কাটিলে উহার প্রান্তদেশে ভ্রূণ অবস্থায় এই রেডিকেলকে দেখা যাইবে। রেডিকেল-এর উপরিভাগে যে নিদ্রিত পাদপ-শিশুর শীর্ষদেশ দেখা যাইতেছে, উহাকে প্লুমিউল বলে। উহাই বাহিরে আসিয়া ঊর্ধ্বমুখে ধাবিত হয়, এবং অল্পকাল পরে উহারই মধ্য হইতে পাতাগুলি নির্গত হইয়া থাকে।

শৈশব অবস্থায় এই পাদপ-শিশুকে আহার যোগাইবার জন্য বীজমধ্যে যথেষ্ট খাদ্য-বস্তু শ্বেতসাররূপে আহৃত হইয়া মজুত থাকে। ঐ অংশ মানবের খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়। প্রথমাবস্থায় পাদপ-শিশু বাহির হইতে খাদ্য আহরণ করিতে পারে না

বলিয়াই, বীজের মধ্যে উহার আহার সঞ্চিত রাখিতে হয়। পরে কিন্তু শিকড়ের সাহায্যে উহারা মাটি হইতে পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত নাইট্রোজেন ও চুন জাতীয় পদার্থ এবং ফসফেট প্রভৃতি আহরণ করে।

ভুট্টা ও উহার পরিণত গাছ

পূর্বে একবীজদলী গাছের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি দ্বি-বীজদলী উদ্ভিদের মূল তাহা হইতে একটু ভিন্ন। এই শ্রেণীর উদ্ভিদের মূলের প্রধান অংশ একবীজদলী গাছের ন্যায় নষ্ট হয় না, পরন্তু প্রধান মূলরূপে বর্তমান থাকে ও উহার দেহ হইতে শাখামূলগুলি নির্গত হইয়া ক্রমে বিস্তৃত হয় এবং উহাদের প্রত্যেকের শীর্ষদেশে মূলত্র ও তাহার পাশেই মূলরোম বর্তমান। পার্শ্বে একটি গাছের মূল্যের মধ্যে এই সকল অংশ দেখান হইয়াছে।

আকৃতিভেদে মূল তিন প্রকার — যথা, মূলাকৃতি (Fusiform) মূল। ইহা দেখিতে মূলার ন্যায়, মধ্যদেশ অল্প মোটা কিন্তু প্রান্তদেশ অপেক্ষাকৃত সরু। দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল কোণাকার (Conical) বা গাজরাকৃতিবিশিষ্ট। ইহার উপরদিক মোটা ও চওড়া, কিন্তু নিম্নদেশ ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর মূল শালগমাকৃতিবিশিষ্ট (Napiform)। ইহারা দেখিতে গোলাকার ও নিম্নদেশ সরু। পর পৃষ্ঠায় এইগুলির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম প্রকৃত মূল (True root)। ইহাই বীজদণ্ডের গোড়া হইতে উৎপন্ন হয়; দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল অস্থানীয় বা অস্থানিক মূল (Adventitious root)। এইরূপ মূল কখনও কাণ্ড হইতে, যেমন বটের ঝুরিমূল, কখনও বা পাতা হইতে, যেমন পাথরকুচির পাতা হইতে নির্গত মূল — বাহির হইয়া থাকে। অস্থানিক মূলও কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা বটগাছের স্তম্ভমূল (Prop root)। ইহারা প্রথমে শাখা হইতে নির্গত হয়, পরে মাটিতে প্রবেশ করে ও ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকে। কেয়া গাছের ঠেশ মূলগুলি (Stilt root) গাছের কাণ্ড হইতে নির্গত হইয়া মাটিতে প্রবেশ করে ও গাছকে সোজা দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহায্য করে। পান প্রভৃতি গাছের আরোহী মূল (Climbing root) লতার গাঁইট হইতে নির্গত হয় ও অন্য গাছকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া উপরে আরোহণ করে। গুলঞ্চ লতা, রাস্না প্রভৃতি গাছ বায়বীয় মূলের (Aerial root) সাহায্যে আশ্রয়-বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরে ও ইহাদের সাহায্যে তাহারা বাতাস হইতে খাদ্য-বস্তু গ্রহণ করিতে পারে। স্বর্ণলতার মূল কিন্তু

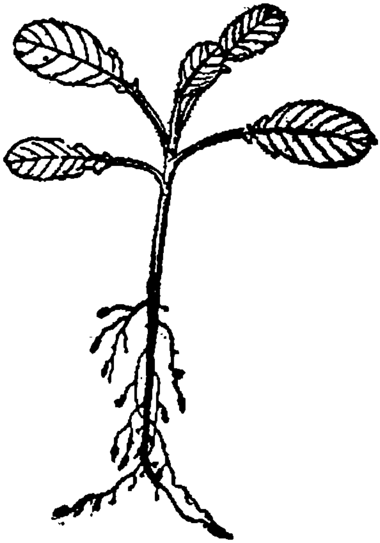

মূল, মূলত্র মূলরোম

শোষকমূল (Haustoria); ইহারা অন্য গাছ হইতে আহার্যবস্তু শোষণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত সুন্দরী প্রভৃতি গাছের শিকড় হইতেও একরূপ মূল বাহির হয়, তাহার সাহায্যে উহারা বাতাস গ্রহণ করে। এইজন্য এগুলিকে নাসিকা মূল (Breathing root) বলা হয়।

মূলের কার্য (Functions of the root)

মূলের সাহায্যে গাছ মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে — আবার ইহারই সাহায্যে মাটি হইতে পানি এবং অন্যান্য আহার্য গ্রহণ করে। কেহ বা মূলের সাহায্যে নিজ দেহ-পুষ্টির জন্য অন্য বৃক্ষ হইতে খাদ্য আহরণ করে। যেমন স্বর্ণলতা। ইহারাই পরগাছা (Parasite) বলিয়া কথিত হয়। আবার কেহ বা আশ্রয়-গাছকে জড়াইয়া ধরিয়াই আনন্দ লাভ করে। এইরূপ আশ্রয় না পাইলে উহারা ঝড়ে উড়িয়া যাইত।

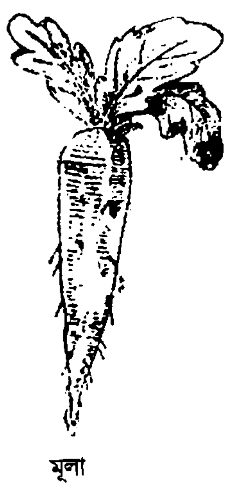

মূলা

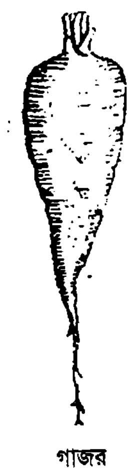

গাজর

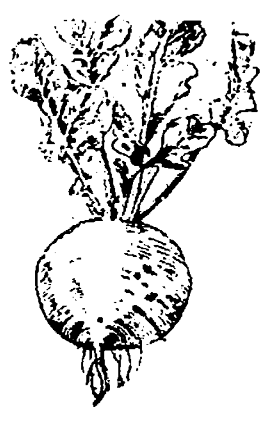

শালগম

বটের স্তম্ভমূল

মূল দ্বারাই গাছ মাটি হইতে তরল সার গ্রহণ করে। এই কার্যটি অতিশয় চমৎকার, কিন্তু তোমাদিগকে উহা বিশদভাবে বুঝান এখন সম্ভব নয়। এমন কতকগুলি পদার্থ আছে যাহাদের সাহায্যে জলীয় দ্রবণ হইতে লবণ জাতীয় পদার্থ উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ প্রবেশ-কার্যে যে সকল ব্যাপার সাহায্য করিয়া থাকে তাহা এখানে বিবৃত করিলে তোমরা হয়তো সব বুঝিবে না। মোটের উপর জানিয়া রাখ যে, উদ্ভিদের মূলও ঐ জাতীয় পদার্থ দ্বারা নির্মিত বলিয়া জলীয় দ্রবণ হইতে লবণ জাতীয় পদার্থ উহার মধ্যে দিয়া পানির সহিত প্রবেশ করে। এই কার্যই অস্‌মোসিস (Osmosis) নামে পরিচিত।

প্রাণীদেহে যেমন পাকাশয়, অন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্র রহিয়াছে, উদ্ভিদ-দেহে সেরূপ কিছু নাই। এই মূলের সাহায্যে যে পদার্থ উদ্ভিদ-দেহে প্রবিষ্ট হয় তাহাই পাতার সাহায্যে প্রাপ্ত অন্য পদার্থ সহযোগে উদ্ভিদ-দেহের পুষ্টি ঘটায়। হজমের বালাই নাই বলিয়া উদ্ভিদ ক্রমাগত খাদ্য গ্রহণ করে ও পুষ্টি লাভ করিতে থাকে। এইজন্যই অধিকতর সার দিলে উদ্ভিদ-দেহ সুন্দরতরভাবে গঠিত হয়। উদ্ভিদ সহজতর পদার্থ হইতে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করে, কিন্তু অন্য কোনও প্রাণীই সেরূপ করিতে পারে না। তাহারা এক পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করে মাত্র।

কতগুলি গাছ এমনও আছে, যাহারা মূলেই নিজের ভবিষ্যতের খাদ্য মজুত করিতে থাকে; যথা গাজর, শালগম, মূলা ইত্যাদি। পাতার সাহায্যেই গাছের মধ্যে শ্বেতসার (Starch) প্রস্তুত হইতেছে; অন্যান্য পদার্থও এই পাতার সাহায্যেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্বেতসার প্রস্তুত হওয়ামাত্র উহাকে প্রেরণ করা হয়, শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়া কাণ্ডের অন্তর ভাগে। এই স্থান হইতে কোনও কোনও গাছ উহাকে নিজের মূলের মধ্যে প্রেরণ করে, আবার কেহবা উহাকে ফল মধ্যে সঞ্চারিত করে। ফলের কথা পরে বলিব। মূলের কথাই এখন বলিয়া লই। লাল আলু ও শাঁক আলু তোমরা অনেকেই খাইয়াছ। এগুলি প্রকৃতপক্ষে মূলের স্ফীত অংশবিশেষ,— ইহা কন্দমূল নামে পরিচিত। সুতরাং বলিতে হয়, পাতায় প্রস্তুত খাদ্যবস্তু মূলে গিয়া এই সকল গাছে জমা হইয়া থাকে। এ পদার্থটি প্রকৃতপক্ষে শ্বেতসার। এরোরুট, তিখুর প্রভৃতিও এই জাতীয় পদার্থ। উহাদের মধ্যেও পত্র-প্রেরিত শ্বেতসারই সওগাত স্বরূপ জমা হইয়াছে। মূলা, গাজর এবং বীটও এই জাতীয় সব্জি — প্রভেদ এই যে, ইহাদিগের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পানিও শ্বেতসারের সহিত বর্তমান। গাজর এবং বীট কিন্তু খাইতে অতিশয় মিষ্ট, উহার মধ্যে চিনি রহিয়াছে যথেষ্ট। এই চিনি আসলে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ। ইহার পরিচয় তোমরা পরে পাইবে। ইক্ষু গাছই আমাদের দেশে চিনি প্রস্তুতকল্পে ব্যবহৃত হয়; এখানে কিন্তু গাছের প্রস্তুতকৃত খাদ্য-পদার্থ জমাইবার আলাদা ব্যবস্থা

আছে। এখানে কাণ্ডের মধ্যে প্রচুর পানির সহিত তাহার সুমিষ্ট শর্করা সম্ভার জমিয়া থাকে। গাছের কাণ্ড অবশ্য প্রধানতঃ উহার পাতাগুলিকে প্রচুর বাতাস ও আলোকের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া রাখে। তবে ইহার মধ্যে এই খাদ্যবস্তু সঞ্চিত করিয়া রাখাও গাছের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। গম, ধান, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষে এইরূপ খাদ্যবস্তু সঞ্চিত হয় ফলের মধ্যে।

কাণ্ড ও তাহার প্রয়োজনীয়তা

বীজ হইতে যখন উদ্ভিদ-শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন উহার একভাগ মাটির মধ্যে চলিয়া যায়, উহাই মূল নামে পরিচিত এবং উহার অন্য ভাগ মাটির উপরে উঠিয়া আসে, এই অংশই কাণ্ড। গাছের কাণ্ড সাধারণতঃ মাটির উপরে থাকিলেও — মাটির নীচে থাকে এমন অনেক কাণ্ড তোমরা দেখিয়াছ; হয়তো তাহাদিগের সকলের সঠিক পরিচয় তোমাদের জানা নাই, সে কথা পরে আলোচনা করিব। বর্তমানে মাটির উপরে যে কাণ্ড উঠিয়া আসে তাহারই একটু পরিচয় দিব।

পর্ব্ব, পর্ব্বসন্ধি ও কক্ষমুকুল

ছোট গাছটি যখন ক্রমশঃ বড় হয়, তখন একটু যত্নের সঙ্গে উহাকে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে, কাণ্ড ক্রমশঃ যতই উপরে উঠে উহার পার্শ্বদেশ হইতে ততই পাতা ছড়াইতে থাকে। যে দণ্ডটির গায়ে এই পত্র-সমাবেশ — উহাই কাণ্ড। কাণ্ডের গাত্রে এক পত্র হইতে অন্য পত্র পর্যন্ত যে অংশটি বর্তমান তাহাই পর্ব বা পাব (internode) নামে পরিচিত। ভুট্টার গাছে ও ইক্ষু গাছে পর্বগুলি বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। এই পর্বের যে স্থান হইতে পত্র নির্গত হয় উহাই পর্ব-সন্ধি (Node) বা গাঁইট নামে পরিচিত। পর্ব-সন্ধি হইতে পত্র নির্গত হইলে দেখা যায়, সেই স্থানে একটি কোণাকার পদার্থ নির্গত হইতেছে, ইহাই পার্শ্বমুকুল বা কক্ষমুকুল (axillary bud) নামে পরিচিত। গাছের অগ্রভাগেও এইরূপ মুকুল নির্গত হয় — উহা অগ্রমুকুল (terminal bud) নামে পরিচিত। ক্রমাগত এই সকল নূতন মুকুল নির্গমনের ফলেই গাছ বাড়িয়া চলে। পর্ব-সন্ধি হইতে পাতার গোড়ায় যে মুকুল দেখা যায়, সময় সময় উহাই বড় হইয়া শাখায় পরিণত হয়।

বাঁশ গাছের পর্ব-সন্ধি পর্ব অপেক্ষা মোটা, তথা হইতে নূতন শাখা বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু ভুট্টা গাছের ঐরূপ কোনও শাখা নির্গত হয় না। তাল, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি গাছেও ঐ একই অবস্থা দেখা যায়। ইহাদিগের অগ্রমুকুলই (terminal bud) ক্রমাগত নির্গত হইতে থাকে।

কাণ্ড প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে একটি ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড ও অপরটি ভূমির উপরিভাগে স্থিত সাধারণ কাণ্ড। যে সকল কাণ্ড ভূমির উপরিভাগে দাঁড়াইয়া থাকে তাহারাও সচরাচর দ্বিবিধ ঃ একটি সোজা হইয়া মাথা তুলিয়া ভূমির উপর দণ্ডায়মান; কিন্তু অপরটি মাটিতে শয়ান অবস্থায় থাকে অথবা কোনও দীর্ঘ দণ্ডকে অবলম্বন করিয়া উপরে উঠে। এই শেষোক্ত শ্রেণী লতা (creeper) নামে পরিচিত। আম, কাঁঠাল, জামের গাছ সোজা মাথা তুলিয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু সিম, পুঁই, কুমড়া, শশা প্রভৃতি গাছ কোনও অবলম্বন না পাইলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। ইহাদের কাণ্ড দুর্বল। সিমের ন্যায় কেহ বা উপরে উঠিবার সময় অবলম্বন-দণ্ডকে জড়াইয়া জড়াইয়া উপরে উঠে, কেহ বা কুমড়া বা শশার ন্যায় একরূপ সূতা সদৃশ রূপান্তরিত শাখার সাহায্যে, অবলম্বন-দণ্ডকে জড়াইয়া কাণ্ড বিস্তার করিয়া চলে। এই সূতার ন্যায় শাখাগুলি আকর্ষ (tendril) নামে পরিচিত। ইহারা পর্বসন্ধি হইতেই নির্গত হয়, কিন্তু শাখার ন্যায় গঠিত না হইয়া রূপান্তর গ্রহণ করে।

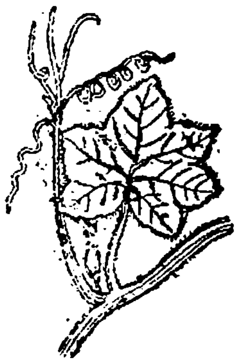

আকর্ষ ও রূপান্তরিত শাখা

কোথাও বা দেখিতে পাওয়া যায়, এই কাণ্ডগুলিই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া কখনও কাঁটায় (thorn) পরিণত হয় যেমন বৈঁচি প্রভৃতি গাছে দেখা যায়। আবার কোথাও বা কাণ্ড চ্যাপটা হইয়া পাতার ন্যায় সবুজবর্ণবিশিষ্ট হয়, যেমন ফণিমনসা বা ত্রিশিরা মনসার গাছে দেখা যায়। ইহারাই ফলক-কাণ্ড (phylloclades)-সম্পন্ন গাছ।

ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডও একরূপ নহে। উহাদিগের মধ্যেও কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শল্ক-কন্দ (turnicated Bulb) যেমন, পেঁয়াজ, অথবা লিলি ফুলের কন্দ (scaly bulb), আলুর ন্যায় স্ফীত কন্দ (tuber), মান ও ওলের ন্যায় গুঁড়ি কন্দ (corm), আদার ন্যায় মূলাকার কাণ্ড (rhizome) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূলাকার কাণ্ডের পর্বগুলি সাধারণতঃ একরূপ শল্ক-পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে ও ইহাদিগের পর্ব-সন্ধি হইতে অস্থানিক মূল বাহির হইয়া থাকে। আলুর ন্যায় কন্দের দেহ হইতেও অস্থানিক মূল নির্গত হয়। ইহাদিগের গাত্র হইতে স্থানে স্থানে যে মুকুল নির্গত হয়, তাহাই সচরাচর চোখ বলিয়া পরিচিত — ওলের গায়েও এইরূপ চোখ দেখা যায়, তথায় এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওল সদৃশ মনে হয়। শল্ক-কন্দের নিম্নভাগ হইতেই মূল নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল কন্দমধ্যেই গাছের আহৃত খাদ্য-দ্রব্য জমা করা থাকে ও তাহাই ইহাগিদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের আহার্য যোগাইয়া যায়।

কাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা গাছের পক্ষে কম নয়। মৃত্তিকা হইতে নিজ প্রয়োজনের জন্য পানি ও খনিজ দ্রব্য আহরণ করিয়া এই কাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সূক্ষ্মনালী পথে উহা পাতায় প্রেরণ করে। তথায় বাতাস হইতে অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ ও অম্লজান গ্রহণ করে এবং তাহাকে জৈব পদার্থে রূপান্তরিত করিয়া, পুনরায় কাণ্ডে ফিরাইয়া আনিয়া, এই কাণ্ড-মধ্যে সে পাতায় প্রস্তুত খাদ্য-দ্রব্য জমা করে। কাণ্ডই পত্র ধারণ করে ও পল্লব সাহায্যে পত্ররাজিকে বিস্তৃত করিয়া প্রচুর বাতাস ও সূর্যালোকের সামনে বিস্তৃত করিয়া ধরে ও শত্রুর আক্রমণ হইতে উহাদের রক্ষা করিয়া থাকে। কাণ্ডের মধ্যে দ্বিবিধ সূক্ষ্ম নালী-পথ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের এক শ্রেণী মূলের আহৃত রস পাতায় পাঠাইয়া থাকে তাহারা জাইলেম (xylem) নামে অভিহিত; আবার অন্য শ্রেণী পাতায় প্রস্তুত দ্রব্য বৃক্ষদেহের সর্বত্র চালনা করিয়া থাকে, ইহারাই ফ্লোয়েম (floem)। সাধারণতঃ বাতাসের অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ পাতার সাহায্যে পরিবর্তিত হইলেও কোনও কোনও কাণ্ডে অবস্থিত ক্লোরোফিল কণাগুলিও এই কার্যে গাছের সহায়তা করিয়া থাকে, সে কথা পরে বলিতেছি।

মান

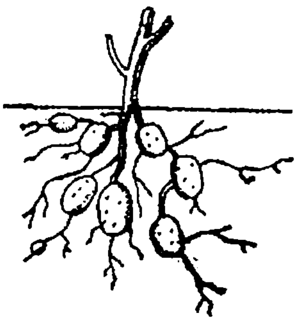
আলু

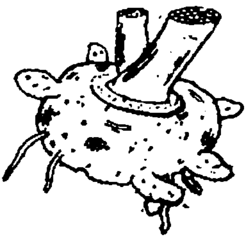
ওল

আদা

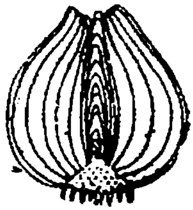
পেঁয়াজ

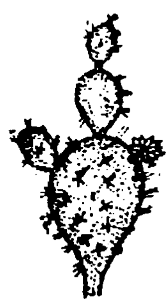
ফণিমনসা

এই সকল কার্য ব্যতীত, কাণ্ড সাহায্যে কোনও কোনও গাছের বংশ-বিস্তারও ঘটিয়া থাকে। আলু, ওল, মান, আদা প্রভৃতি গাছ কাণ্ডের অংশ হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নূতন আলুর গাছ এইরূপেই আলুর উপরের চোখ হইতে পত্র পল্লব বিস্তার করিয়া নূতন গাছ জন্মায় ও পরে তাহা হইতেই নূতন আলু উৎপন্ন হইয়া থাকে। তেমনি আবার আম, জামরুল প্রভৃতির ন্যায় গাছের কাণ্ড হইতে কলম করিয়াও নানা গাছের বংশ-বিস্তার ঘটান সম্ভব। আলু, আদা, পেঁয়াজ প্রভৃতির ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য জমান হয়।

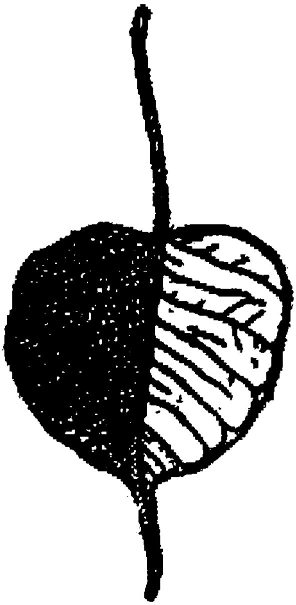

অশ্বত্থ পাতা

পাতার কার্য (function of a leaf)

গাছের সবুজের শোভা তাহার পাতার জন্য। কত রকম গাছ আমরা দেখিয়া থাকি, একটু লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারি যে, এই সব গাছের পাতা বিভিন্ন। এক মানুষকে যেমন অন্য মানুষ হইতে তাহার চেহারা দেখিয়া পৃথক করা যায়, তেমনি এক শ্রেণীর গাছকে অন্য শ্রেণীর গাছ হইতেও পাতার সাহায্যে পৃথক করা সম্ভব। পাতা এই জন্য বিভিন্নপ্রকার।

তবে মোটামুটিভাবে প্রত্যেক পাতাকে তিনটি অংশে ভাগ করা সম্ভব; যথা পাতার বেষ্টনী (leaf base), বৃন্ত (petiole) ও ফলক (blade)। পাতার যে অংশ কাণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকে তাহাই উহার বেষ্টনী বা গোড়া। ইহার প্রান্তবর্তী অপেক্ষাকৃত স্ফীত অংশকে পালভাইনাস (pulvinus) বলা হয়। বৃন্ত বা বোঁটা পাতার একটি অংশ হইলেও সব পাতাই সবৃন্তক নহে। ডানকুনি বা শিয়ালকাঁটার পাতা অবৃন্তক (sessile)। কিন্তু অশ্বত্থ, আম, জাম প্রভৃতির পাতা সবৃন্তক (petiolate)।

পাতার ফলকের আকার গাছ হিসাবে ভিন্ন। ধান গাছের পাতা দীর্ঘ বা লম্বাকৃতি (linear); কিন্তু আম অথবা জাম পাতা দেখিতে বল্লম ফলকের ন্যায়। এইজন্যই ইহারা বল্লমাকৃতি (lanceolate) ও কচুর পাতা হরতনাকৃতি (cordate), কিন্তু বটের পাতার আকার ডিম্বাকৃতি (ovate) অথচ পদ্মপত্র চক্রাকৃতি (rotund)। এইরূপে বিভিন্ন গাছের পাতার আকৃতি বিভিন্ন। পাতার প্রান্তদেশ অর্থাৎ ফলকের অগ্রভাগ

(apex) কাহারও দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। ইহারাই সূক্ষ্মাগ্র (acute) নামে অভিহিত হইতে পারে; যেমন আম, জাম, প্রভৃতির পাতা। পান, অশ্বত্থের পাতা প্রভৃতি দীর্ঘ শীর্ষবিশিষ্ট (acuminate); আবার খেজুর পাতার অগ্রভাগ সূচ সদৃশ, তাই ইহারা সূচ্যগ্র (mucionate); বিভিন্ন পাতার কিনারাও ভিন্ন ভিন্ন আকারের দেখিতে পাওয়া যায় — কাহারও কিনারা সমান, কেহ বা করাতের ন্যায় কাটা (serrate) কিনারাবিশিষ্ট, আবার কাহারও কাহারও কিনারা দেবদারুর পাতার মতো ঢেউ খেলান।

পান, আম, খেজুর, আনারস, কাঁঠাল প্রভৃতি পাতার আকৃতি যাহাই হইক না কেন, উহার মধ্যে শিরা-বিন্যাসে (venation) প্রকৃতির আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাতার মধ্যভাগ দিয়া কোথাও একটি বড় শিরা বা মধ্যশিরা (midrib) দেখা যায়, কোথাও বা একাধিক মধ্যশিরা বর্তমান। বাঁশ পাতার মধ্যশিরা একটি, কিন্তু তেজপাতায় ইহার সংখ্যা তিন। এই মধ্যশিরা হইতে উহার উভয়পার্শ্বেই অনেকগুলি শাখা-শিরা নির্গত হইয়া পাতার প্রান্ত পর্যন্ত গিয়াছে এবং এই শাখা-শিরা হইতে বহুসংখ্যক সূক্ষ্মতর উপশিরা (veinules) নির্গত হইয়া সমস্ত দেহ ছাইয়া রাখিয়াছে।

এই তো গেল পাতার আকৃতিগত পরিচয়। এখন পাতার শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিয়া উহাদের কার্যের পরিচয় দিব। পাতা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

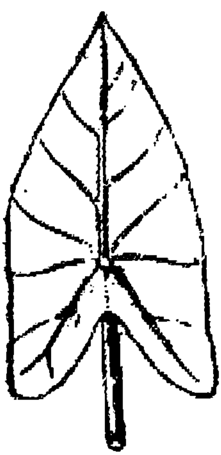

কচুপাতা

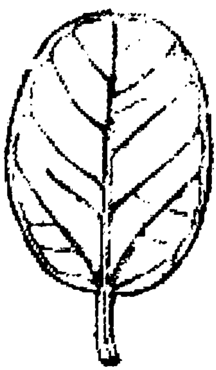

বটপাতা

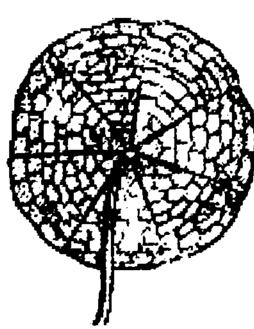

পদ্মপাতা

হইতে পারে। প্রথম মৌলিক (simple) পত্র; ইহাতে মাত্র একটি ফলক বিদ্যমান — যেমন আম, কাঁঠাল, অশ্বত্থ প্রভৃতির পাতা। দ্বিতীয় যৌগিক (compound) পত্র; ইহার মধ্যে বিভিন্নসংখ্যক ফলক বা অনুফলক বর্তমান; গোলাপ, বেল, শিমূল, মটর প্রভৃতির

পাতা যৌগিক শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদিগের মধ্যে গোলাপ পাতার পাঁচটি অথবা সাতটি ফলক, শিমূল পাতার সাতটি, কিন্তু বেল পাতার মাত্র তিনটি ফলক রহিয়াছে। এই ফলক-সজ্জা ব্যাপারেও একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে, কতকগুলি যৌগিকপত্রে

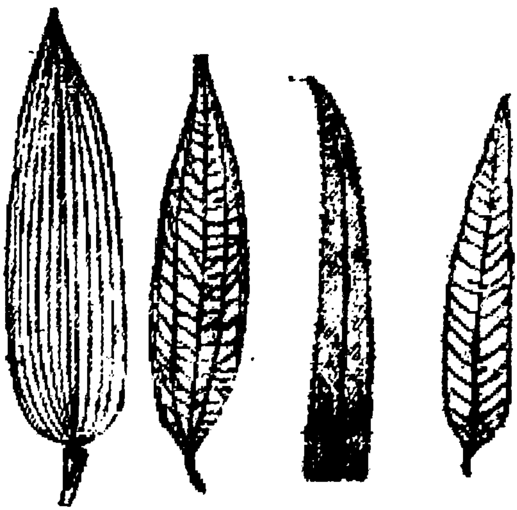

বাঁশপাতা তেজপাতা আনারস পাতা দেবদারু পাতা

অনুফলকগুলি (leaflets) একটি অক্ষরেখার (rachis) দুই দিকে পালকের ন্যায় সাজান থাকে। গোলাপের ন্যায় কোনও কোনও পাতার পুরোভাগে একটি মাত্র অনুফলক বর্তমান আবার তেঁতুলের ন্যায় যৌগিকপত্রে অনুফলকগুলি অক্ষের দুই পার্শ্বে সমান সংখ্যায় সংবদ্ধ রহিয়াছে। শিমূল প্রভৃতির পাতা যৌগিক, কিন্তু অনুফলকগুলি এখানে হাতের আঙ্গুলগুলির ন্যায় সাজান, এইজন্য ইহাদিগকে হস্তাকৃতি যৌগিক পত্র বলা হয়।

পাতার নীচের দিকে অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য ছিদ্র বর্তমান। ছিদ্রগুলি খালি চোখে দেখা না গেলেও, একটি পাতা ছিলিয়া অণুবীক্ষণ যোগে দেখিলে ইহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ইহারাই রন্ধ্র বা স্টোমা (stoma) নামে পরিচিত। স্টোমার দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র কোষ রহিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে পাতার সবুজকণা বা ক্লোরোফিল ও নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রকণা বর্তমান। সূর্যালোকের সাহায্যে এই রন্ধ্রের মুখগুলি খুলিয়া যায়, কিন্তু উহার পার্শ্বস্থিত কোষগুলি নিজ আয়তন প্রয়োজনমতো কমাইয়া রাখে, অথবা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেয়। এই রন্ধ্রপথের সাহায্যেই গাছের শ্বাসকার্য চলিয়া থাকে। পাতার এই রন্ধ্রপথ ছাড়া উদ্ভিদ-দেহের আরও অন্যান্য অংশ দ্বারাও এইরূপ শ্বাসকার্য সম্পাদিত হয়।

উদ্ভিদ শ্বাসকার্য (respiration) সম্পাদনের জন্য অনবরত বাতাস হইতে অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প গ্রহণ করে, ও নিজ দেহ হইতে অম্লজান বাষ্প পরিত্যাগ করে। এই কার্য দিবারাত্র উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন অংশ দ্বারা সম্পাদিত হয়। অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্পের কথা তোমরা পূর্বেই শুনিয়াছ। এই বাষ্পের ইহাই ধর্ম যে, পটাশ দ্রবণে উহা শোষিত হয়। একটি ফ্লাস্কে কতকগুলি ফুল রাখিলে, এই ফুলও শ্বাসকার্য চালাইতেছে বলিয়া ঐ পাত্র মধ্যে অবস্থিত অম্লজান বাষ্প ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্পে পরিণত হইতেছে। ফ্লাস্কটির মধ্যে পটাশ-দ্রবণ রাখিয়া উহাকে পারদের উপর উপুড় করিয়া রাখিলে ঐ পটাশ-দ্রবণ অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প ক্রমাগত শোষণ করিতে থাকিবে এবং যত অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ শোষিত হইবে ততই অম্লজান কমিয়া যাওয়ায় পারদও ক্রমে উপরে উঠিতে থাকিবে। এই পরীক্ষার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। এইজন্য বহুক্ষণ ধরিয়া এই পরীক্ষার-কার্য সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে।

উদ্ভিদের অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ আত্তীকরণ

প্রথমেই বলিয়াছি, উদ্ভিদের এই শ্বাসকার্য সর্বদাই চলিয়া থাকে; কিন্তু দিবাভাগে

গোলাপ গাছের যৌগিক পত্র জামের মৌলিক পাতা পাতার শিরা

যতক্ষণ সূর্যালোক আসিয়া পাতার উপর পড়িতে থাকে, ততক্ষণ এই আলোক-সহযোগে পত্র দ্বারা উদ্ভিদমাত্রই বাতাস হইতে অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প আহরণ করিয়া উহার অঙ্গার ভাগ গ্রহণ করতঃ অম্লজান পরিত্যাগ করে। উদ্ভিদ এইরূপে যে অঙ্গার গ্রহণ করে তাহাই পরিবর্তিত হইয়া শ্বেতসারে পরিণত হয়। উদ্ভিদ-দেহ হইতে যে শর্করা বা চিনি আহৃত হয় তাহা এইরূপেই প্রস্তুত হইয়াছে। চাউল, গম, আলু ইত্যাদির মধ্যে যে শ্বেতসার সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাও এইরূপে প্রস্তুত হইয়া উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন অংশে জমিতে থাকে। অঙ্গার-দ্বি-অম্লজের বিশ্লেষণের ফলে, এইরূপে উদ্ভিদের যে

অঙ্গার-গ্রহণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাই উহার আলোক-সংশ্লেষণ বা অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ আত্তীকরণ (photosynthesis or assimilation of carbon dioxide) বলিয়া পরিচিত। এই কার্য গাছের সবুজ অংশ বা ক্লোরোফিলের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। এই ব্যাপারটিও পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হইতে পারে। পানির মধ্যে যে জলজ উদ্ভিদ দেখা যায় উহা ঝাঁজিদাম নামে পরিচিত। জলপূর্ণ একটি পরীক্ষা-নলকে বীকারের ভিতর ফানেলের উপর জলমধ্যে দণ্ডায়মান রাখিয়া বীকারটি সূর্যালোকে রাখিলে ধীরে ধীরে অম্লজানের বুদ্বুদ উঠিয়া পরীক্ষা-নলের মধ্যে জমিতে থাকিবে। এই অম্লজান পানিতে দ্রবীভূত অঙ্গার-দ্বি-অম্লজের বিশ্লেষণ ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাই উদ্ভিদ হইতে বাতাসে আসিয়া যাবতীয় জীবের জন্য অম্লজান যোগায়।

প্রস্বেদন কার্য

উপরোক্ত দ্বিবিধ কার্য ব্যতীত পাতার সাহায্যে গাছ আরও একটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহা প্রস্বেদন (transpiration) কার্য বলিয়া পরিচিত। উদ্ভিদ মাটি হইতে প্রচুর পরিমাণে পানি গ্রহণ করিয়া থাকে। এই পানি সে পাতার মধ্য দিয়া পরিত্যাগ করে। ইহাই গাছের প্রস্বেদন কার্য। গাছের এইরূপ জলীয় অংশ ত্যাগ করা আমরা সর্বদা দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু পরীক্ষাযোগে ইহা প্রমাণিত হইতে পারে। যদি কোনও গাছের একটি পাতাপূর্ণ শাখা, একটি বড় মুখের শুষ্ক বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া কয়েক ঘণ্টা উহা দিবালোকের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বোতালের মধ্যে বিন্দু বিন্দু পানি জমিতে থাকিবে। এইরূপ ব্যাপার প্রস্বেদন কার্যের জন্যই পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে পরিত্যক্ত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বড় কম হয় না। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, বাঁধা কপির একটি তিন বিঘা পরিমাণ ক্ষেত হইতে চারিমাস কাল মধ্যে প্রায় ৪২,৫০০ মণ পানি এই প্রস্বেদন ফলে নির্গত হইয়া থাকে।

আলোকের প্রয়োজন

গাছের সাধারণ জীবনযাপনের জন্য সূর্যালোক নিরতিশয় প্রয়োজনীয়। পানি ও বাতাস না পাইলে গাছ যেমন বাঁচিতে পারে না, আলোকের অভাবেও উহার সেইরূপ বাঁচিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইয়া পাড়ে। আলোক অভাবে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রতিহত হয় এবং উহার দেহ ক্রমে বর্ণহীন ও শীর্ণ হইয়া উঠে। এইরূপ শীর্ণ দেহ ও বিবর্ণ রূপ লইয়া গাছ বাঁচিতে পারে না বলিয়াই, কোনওরূপ আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে গাছকে বাঁচাইতে পারা যায় না। ভুট্টা অথবা ছোলা গাছ প্রথম নির্গত হইবার পরে উহাকে একটি কাঠের বাক্স অথবা মাটির হাঁড়ি দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে দেখিবে, অল্পকাল মধ্যেই ভুট্টা এবং ছোলার সবল শিশুগাছগুলি ক্রমে বিবর্ণ, দীর্ঘ এবং শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে যদি অন্ধকারেই রাখিয়া দাও, তাহা হইলে তাহারা মরিয়া যাইবে। অন্ধকার ঘরে গাছ রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, জানালার যে স্থান হইতে আলোক অল্প পরিমাণেও ঘরে আসিতেছে, সমস্ত গাছটিই আলোকের প্রত্যাশায় সেই দিকে বাঁকিয়া চলিয়াছে। আলোর

সাহায্যেই গাছের পাতায় সবুজের শোভা প্রকটিত হয়। সবুজ বর্ণটি কি? রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে তাহার সন্ধান মিলিবে। এখন তাহার কথা বলিয়া তোমারদের বুঝানো যাইবে না। এইমাত্র এখন শিখিতে পার যে, উহাকে ক্লোরোফিল বলে এবং মৃত্তিকা হইতে মূল-সহযোগে পানির সহিত যে সকল দ্রবীভূত পদার্থ পাদপ-দেহে প্রবেশ করে, তন্মধ্যে কোনও ধাতু সাহায্যে পত্রমধ্যে এই সবুজ পদার্থটির সৃষ্টি হয়। জীব-দেহের লোহিত শোণিত এবং বৃক্ষপত্রের সবুজ পদার্থ হয়তো একই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে।

গাছের শ্বাসকার্য ও অঙ্গার-আত্তীকরণ-কার্যে একটু পার্থক্য আছে, সেটুকুও তোমাদের লক্ষ্য করা দরকার।

১। এই উভয়বিধ কার্যই প্রধানতঃ পাতা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে গাছের অন্যান্য অংশও শ্বাসকার্য সম্পাদন করিলেও পাতাতে গাছের সবুজ অংশ সাহায্যে প্রধানতঃ অঙ্গার-আত্তীকরণ-কার্যসম্পন্ন হইয়া থাকে।

২। শ্বাসকার্য দিবারাত্র সম্পন্ন হইলেও, অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ-আত্তীকরণ কার্য মাত্র দিবাভাগে সূর্যালোক সাহায্যে সম্পন্ন হইতে পারে।

৩। শ্বাসকার্যে গাছের দেহের অঙ্গার ভাগ ক্ষয় হয়, কাজে কাজেই উহার ফলে উদ্ভিদ-দেহের ওজন কমিয়া যায়। কিন্তু অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ-আত্তীকরণের ফলে উহার দেহে অঙ্গার-ভাগ বৃদ্ধি পায়, ও উহা ক্রমশঃ অধিকতর পুষ্ট হইতে থাকে, ফলে উহার ওজন বৃদ্ধি পায়।

৪। শ্বাসকার্যে গাছ অম্লজান গ্রহণ করে ও অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ পরিত্যাগ করে, ফলে উহার শক্তি ক্ষয় হয়। কিন্তু অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ-আত্তীকরণ কার্যে গাছ ঐ বাষ্পীয় পদার্থটি গ্রহণ করিয়া, অম্লজান পরিত্যাগ করিতে থাকে; ইহাতে সে নূতন শক্তি আহরণ করিয়া চলে।

ফুল ও ফল

ফুল কি? গাছে যে ফুল দেখিয়া আমরা আনন্দিত এবং মোহিত হইয়া থাকি, সেই ফুলেরই চরম পরিণতি ঘটে ফলের মধ্যে। কিরূপে ফুল উদ্গত হয় এবং উহা হইতে ফলই বা কিভাবে প্রস্তুত হয়, সে কথা এইবার বলিব। একটি ফুলের বিশেষ পরীক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু কি ফুল লইব? ভুট্টার ফুল, গমের ফুল, ডুমুর ফুল, অথবা ধানের মঞ্জরীর পরীক্ষা তত সহজ নহে; এবং তোমাদের মতো যাহারা এই রকম পাঠ সবে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের জন্য সুবিধাজনক নহে। সুতরাং একটি সহজ-প্রাপ্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পুষ্প লইয়া পরীক্ষা করিব। তোমরা কোন্ ফুল ভালবাস? গোলাপ, জবা, লিলি, ধুতুরা ফুল, বাটারকাপ, প্রিমরোজ না মন্‌কশুড? কত রকম ফুলই না রহিয়াছে! রূপে, গন্ধে উহারা বিভিন্ন। তবে উহাদিগের প্রত্যেককেই কয়েকটি বিশিষ্ট অংশে ভাগ করা যায় এবং এই অংশগুলি সকল প্রকার পুষ্পেই রহিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটি ফুলের মাঝামাঝি কাটিয়া, সব অংশগুলি দেখান হইল (পরের পৃষ্ঠার চিত্র)।

প্রিমরোজ

বাটারকাপ

চিত্রানুযায়ী গোলাপ অথবা পঞ্চমুখী জবার একটি ফুল পরীক্ষা করিলে উহার চারটি অংশ দেখিতে পাইবে। ফুলের নীচে সবুজ রংয়ের ঐ যে আবরণটি — উহাই পুষ্পের বহিরাবরণ নামে পরিচিত। জবা ফুলে দেখিতে পাইবে এই বহিরাবরণে কতকগুলি সবুজ রংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা রহিয়াছে। এই পাতাগুলিই আচ্ছাদন পত্র বা সেপাল (Sepal)। ইহারা মিলিয়া যে বহিরাবরণ প্রস্তুত করিয়াছে তাহাই বৃতি (calyx), বহির্বাস বা পুষ্প-বেষ্টন ইহারই মধ্যে রহিয়াছে। উহার দ্বিতীয় অংশ অন্তরাবরণ বা অন্তর্বাস। জবা, গোলাপ প্রভৃতি ফুলে দেখিতে পাইবে, এই অন্তর্বাস কতকগুলি বিভিন্ন খণ্ড দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহারাই পুষ্পদল, পাপড়ি বা পেটাল (petal)। পুষ্পের সৌন্দর্য ও গন্ধ প্রধানতঃ এই পাপড়ি হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বহির্বাস ও অন্তর্বাস ছাড়াইয়া লইলেই পুষ্প মধ্যে কতকগুলি দীর্ঘ দণ্ড এবং উহাদিগের শীর্ষদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁটুলির আকারে কতকগুলি কোষ দেখিতে পাইবে। এই দণ্ডগুলি পরাগ-কেশর, এবং কোষগুলি পরাগাধার (stamen)। এই কোষ মধ্যে অনেকগুলি রেণু বর্তমান। ইহাদিগের একটি বিশিষ্ট বর্ণ রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র কণাগুলি পুষ্প-রেণু বা পরাগ (pollen) বলিয়া পরিচিত। পরাগ-কেশর ব্যতীত আরও এক নাতিদীর্ঘ দণ্ড পুষ্পের মধ্যস্থিত বীজ-কোষ হইতে উত্থিত হইয়াছে দেখিতে পাইবে, ইহাকে গর্ভ-কেশর (style) বলে। এই চারিটিই পুষ্পের প্রধান অংশ। ইহাদিগের সাহায্যে পুষ্প ফলে পরিণত হয়।

তোমরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করিয়াছ যে, সব ফুলেই ফল হয় না। তবে অধিকাংশ ফুলেরই চরম পরিণতি ফলে। এই জন্য ফুলকে সময়ে সময়ে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যাহারা ফল দেয় না, তাহাদিগকে পুং-পুষ্প এবং যাহারা ফলোৎপাদন করে, তাহাদিগকে স্ত্রী-পুষ্প বলিয়া থাকি। কিন্তু পুষ্প মাত্রেরই পূর্বোক্ত চারিটি অংশ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। পরাগ-কেশরের শীর্ষস্থিত কোষে যেমন পরাগ বা পুষ্পরেণু আবদ্ধ থাকে, বীজ-কোষের মধ্যে সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই বীজগুলি বীজকোষের অভ্যন্তরভাগে উহার গাত্রে সংযুক্ত। পুষ্পরেণু পরাগ-কেশর হইতে নির্গত হইয়া গর্ভ-কেশরের শীর্ষদেশে পতিত হইলে এই কার্য পরাগযোগ বা

পলিনেশন (pollination) নামে পরিচিত হয়। এই পুষ্পরেণু তথায় অঙ্কুরিত হয় এবং সূক্ষ্ম নালীপথে উহার মধ্যস্থিত পদার্থ বীজকোষের মধ্যে আনীত হয়। একটি আতসী কাচের সাহায্যে তোমরা গর্ভ-কেশরের উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখিতে পাইবে, এই ছিদ্রের মধ্য দিয়াই পরাগগুলি ভিতরে প্রবেশ করে। এই পরাগের সহিত বীজ-কোষের মধ্যস্থিত বীজাণু মিশ্রিত হইলেই বীজগুলি পুষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু এই পরাগের স্পর্শ না পাইলে বীজ পুষ্ট হয় না।

উপরের কথাগুলি পড়িয়া তোমরা ভাবিতেছ যে, একই পুষ্পে যখন পরাগ এবং গর্ভ-কেশর উভয়েই রহিয়াছে, তখন প্রত্যেক পুষ্পেই ফলোদ্গম স্বাভাবিক। কিন্তু স্বভাবের নিয়ম একটু বিচিত্র। একই পুষ্পের পরাগ-কেশর এবং গর্ভ-কেশর এক সময়ে পরিপুষ্ট হয় না। হয়তো কোনও পুষ্পে পরাগগুলি প্রথমে পুষ্ট হইয়া উঠে, বীজকোষ তখনও পরাগের সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয় না। সুতরাং একই পুষ্পে এই পরাগযোগ কার্য বা pollination সংঘটিত হইতে পারে না। যখন এ পুষ্পের পরাগ পরিপুষ্ট হইয়াছে, তখন অন্য পুষ্পের বীজকোষটি পুষ্ট হওয়ায়, কোনওরূপে পরাগগুলি এ পুষ্প হইতে বাহিত হইয়া অন্য পুষ্পে যাইলে, তবেই তথায় ফল উৎপাদন করিবে; এবং এ পুষ্পের ফল-সম্ভাবনা আরও পরে, — যখন উহার বীজকোষ পুষ্ট হইবে তখন ঘটিতে পারিবে। এই পরাগবহনক্রিয়া বিচিত্র উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ

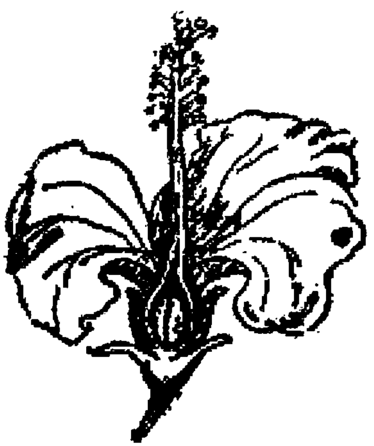

জবা

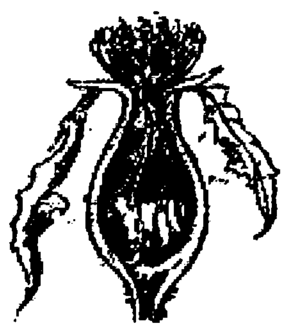

গোলাপ

কীট-পতঙ্গের সাহায্যে এই কার্যটি ঘটে। পুষ্পের বিচিত্র রূপ, মনোহর গন্ধ, অমৃতোপম মধুর লোভে নানা আকারের পতঙ্গ উহার নিকট আসিয়া বিরাট জল্‌সার সৃষ্টি করে। পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে, নানাভাবে, আকৃষ্ট হইয়া ইহারাই পরাগ-বহন কার্য সমাধা করিয়া থাকে। অবশ্য পতঙ্গগুলি এমন পরোপকারী প্রবৃত্তিসম্পন্ন নহে; তাহারা নিজেদের মধু-পানের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্যই ফুলে ফুলে ভ্রমণ করে। কিন্তু প্রকৃতিরাণী নিজ প্রয়োজনীয় কার্য তাহাদের দ্বারা তাহাদের অজ্ঞাতসারেই সম্পন্ন

করাইয়া লন। কখনও বা বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া এই পুষ্পরেণু পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া থাকে। এইভাবে পরাগ-সম্মিলন (pollination) সঙ্কর পরাগান্বয় (cross pollination) বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। অবশ্য কখনও কখনও একই পুষ্পের পুষ্পরেণু তাহারই পরাগ সহযোগে ফলোৎপাদন করিয়া থাকে এবং তখন পরাগ এবং পুষ্পরেণুর যে সম্মিলন সংঘটিত হয়, তাহাকেই স্বকীয় পরাগান্বয় (self-pollination) বলিতে পারা যায়। সূর্যমুখীর ফুলে এইরূপ সম্মিলন ঘটিয়া থাকে।

বংশ-বিস্তার (propagation)

বীজকোষে পরাগ-সম্মিলন ফলে, ক্রমে উহা ফলে পরিণত হইতে থাকে। কেশরের কার্য তখন শেষ হইয়া যায় বলিয়া উহারা ধীরে ধীরে শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে। পরাগ-কেশরের সহিত গর্ভ-কেশরও অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই শুকাইয়া যায় এবং উহারা ফল-গাত্রে একটি চিহ্নমাত্র রাখিয়া ঝরিয়া পড়ে। পত্র-মধ্যে যে নিত্য নবীন সংশ্লেষণ (synthesis) ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহার ফলে নূতন রস ফলের মধ্যে আসিয়া জমিতে থাকে। কিছুদিন পরে ফলটি পাকিয়া প্রস্তুত হয় এবং বীজও সম্পূর্ণতা লাভ করে। এইবার বৃক্ষের বংশ-বিস্তারের সূচনা হয়। কোনও কোনও গাছের ফলে মিষ্টতা বা অন্য কোনও গুণ দেখা যায় না, তাহারা অনেক সময় আকারেও ছোট হইয়া থাকে। এইগুলি পাকিবার পর গাছের ডালেই শুকাইয়া যায়। তাহার পরে বাতাসের সাহায্যে স্থান হইতে স্থানান্তরে বাহিত হইয়া নূতন গাছের সূত্রপাত করে। শিমূলের বৃহৎ ফল প্রকৃতপক্ষে কোনও পশু বা পক্ষীকে আকর্ষণ করে না। তাহার পুষ্পের ঘোর রক্তবর্ণ নাতিমিষ্ট পুষ্পদলগুলি কাক প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিয়া পরাগ বহন করাইয়া লয় সত্য, কিন্তু বীজ ছড়াইবার অন্য উপায় না থাকায় ফলটি সুপক্ব অবস্থায় ফাটিয়া যায়, এবং বীজগুলি তুলার সহিত বাহির হইয়া দূর-দূরান্তরে গিয়া পতিত হয়। কিন্তু অন্যান্য রসাল সুমিষ্ট ফলগুলি, নানা জন্তু, মানব এবং পক্ষীর খাদ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে থাকে। এবং বীজগুলি এইরূপে দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। গাছের জীবন-কথার উপসংহার এইরূপেই করা যাইতে পারে।

পুষ্পগুচ্ছ (inflorescence)

পুষ্পের কথা বলিতে গিয়া যাহাদের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। কোনও শাখাশীর্ষে একটিমাত্র ফুল ফুটিয়া গাছটিকে সৌন্দর্য দান করে, আবার কখনও কখনও দেখা যায়, একই শাখাশীর্ষে একাধিক পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে — যেমন রজনীগন্ধা, কস্তুরী বা লিলি, জিনিয়া, রঙ্গন, গাঁদা প্রভৃতি। এই সকল পুষ্পের অংশ একটি নহে, বরং পুষ্প-স্তবকটির উপরিভাগে কোথাও একই সঙ্গে বহু পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া মনোরম শোভার সৃষ্টি করে। এইরূপ পুষ্প-স্তবকের মধ্যে সূর্যমুখী এবং গাঁদাও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। ইহারাই পুষ্পগুচ্ছ (inflorescence) নামে পরিচিত। পরবর্তী অধ্যায়ে ইহাদেরই একটির বিশেষ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।

সূর্যমুখীর জীবন-কথা

যে কোনও পাদপের পত্র, পুষ্প, কাণ্ড প্রভৃতি অংশকে কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা করিলে, উহাদিগের মধ্যে অণুবীক্ষণ সাহায্যে সেল এবং প্রটোপ্লাজম প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এখানে পাদপের সূক্ষ্মতম অংশের পরিচয় না দিয়া প্রথমে স্থূলভাবে একটি বিশেষ ফুলগাছের কথা আলোচনা করিব। সূর্যমুখী বড় চমৎকার সুন্দর একটি ফুল। ইহা গাছে বহুদিন ধরিয়া ফুটিয়া থাকে। প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে ফুলটি পূর্ব দিকে ফিরিয়া থাকে, সূর্য যত ঊর্ধ্বে উঠে, ফুলটিও ততই আকাশমুখী হইতে থাকে। পরে সূর্য অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িলেই, উহা ক্রমে পশ্চিমমুখী হইয়া পরে মাটির দিকে মাথা নত করে। এইভাবে সূর্যের গতিপথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ফুলটি দিনাতিপাত করে বলিয়া ইহার নাম সূর্যমুখী হইয়াছে।

সূর্যমুখীর বীজ (seed of the sun-flower)

সুন্দর উজ্জ্বল পীতবর্ণের এই ফুলটি, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ফুটিয়া বাগানের শোভা বর্ধন করে। উহার বীজ কিন্তু আরও পূর্বে মাটিতে বসাইতে হইবে। মাটিতে বসাইবার পূর্বে সূর্যমুখীর একটি বীজ লইয়া পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত মতো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়িবে। বীজটি দেখিতে কতকটা ত্রিকোণাকার; প্রকৃতপক্ষে এই বীজকে সূর্যমুখীর ফল বলিলেই ভাল হয়। বীজটি ফুলের মধ্যে উহার কোণাকার নিম্নভাগের সহিত সংযুক্ত থাকে। একটি বীজ পানিতে ভিজাইয়া বেশ সুতীক্ষ্ণ ছুরীর দ্বারা মাঝামাঝি কাটিলে যে রূপ বাহির হইবে— তাহা নিম্নের চিত্রে দেখান হইল।

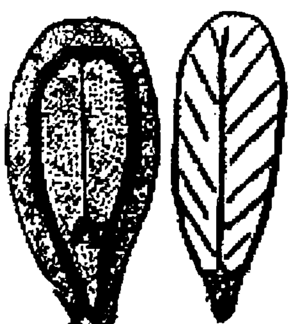

সূর্যমুখীর বীজ ও উহার কর্তিতরূপ

বীজটিকে কতকগুলি বিভিন্ন অংশে ভাগ করা সম্ভবপর। উহার অভ্যন্তরে শাঁসপুর্ণ যে অংশ রহিয়াছে— তাহারই বহির্দেশ ব্যাপিয়া একটি পাতলা আবরণ বর্তমান, ইহাই বীজাবরণ বা টেস্‌টা (testa) নামে পরিচিত। উহারই বহির্দেশে অপেক্ষাকৃত স্থূল আর একটি আবরণ রহিয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে ফলের শুষ্ক শাঁস এবং ইহাই পেরিকার্প

(pericarp) বা ছাল নামে অভিহিত। অভ্যন্তরভাগে শাঁসালো অংশ দেখিলে বুঝিতে পারিবে, উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; ইহাদের প্রত্যেকটি বীজদল নামে পরিচিত। এই বীজদলের মধ্যভাগে পাদপের ভ্রূণ বা শিশু-পাদপ ঘুমন্ত রহিয়াছে। ইহার সূচালো নিম্নাগ্রে রহিয়াছে শিকড়ের প্রাথমিক অংশ এবং উহারই উপরিভাগে ভবিষ্যৎ কাণ্ডটি প্রায় শাঁসের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে।

সূর্যমুখীর শিশু-পাদপের জন্মগ্রহণ

বীজটি ভিজা মাটিতে বসাইয়া দিলে অল্পকাল মধ্যেই উহার অগ্রভাগ হইতে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র একটি শিকড় নির্গত হইবে। এইটি প্রাথমিক শিকড় নামে অভিহিত। উহা প্রথমে মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় স্থান নির্ণয় করিয়া লয়, এবং পরে যখন ঐ বীজাবরণটি ফাটিয়া যায়, তখন উহার মধ্য হইতে একটি ধনুকের ন্যায় বক্র ক্ষুদ্র কাণ্ড দেখা যায়। আরও কিছুকাল গত হইলে ক্রমে কাণ্ডটি সোজা হইয়া উঠে এবং বীজাবরণ ফাটিয়া উহার মধ্য হইতে বীজদল হরিতের আভা লইয়া নির্গত হয়।

এইরূপে বীজ হইতে দুইটি বীজদল নির্গত হয় বলিয়া ইহারা দ্বি-বীজদলী নামে পরিচিত। বীজদলের মধ্যভাগে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কণিকা-সদৃশ পদার্থ বর্তমান; উহাই ক্রমে পত্র এবং কাণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে; এই অংশটি ভ্রূণ-মুকুল নামে অভিহিত হয়। নবজাত শিশু-পাদপের বাঁকান কাণ্ডটিকে আমরা ভ্রূণদণ্ড বা হাইপোকটিল নাম দিয়া থাকি।

এইরূপে শিশু-পাদপটি জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমেই বর্ধিত হইবে। এই ক্রমবর্ধনের সময় ইহার বিভিন্ন অংশ ইহাকে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই সময় পানি যেমন-ইহার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়, আলো-বাতাসও সেইরূপ দরকার। মাটির নিম্ন হইতে শিকড়, জলীয় পদার্থ শোষণ করিয়া উহার উপরিভাগে পাঠায়। এই পানির সহিত কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থও উহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ, চুন, ফস্‌ফরাস ও লৌহজাতীয় পদার্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পদার্থগুলি জলীয় দ্রবণে শিকড় সাহায্যে শিশু-বৃক্ষের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া উহার দেহ গঠনে সহায়তা করে।

সূর্যমুখী শিশুর জন্মগ্রহণ

তোমরা পূর্বেই শিখিয়াছ যে, আলো এবং বাতাসও গাছের পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়। আলোকের সাহায্যে গাছের পাতায় হরিতের শোভা দেখা দেয় এবং পাতার সাহায্যেই গাছ বায়ুস্থ অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ (carbon di-oxide) বাষ্প গ্রহণ করে

এবং উহা হইতেই নিজ দেহ-গঠনের নিমিত্ত শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি করিতে থাকে। এই মূল্যবান পদার্থ প্রস্তুত হইলে উহাকে কখনও কাণ্ড মধ্যে, কখনও বা মূলের অভ্যন্তরে জমান যায়। এইরূপে সূর্যমুখী গাছেরও ক্রমবর্ধন হইয়া থাকে। তাহার পর সময় আসিলে দেখা যায়, উহার কাণ্ড হইতে যে সকল শাখা নির্গত হইয়াছে, তাহার অগ্রভাগে পুষ্পের সূচনা হইয়াছে — ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁড়ির আকারের সূর্যমুখীর প্রধান কাণ্ডের শীর্ষদেশেও ক্ষুদ্র পুষ্পকুঁড়ির আবির্ভাব ঘটে। কিছুদিন গত হইলে কুঁড়ি হইতে সুন্দর পীত বর্ণের পুষ্পটি প্রস্ফুটিত হইয়া স্বীয় শোভায় বাগানকে আলোকিত করে এবং উহার বিচিত্র বর্ণসম্ভার দিয়া নানাবিধ কীটপতঙ্গকে নিজ অপরূপ রূপ দেখাইয়া যেমন মোহিত করে, তাহাদের পাদস্পর্শে নিজেও তেমনি ধন্য হইয়া যায়।

সূর্যমুখীর ফুল

সূর্যমুখীর ফুল বলিতে আমরা যে উজ্জ্বল পীতবর্ণের চক্রাকারের পদার্থটি গাছের কোনও একটি ডালের প্রান্তে দেখিতে পাই, প্রকৃতপক্ষে উহা একটি ফুল নহে, বরং কতকগুলি ফুলের একত্র সমাবেশে এই বৃহৎ ফুলটি রচিত। এইরূপ পুষ্প বহুপুষ্পী ছত্র (Inflorescence) নামে পরিচিত। তোমরা রজনীগন্ধা, লিলি প্রভৃতি ফুল দেখিয়া থাকিবে; উহাদের একটি মাত্র ডালে অনেকগুলি ফুল ফুটিয়া থাকে। সূর্যমুখীও সেই জাতীয় ফুল। তবে প্রভেদ এই যে, রজনীগন্ধার ডালের বিভিন্ন স্থান হইতে এক একটি ফুল বিভিন্ন সময়ে ফুটিয়া থাকে; কিন্তু সূর্যমুখীর ফুল, একটি ডালের শীর্ষে, একটি ছত্রের উপর প্রায় একই সঙ্গে প্রস্ফুটিত হয়। কোনও একটি ফুল তুলিয়া পরীক্ষা করিলেই এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। প্রত্যেকটি পুষ্পেরই কতকগুলি বিশিষ্ট অংশ রহিয়াছে। এই অংশগুলির কথা আর একটি ফুলের বিবৃতি দ্বারা পূর্বে বুঝাইয়াছি। এই পুষ্প মধ্যেই বীজকোষ এবং পরাগকেশরগুলি স্থাপিত। পুষ্প-রেণু পূর্বোল্লিখিত পতঙ্গ সাহায্যে, কখনও বা নিজেদের পরস্পর সম্মিলনে একত্র হইয়া ফলের সূত্রপাত করে। সূর্যমুখী ফুল বহুদিন ধরিয়াই গাছের ডালের শোভা বর্ধন করিয়া থাকে এবং এই সময়-মধ্যে ধীরে ধীরে পুষ্প-রেণু বীজাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া উহার ফল এবং বীজটি উৎপাদন করে। এই বীজ উৎপাদন করিবার জন্যই

সূর্যমুখী ফুল

পুষ্পের সৃষ্টি; নতুবা সূর্যমুখীর বংশ-বিস্তার ঘটে না। ফুল ও সন্নিহিত বীজটি সম্পূর্ণরূপে পুষ্ট হইলেই ক্রমে ফুলটি শুকাইয়া আসে। এই সময় ফুলগুলির নীচেকার চক্রাকার ফলাধারটি দেখিতে পাওয়া যাইবে। একই ফলাধারে ফুলের হিসাবে বহু সংখ্যক বীজ জন্মলাভ করে।

সূর্যমুখীর ফুলগুলি যে মনোমুগ্ধকর পীতবর্ণের শোভা দেখাইয়া থাকে, মানুষের মন তাহাতে যথেষ্ট মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয় বলিয়া, এই পুষ্প-স্তবক বা পাপড়িগুলি হইতে ঐ উজ্জ্বল বর্ণ-সম্ভারটি আহরণ করিবার উপায় মানব উদ্ভাবন করিয়াছে, এবং উহা এখন মানুষের ব্যবহারে লাগিয়া থাকে। ফুলটির মধ্যে যে বীজ উৎপন্ন হয়, তাহাও কম প্রয়োজনীয় নহে। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই বীজ হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়, তাহা খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হইতে পারে; এই তৈল, গুণে জলপাই, যাইতুন বা অলিভ তৈল অথবা বাদাম তৈলের সহিত এক পর্যায়ভুক্ত।

ধান

এইবার বাঙ্গালীর বহু আদরের ধন ধানের কথা তোমাদিগকে একটু শুনাইতে চেষ্টা করিব। বাঙ্গালীর ইহা প্রধান খাদ্য, সুতরাং আদরের ধন নিশ্চয়ই। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান শাসাইয়াছে যে, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যে ক্রমেই নষ্ট হইতেছে, সে কেবল ধান হইতে প্রাপ্ত চাউলের অপব্যবহারের ফলে। চাউলের ব্যবহার-প্রণালীর কথা বলিবার জন্য এই প্রবন্ধের সূচনা নহে; সে কথা তোমরা পরে শিখিবে; পরন্তু, উহার জীবনকথার আলোচনাকল্পেই ইহার অবতারণা।

ধানের প্রকারভেদ

বপনের ঋতুভেদে ধান দুই প্রকার। প্রথম আশু বা আউস, এবং অন্যটি আমন বা হৈমন্তিক। আউস ধান গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বপন করা হয় এবং ভাদ্র মাসের মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে; আমন ধান রোপণ করা হয় বর্ষার মধ্যে, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে উহা পরিপক্ব হয়। আমন ধান আবার দেশভেদে নানা প্রকার। কোনও ধান হইতে সুগন্ধযুক্ত ক্ষুদ্রতর (সরু) চাউল নির্গত হয়, আবার কোনও ধানে বেশ বড় বড় আকারের (মোটা) চাউল পাওয়া যায়। ধান যে প্রকারের হউক না কেন, উহার জন্ম, বৃদ্ধি এবং ফলনের ইতিহাস প্রায় একই প্রকার।

ধান, ফুল ও তাহার অভ্যন্তর

ধান একবীজদলী গাছের অন্তর্ভুক্ত। উহার বীজ পরীক্ষা করিলে প্রথমে কিঞ্চিৎ কঠিন একটি বহিরাবয়ব দেখিতে পাওয়া যাইবে। ধান কিছুক্ষণ ভিজাইয়া উহার উপরের আবরণ সরাইয়া লইলে, মধ্যভাগ হইতে চাউল নির্গত হয় ও তাহার উপরিভাগে আর একটি পাতলা আবরণ পাওয়া যায়, এইটিই প্রকৃত বীজাবরণ। উপরের আবরণটি শুষ্ক ফলের বহির্ভাগ মাত্র; ধান ভানিবার সময় ইহা তুষ আকারে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। বীজাবরণের মধ্যে যে বীজ দেখা যায় উহার দুইটি অংশ উপরিভাগের বৃহত্তর অংশ শ্বেতসার পদার্থে পরিপূর্ণ এবং নিম্নভাগে উহার প্রান্তদেশে অল্প বাঁকান যে অংশটি বর্তমান, উহার মধ্যে ভবিষ্যৎ ধান গাছের ভ্রূণ-শিশু নিদ্রিত রহিয়াছে।

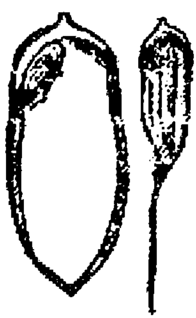

ধান ও উহার কর্তিতরূপ

পানিতে ভিজাইলে এই সুপ্ত-শিশু জাগ্রত হইতেই হাত-পা ছড়াইয়া সে বাহিরে আসিতে চাহে। পানিতে না ভিজিলে কোনও বীজেই অঙ্কুর হয় না। প্রথমে নির্গত হয় তাহার পাদদেশ, মূলের আকারে। তবে উহাতে শিকড় থাকে না। পূর্বে এক-বীজদলী গাছের জন্ম সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি, তাহা ইহার সম্বন্ধে খাটিয়া যায়। কিন্তু এখানে ঐ মূল হইতে গুচ্ছ আকারে বহু সংখ্যক সূত্র-সদৃশ ক্ষুদ্র মূল নির্গত হইয়া থাকে। এই মূলগুলির সাহায্যেই ক্ষুদ্র পাদপ-শিশুটি মৃত্তিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজ দেহ-বৃদ্ধির জন্য আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। একটি জিনিস এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বীজ হইতে শিশু-গাছের জন্মের জন্য বাতাসের অম্লজান ও সূর্যের উত্তাপ বিশেষ প্রয়োজন। অম্লজান ও উত্তাপের অভাবে শিশু গাছ জন্মাইতে পারে না।

মানব-শিশু শৈশবাবস্থায় অত্যন্ত অসহায়। মাতা দয়া-পরবশ হইয়া স্তন্য দান করেন বলিয়াই সে বাঁচিয়া যায়। শৈশবকালে প্রত্যেক প্রাণী সম্বন্ধে সেই একই কথা খাটে। শিশু-পাদপ অতি শৈশবকালে আহার-অন্বেষণে অপারগ বলিয়া বৃক্ষ মাতা তাহার ভবিষ্যৎ শিশুর জন্য এই বীজাবরণের মধ্যো শ্বেতসার জমাইয়া রাখে। লোভী মানব এই শিশুর খাদ্যই অপহরণ করিয়া নিজ সেবায় নিয়োজিত করে। আবার এদিকে মানবের তাহা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ও নাই; সুতরাং সে কথার এখন আর উল্লেখ করিব না। এই যে শ্বেতসারের সঞ্চিত ভাণ্ডার, ইহারই সাহায্যে প্রাথমিক অবস্থায় গাছের শিশু-জীবন গঠিত হইতে থাকে। অবশ্য এই গঠনকার্যের জন্য পানি নিরতিশয় প্রয়োজন। পানির অভাবে এই কার্য ঘটে না, সে কথা এখন না বলিলেও তোমরা জানিয়াছ। গাছ ঈষৎ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে মাটি হইতে আহার্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। মৃত্তিকায় তাহার জন্য কি খাদ্য রহিয়াছে? তোমরা সকলেই শুনিয়াছ, জমিতে সার না দিলে ধান ভাল হয় না। এই সারই গাছের খাদ্য। উহার মধ্যে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান; সেইগুলি পানিতে দ্রবীভূত হইয়া মূলের সাহায্যে বৃক্ষদেহে প্রবেশ করে। গাছের জীবনী-শক্তির ব্যবহার হয় এইখানে। এই জীবিত কণাগুলির সাহায্য না পাইলে গাছের শিকড় তাহার খাদ্যবস্তু মাটি হইতে টানিতে পারে না। এই খাদ্য গ্রহণের কার্যটিও বড় চমৎকার কিন্তু উহার সম্পূর্ণ বিবরণ এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে না। আরও বেশী পড়িলে সেসব কথা জানিতে পারিবে। তবে মূলের সাহায্যেই যে গাছের মধ্যে এই খাদ্য-বস্তু গমন করে তাহার পরীক্ষা করা কঠিন নহে।

ধানের শিশু-পাদপের আবির্ভাব

গাছের খাদ্য

কতগুলি গাছ মূল-সমেত মাটি ভিজাইয়া উঠাইয়া আন এবং উহাদিগের একটিকে একখানি শুষ্ক পাথরের উপর রাখিয়া দাও; এবং অন্যগুলি কয়েকটি চোলান পানিপূর্ণ বোতলের মধ্যে রাখ। এই বোতলগুলির একটিতে গাছের খাদ্য-পদার্থ ক্যালসিয়াম এবং পটাশিয়াম নাইট্রেট, অল্প একটু ফস্‌ফেট এবং লৌহের ক্লোরাইড দাও, কিন্তু অন্য কয়টির মধ্যে ইহাদিগের কোনও কোনওটি দিও না। দেখিবে খোলা পাত্রের গাছটি প্রথম দিনেই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই শুকাইয়া যাইবে। পঞ্চম পাত্রের গাছ সতেজভাবে বাড়িয়া চলিবে। কিন্তু প্রথম পাত্রে কেবল মাত্র পানিতে, গাছটি বাঁচিয়া থাকিলেও তেমন বাড়িবে না। দ্বিতীয় পাত্রে চুনের অভাব, তৃতীয়ে নাইট্রেট এবং চতুর্থে লৌহের অভাবে গাছটির বৃদ্ধি প্রতিহত হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হয় যে, এই সকল পদার্থই পাদপ-দেহের পূর্ণ পরিণতির জন্য বিশেষ দরকার।

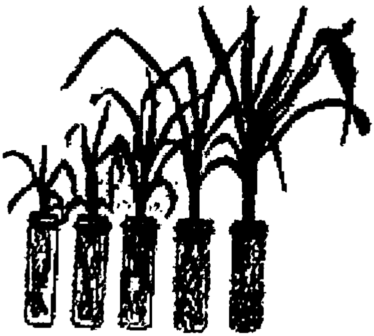

১ ২ ৩ ৪ ৫

ধানগাছের শিশুগুলি অল্প একটু বাড়িলেই উহাদিগকে উঠাইয়া পানিপূর্ণ অন্য জমিতে রোপণ করা হয়। এই নূতন জমিতে উহাদিগকে পরস্পর হইতে অল্প দূরে বসাইতে হয়; কারণ, কাছাকাছি থাকিলে উহাদিগের বাড়িয়া উঠিতে অসুবিধা ঘটে এবং ফলনও ভাল হয় না।

ধান গাছের পূর্ণ পরিণতি

শিকড়ের সাহায্যে যেমন পানি ও নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণ পাদপ-দেহে গমন করে, তেমনি পত্র-সহযোগে নূতন দেহ নির্মাণের বস্তু গঠিত হইতে থাকে। গাছের জন্য পানি যেরূপ প্রয়োজন, বাতাসও তেমনই দরকার; সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই বাতাস হইতে ধানের গাছগুলি যে বাষ্পীয় রসদ সংগ্রহ করে, তাহাই পরিবর্তিত হইয়া গাছের কাণ্ড এবং পত্র নির্মাণে সাহায্য করে। এবং কিছুকাল পরে এই পদার্থই পত্রমধ্যে রূপান্তরিত হইয়া, নব কিশলয়রূপে ধান গাছের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হয় — শরৎ ঋতুর শেষ ভাগে, কার্তিকের এক মনোরম মুহূর্তে দিবাভাগের প্রখর সূর্যতাপ এবং নৈশ আকাশের স্নিগ্ধ মধুর শৈত্য আনিয়া যে বারিবিন্দু শিশিরের রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, মনে হয় যেন তাহারই সহায়তা এই ধান্য-কিশলয়ের পরিপুষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন। ধানের ফুল একই বৃক্ষে বহুসংখ্যক প্রস্ফুটিত হয়। ইহারা পূর্ববর্ণিত বহু-পুষ্পী গুচ্ছ (inflorescence) নামে পরিচিত।

ধান্য-পুষ্পে বৃন্ত নাই, উহার মধ্যে দুইটি ছোট ও দুইটি অপেক্ষাকৃত বড় পৌষ্পিক পত্র রহিয়াছে। ইহারই মধ্যে বিভিন্ন পুষ্পগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূর্ণ কিশলয়রূপে প্রস্ফুটিত হয়। প্রত্যেকটি পুষ্পের পরাগকেশরের সংখ্যা সাধারণতঃ ছয়টি দেখা যায়। উহাতে পাপড়ি বা দল নাই, তাহার পরিবর্তে দুইটি লডিকিউল (Lodicule) রহিয়াছে। গর্ভকেশর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখাযুক্ত পালকসদৃশ দীর্ঘ দণ্ড স্বরূপ। ইহাই গর্ভমুণ্ড নামে অভিহিত ও কেশরপূর্ণ ডিম্বাশয় বা বীজকোষ হইতে নির্গত হইয়া ইহারা দুই পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়ে। এই ক্ষেত্রে পরাগান্বয়-ক্রিয়া বায়ু দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহার ফলে পরাগের নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া ইহাতে উহার পরিমাণও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন, 'এমন ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে?' কিন্তু কবিকল্পনায় জড় জগতের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিবৃত্ত হয়তো ধরা পড়ে নাই যে, এই ঢেউ-খেলান ক্ষেত্রের মধ্যে বায়ুসঞ্চালিত ধানের গাছগুলি পরস্পরের পুষ্প হইতে পরাগ ছড়াইয়া অন্যের বীজকোষকে সমৃদ্ধ এবং ফলবান করিয়া তোলে। ইহাই সঙ্কর পরাগান্বয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ধানগাছগুলির ফলবতী হইবার জন্য এই শারদ দিনের নির্মল সময় নির্বাচন করিয়াছে এবং এই বাতাসের জন্যই। বাতাস না বহিলে ধান ফলিবার আশা সুদূরপরাহত।

ধানের ফুল ও ফুলের একাংশ

ডিম্বকোষে পরাগের স্পর্শ ঘটিতেই ধানের ফল প্রস্তুত হইতে শুরু হইয়া যায়। তখন পাতার সাহায্যে দ্রুতগতিতে শ্বেতসার প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া গাছের শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া আসিয়া এই ফলমধ্যে সঞ্চিত হয়। যতই দিন যায়, ফল ততই সমৃদ্ধ হইতে থাকে এবং মাসাধিক কালের মধ্যেই তরল দুগ্ধের ন্যায় রস, ঘনীভূত ও শক্ত হইলে, উহা সম্পূর্ণ ফলরূপে পরিণত হইয়া উঠে। এই সময় গাছের জীবনের উদ্দেশ্যও শেষ হইয়া যায়। পরে ক্রমে পাতার সবুজ বর্ণ নষ্ট হইতে থাকে, এবং তরুণের চিহ্ন হরিতের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে, বার্ধক্যের অগ্রদূত স্বরূপ পীতের আভা আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ধান পাকিতেই গাছ শুকাইতে আরম্ভ করে। এই সকল গাছকে বার্ষিক ফসল বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহারা ফল দান করিয়াই মরিয়া যায়।

ধানের চাষ

আমাদের দেশ ধানের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল, সুতরাং এখানে ধান চাষের উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাপানীরা ধান চাষে কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করে, ইহাদের দুই একটির উল্লেখ করা বোধ হয় দরকার। তাহারা ধানের চারাগুলিকে

পরস্পর হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবধানে এবং সোজা সারি দিয়া রোপণ করে, ফলে আগাছা ইত্যাদিকে সহজে নিড়ান সম্ভব হয়। তাহার উপর জমিতে সার দিবার ব্যবস্থা তাহাদের একটু ভিন্নরূপ। তাহারা জমি তৈয়ার করিবার সময়, এক সঙ্গে সমস্ত সার না দিয়া, গাছ যেমন বাড়িতে থাকে তেমনি কিছু পরিমাণ আধুনিক সার দিয়া ধানের ফলনের প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। এদেশে জমিতে একবারে জমি তৈয়ার করিবার সময় সমস্ত সার দেওয়া হয়, এই প্রথা তেমন উপাদেয় নহে। গোড়াতেই অধিক সার দিলে গাছগুলি বেশ বড় হয় বটে কিন্তু ফলন ভাল হয় না, গাছও বাতাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চাষের উন্নতির জন্য এই দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

ষেটি ধান

এইখানে আরও এক প্রকার ধানের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহাকে বিহার অঞ্চলে ষেটি ধান বলে। ইহার জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি প্রয়োজন। নিম্নভূমিতে অধিক পানিতে এ ধান জন্মায় না। প্রায় দুই মাস বা ষাট দিনে এ ধান পুষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় ইহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। আষাঢ়ের প্রথম দিকে রোপণ করিয়া ইহাকে ভাদ্রের মাঝামাঝি কাটিয়া লওয়া হয়। এ ধানের বিশেষত্ব এই যে, উহার ফুল অন্যান্য ধানের ন্যায় পাতার বাহিরে আসে না, লোক চক্ষুর অন্তরালে পাতার আবরণের মধ্যে থাকিয়া সম্ভবতঃ স্বকীয় পরাগান্বয়ের ফলে একই ফুল হইতে উহার ফল উৎপন্ন হয়। বর্ষার দিনে উহার ফুল প্রস্তুত হয় বলিয়াই বুঝি ইহার জন্য আলাদা ব্যবস্থা হইয়াছে; অন্যথায় ফুলগুলি বৃষ্টিধারায় উহাদের পরাগরাজি হারাইয়া ফেলিত। ধান পাকিলেও পাতার আবরণেরই উহা থাকিয়া যায় তবে কখনও কখনও এই সময় উহাকে আবরণের বাহিরেও দেখা যায়।

গম বা গোধূম পাকিস্তানের নানাস্থানে প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উহার চাষ শীতকালে বর্ষার শেষে করা হয়। উহার জীবন-কথা অনেকাংশে ধানের সহিত একরূপ হইলেও উহা কতকটা ভিন্ন।

মটর

মটর বীজ

এক-বীজদলী ধানগাছের পরেই একটি দ্বি-বীজদলী গাছের বিশদ বিবরণ দিব। সূর্যমুখীও দ্বি-বীজদলীর শ্রেণীভুক্ত। এইবার কিন্তু মটরের কথা বলিব, ইহাও দ্বি-বীজদলী। মটরদানা কতকগুলি লইয়া পানিতে ভিজাইয়া দাও, এবং বেশ ভালভাবে ভিজিলে একটি দানা লইয়া পরীক্ষা কর। দেখিবে ইহার বহিরাবরণের এক পার্শ্বে একটি নাতিদীর্ঘ কাল দাগ রহিয়াছে। এই স্থানেই মটর দানাটি শুঁটির সহিত সংযুক্ত ছিল। ভিজা দানাটির গায়ে অল্প চাপ পড়িতেই এই কাল দাগটির এক পার্শ্ব দিয়া অল্প একটু পানি নির্গত হইয়া আসিবে। এই স্থানে ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র রহিয়াছে এই এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া পানি আবরণ ভেদ করতঃ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। একটি ভিজা ছোলার দানা পরীক্ষা করিলেও একই জিনিস দেখিতে পাইবে। এই ছিদ্রটি মাইক্রোপাইল (micropile) নামে অভিহিত; উহার নিকটে টেস্টা (testa) বা বীজাবরণের উপর নাতিদীর্ঘ, সঙ্কীর্ণ যে দাগটি বর্তমান, তাহাকে হাইলাম (hilum) বলে। বীজাবরণটি ছাড়াইয়া ফেলিলে উহার মধ্যে দেখিবে, সুপুষ্ট দুইটি বীজদল এবং হাইলামের অন্য পার্শ্বে, অন্তর্বর্তী স্থানে পাদপের সুষুপ্ত ভ্রূণ-শিশুটি উহাদিগকে সংযুক্ত করিয়াছে। এই বীজদল দুইটি, সূর্যমুখীর তুলনায় অধিকতর পুষ্ট এবং স্থূল; ইহারই মধ্যে কিন্তু পাদপের অল্পকালের খাদ্য সঞ্চিত রহিয়াছে। এই খাদ্য কেবলমাত্র শ্বেতসার-পূর্ণ নহে, বরং উহার সহিত আমিষজাতীয় পদার্থও রহিয়াছে। বীজদলের মধ্যস্থানে যে ভ্রূণ-মুকুলটি বিদ্যমান, পরে উহাই মটর চারার কাণ্ডে পরিণত হইবে। একটু সাবধানে পরীক্ষা করিলে উহার অগ্রভাগে অতি ক্ষুদ্র পত্রের সঞ্চার হইয়াছে দেখিতে পাইবে।

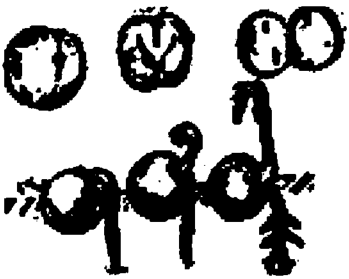

উপরে ছোলার বীজ
নীচে মটর চারার জন্ম

মটরের শিশু-পাদপ

মটর দানা ভিজা মাটিতে বসাইয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, দুই তিন দিনের মধ্যেই উহার অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। সূর্যমুখীর সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ইহার ভ্রূণদণ্ড বা হাইপোকোটিল সূর্যমুখী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর; ইহার মূল নির্গত হইয়া মাটির

মধ্যে গমন করিবে, এই প্লুমিউল ঊর্ধ্বমুখে উত্থিত হইয়া পাতা মেলিতে থাকিবে বীজদল মাটির মধ্যে থাকিয়া শিশু-পাদপটির খাদ্য সরবরাহ করে। ক্রমে মূল দ্বারা মাটি হইতে খাদ্য আহরণ করিবার শক্তি জন্মিলে কয়দিনের মধ্যেই বীজদলের মধ্যস্থিত আহার্য-বস্তু নিঃশেষ হইয়া যায়। যে-সকল গাছের খাদ্য-সরবরাহ ইহার অনুরূপ প্রথায় হইতে থাকে, তাহাদিগকে হাইপোজিয়াল বা মৃদ্বাসী নাম দেওয়া হয়। ছোলার গাছও এই এক প্রথায় বাহির হইয়া থাকে। সুবৃহৎ আম্রগাছের শিশুও এই একইভাবে তাহার বাল্যজীবনে পালিত হয়। এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, মটরের জন্য চুন-প্রধান বেলে মাটির জমিই পরম উপাদেয়। গোবরের সার ইহার জন্য তেমন উপকারী নহে।

মটর গাছের একাংশ, ফুল, শুঁটি ও ফুলের দ্বিখণ্ডিত অংশ

ইহার ভ্রূণ-মুকুলের অগ্রভাগ হইতে নবপত্রের সূচনা হয়। পত্র নির্গত হইবার পর পুনরায় ঐ মধ্যস্থিত কাণ্ডের অঙ্কুর ক্রমে আরও বাড়িতে থাকে এবং ক্রমশঃ পাতা মেলিয়া চলে। মটর গাছের পাতা যৌগিক (compound leaf); ইহা কাণ্ডের যে স্থান হইতে নির্গত হয়, তথায় পত্রসদৃশ্য যে সবুজ ফলকটি আবির্ভূত হয়, তাহা ইহার উপ-পত্র নামে পরিচিত হইতে পারে। মটরের গাছ কিন্তু বৃহৎ আকার গ্রহণ করে না, বরং উহা প্রায় লতার আকারে বাড়িয়া চলে; এই যৌগিকপত্রের অগ্রভাগের ফলক একরূপ সূক্ষ্ম সূত্রে পরিণত হয়; ইহাই আকর্ষ (tendril) নামে পরিচিত, ইহারই সাহায্যে লতাগুলি কোনও শক্ত পদার্থকে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সর্বশেষে এইরূপ সঙ্গমস্থান

হইতে নব কিশলয় নির্গত হইয়া, পরে পুষ্পে পরিণত হয়। পুষ্প হইতে যে ফলের সৃষ্টি হয়, তাহাই মটর শুঁটি। দীর্ঘ শুঁটি পুষ্পের নিম্নভাগ হইতে বর্ধিত হইতে থাকে, এবং তখন এই কোষের অগ্রভাগের ফুল ক্রমে শুকাইয়া পড়িয়া যায়। শুঁটির মধ্যে বিভিন্ন-সংখ্যক মটর বীজ পুষ্ট হইতে থাকে।

মটরের শিকড়ে একটি বিশেষত্ব রহিয়াছে। এই শিকড় শিম্ব জাতীয় বলিয়া পরিচিত। শিকড়ের সূক্ষ্ম সূত্রাগ্রে একরূপ জীবাণু প্রবেশ করিয়া বর্ধিত হয় ও তথায় গ্রন্থির আকার দান করে। এই জীবাণু বাতাসের নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া তাহাকে অন্য পদার্থে পরিণত করে; ইহা তখন যৌগিক নাইট্রোজেনরূপে জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং মটর জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় বাতাসের নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন সারে রূপান্তরিত করিবার ক্ষমতা রাখে।

ধান ও মটরের তুলনামূলক পরিচয়

এখন তোমরা এক-বীজদলী ও দ্বি-বীজদলী উদ্ভিদের কতকটা পরিচয় পাইয়াছ। এইবার উহাদিগের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা দরকার মনে হইল।

১। এক-বীজদলী গাছ— ধান ও গম ইহারা ঘাস জাতীয় গাছ এবং দ্বি-বীজদলী গাছের উদাহরণ শিম বা মটর।

২। দ্বি-বীজদলী গাছ — মটরের প্রধান শিকড়ে রহিয়াছে। ধানের কিন্তু প্রধান শিকড় নাই। তাহার পরিবর্তে উহার গুচ্ছ-মূল বর্তমান।

৩। মটরের কাণ্ড দুর্বল গাঁটগুলি তেমন স্পষ্ট নয়; কিন্তু ধানের কাণ্ড সবল, ঋজু ও স্পষ্ট গাঁটবিশিষ্ট।

৪। মটরের পাতা যৌগিক — উহার গোড়ায় দুইটি উপ-পত্র বর্তমান, যৌগিক পত্রের প্রান্তবর্তী অনুফলক পরিবর্তিত হইয়া আকর্ষে পরিণত হয়; কিন্তু ধান গাছের পাতা যৌগিক নহে — উহার আকর্ষও নাই। পাতার মধ্যে মটর গাছে জাল শিরাবিন্যাস বর্তমান, কিন্তু ধান গাছের শিরাগুলি সমান্তরাল।

৫। এই দ্বিবিধ উদ্ভিদের পুষ্পও একটু ভিন্ন। মটরের ফুল সবৃন্তক কিন্তু ধানের ফুলে বোঁটা নাই। মটরের ফুলে পাঁচটি বৃত্তাংশ ও পাপড়ি রহিয়াছে এবং চারিটি পৌষ্পিক পত্র উহার ফুলকে ঘিরিয়া থাকে।

৬। মটরের পুংকেশর দশটি। উহার মধ্যে নয়টির সূত্র সম্মিলিত ও একটি সূত্র পৃথক রহিয়াছে। কিন্তু ধানের ফুলের পুংকেশর ছয়টি মাত্র।

৭। ফুলের মধ্যে মটরে একটি, কিন্তু ধানের দুইটি গর্ভমুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়।

৮। মটরের একটি ফলে মটরশুঁটি মাঝামাঝি ফাটিয়া থাকে। উহার বীজের সংখ্যাও একাধিক, কিন্তু ধানের ফল কখনও ফাটে না এবং উহাতে একটি মাত্র বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই চাউল।

৯। এই দুই গাছই প্রতিবৎসর জন্মগ্রহণ করে, ফল দেয় ও পরে মরিয়া যায়।

১০। ধান কয়েক রকমেরই দেখা যায়। ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বা বর্ষার পূর্বে এবং কাহাকেও বা বর্ষার মধ্যে রোপণ করিতে হয় এবং উহারা কার্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে পাকে। মটর কিন্তু অধিক পানিতে জন্মায় না বলিয়া উহাকে বর্ষা-শেষে বপন করিতে হয় (কার্তিক মাস), এবং উহা চৈত্রমাসে পাকে।

দ্বিতীয় পর্ব

জীব-জীবন

"বিশ্বপ্রতি, স্পর্শে তোমার
সৃষ্টি হ'ল জীবন যত;
কৃতজ্ঞ সব হৃদয়গুলি
প্রশংসাতে পরিপ্লুত।"

—ঋগ্বেদ

জীবনের আবির্ভাব

জীবনের সমস্যা অতি পুরাতন। জীবন বলিতে সঠিক আমরা কি বুঝি? যাহা অদৃশ্য কোনও শক্তির বলে চঞ্চল, অর্থাৎ যাহাকে আমরা গতিশীল দেখিয়া থাকি, তাহাই কি জীবিত পদার্থ। মাঝে মাঝে ভূ-পৃষ্ঠ আন্দোলিত হয় উহারই অন্তর্নিহিত কোনও শক্তির ফলে। এই আন্দোলন কি জীবনের পরিচায়ক? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর এই মাটি, পাথর, পানি, বায়ু সবই জীবনী-শক্তিসম্পন্ন। ইহাদিগের চঞ্চল গতি আমরা প্রায়ই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু ইহাদিগকে আমরা আজিও জীবিত পদর্থের মধ্যে গণ্য করি নাই। আমরা বলি, যাহারা ইচ্ছামতো ভ্রমণ করিতে পারে, তাহারাই জীবিত। এই গতির সহিত জীবিত জনের আরও কতকগুলি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা :— (১) জীবিত পদার্থ আহার করে। (২) শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। আহার ও শ্বাস-কার্যের ফলে জীবিত জন বাহির হইতে নানা পদার্থ লইয়া নিজ দেহ পুষ্ট করে এবং নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদার্থ উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করে। (৩) ইহারা উত্তেজনায় প্রতিবাদ করে এবং (৪) নিজ বংশ-বিস্তার কল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া, পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতগুলি বৈশিষ্ট্য যাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই আমরা জীবিত নামে অভিহিত করিতে পারি। অন্যথায় তাহা জড় শ্রেণীভুক্ত হইবে।

জীবনের আদর্শ যদি ইহাই হয়, তবে পাথর, মাটি, পানি বা বায়ু জীব-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু সব্জি-জগৎ সম্বন্ধে সেই একই কথা বলিতে পারা যায় না। বিভিন্ন

গাছের জীবন-কথার যেরূপ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, এই সজি-জগতের প্রতিটি অধিবাসীই জীবশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। একটা জিনিস ইহাদিগের সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা গতিশীল নহে, অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করা ইহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইহাদিগের দেহ-পুষ্টির সময় উহার অগ্রগতি দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহারা আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। নাই বা তাহা সম্ভবপর হইল। পঙ্গু মানব গিরি লঙ্ঘন করিতে না পারিলেও, যাবৎ তাহার দেহের অন্যান্য যন্ত্র তাহাদিগের নিয়ন্ত্রিত কার্য করিয়া চলিয়াছে, তাবৎ সে জীবিতের শ্রেণীভুক্ত হইবে। গাছ সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। গাছ তাহার জন্মস্থানে রহিয়াই আলো-বাতাস-মৃত্তিকার সহায়তায় নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া চলিয়াছে। ধানের শিশু চারাটি যতদিন তাহার জলীয় খাদ্য হইতে বঞ্চিত না হয় ততদিন সে বাড়িয়াই চলে। দেহের পুষ্টি সম্পূর্ণ হইলে ফুলের আবির্ভাব ঘটে তাহার শীর্ষদেশে। আরও কিছুদিন গত হইলে সে ফুলে ফলে পরিণত হয়; এইরূপে তাহার বীজরূপী বংশধরকে সে পরিপুষ্ট করে। জীবনের এই চরম উদ্দেশ্য সফল হইলেই সে জরা-জীর্ণ দেহকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত করিয়া চির-বিশ্রাম লয়। মটরের চারা সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। যতদিন যৌবনের আবেগ তাহার শিরা-উপশিরায় চঞ্চল গতিতে প্রবাহিত হয়, ততদিন সে নিত্য নতুন শাখা-প্রশাখা মেলিয়া, নব কিশলয়ে সজ্জিত হইয়া থাকে। কত ফুলই না তাহার হরিৎ দেহে বিচিত্র ভূষণ পরাইয়া দেয়। তাহার পর তাহার পাতাগুলির মধ্যে দীর্ঘ শুঁটিগুলির দোদুল্যমান রূপ মানবমনকেও মুগ্ধ করে। কিন্তু মানব এই অবস্থাতেও তাহাকে নির্মমভাবে ছিঁড়িয়া আনে, রসনার পরিতৃপ্তির জন্য।

তাহা হইলে গাছ সত্য সত্যই জীব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবুও যেন কিরূপ সন্দেহ হয় — মন যে সম্পূর্ণরূপে সায় দেয় না! গাছ কি উত্তেজনার কোনও প্রতিবাদ করে, আঘাত দিলে সে কি ব্যথা পায়? তোমরা খেয়ালের বসে গাছের ডাল কাটিয়াছ, পাতা ছিঁড়িয়াছ, ফুল তুলিয়াছ; কিন্তু মূক ঐ পাদপটির অন্তরের ব্যথা তো উপলব্ধি কর নাই। এ আঘাত গাছের প্রাণেও তেমনি বাজে, যেমন অন্য কোনও প্রাণীর বেলায় ঘটিয়া থাকে। লজ্জাবতীর ক্ষুদ্র পাতাটি স্পর্শ পাইলেই সঙ্কুচিত হয়। এখানে গাছের উত্তেজনায় প্রতিবাদ প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্য গাছের ডাল কাটিলে আহত স্থান হইতে রসও ক্ষরিত হয়। ইহা প্রায় প্রাণীদেহের কাটা ঘা হইতে রক্তনির্গমনের সমতুল্য। ভারতবর্ষের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্বর্গীয় স্যর জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ-দেহেও, প্রাণীর ন্যায় প্রাণশক্তি চিরচঞ্চল রহিয়াছে। তোমরা বড় হইয়া সে সব কথা শিখিবে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য (adaptation)

পাদপ-জীবনের আলোচনা করিতে গিয়া আরও একটি কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। ইহাদিগের আশ্চর্য ক্ষমতা রহিয়াছে যে, ইহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত

সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে; এবং বহির্দেশের প্রভাবের ফলে উহাদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি যে. আলোকের তারতম্যে গাছের কলেবর ও পত্ররাজির স্বাভাবিক বৃদ্ধি পরিবর্তিত হইতে থাকে। তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণের ফলে বৃক্ষ-জীবনে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। যখন এই বাহিরের প্রভাবের সহিত গাছগুলি সামঞ্জস্য রাখিতে না পারে তখনই উহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অল্প আলোকিত স্থানে কোনও গাছ বাড়িতে থাকিলে দেখা যায়, উহার পাতাগুলির রং এবং আকার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। পাতাগুলি যেমন দৈর্ঘ্যে বড় হয়, তাহার কাণ্ডও তেমনি স্বাভাবিক আকার অপেক্ষাও দীর্ঘতর হইয়া থাকে। মনে হয় অধিকতর আলো পাইবার জন্যই এই চঞ্চল প্রচেষ্টা। এইরূপ একটি গাছকে হঠাৎ তীব্র আলোকের মধ্যে রাখিলে তাহার মরিয়া যাইবার সম্ভাবনাই অধিক, তবে অল্প অল্প করিয়া আলোক বাড়াইতে থাকিলে ক্রমে নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া উহা বাঁচিয়া যাইবে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, গাছ প্রকৃতই প্রাণবান। আমরা এইবার জীব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিব জীবনের এইরূপ ব্যাখ্যা প্রাণীবর্গের উপর কিরূপ খাটিতে পারে। প্রাণী বলিতে আমরা ক্ষুদ্র জীবাণুগুলিকেও এই শ্রেণীভুক্ত করিতে চাই। পূর্বে তোমাদিগকে পাদপ-কণা এবং প্রাণীকণার কথা বলিয়াছি। এই প্রাণী-কণাই জীবাণু নামে অভিহিত। এইরূপ ক্ষুদ্র জীব বহুসংখ্যক বর্তমান। ইহাদিগের দেহ কোষাবরণ দ্বারা আবৃত, এবং ঐ আবরণ-মধ্যে কেন্দ্রকণার (nucleus) চতুস্পার্শ্বে রহিয়াছে লালা সদৃশ প্রটোপ্লাজম। ইহারা নিজ দেহ পরিপুষ্টির জন্য বাহির হইতে খাদ্য গ্রহণ করে। তবে এই খাদ্য এমন অবস্থায় দেওয়া দরকার, যাহা গ্রহণ করা ইহাদিগের জন্য সহজসাধ্য হইতে পারে। এইরূপে ইহারা ক্রমে সংখ্যায় বাড়িতে থাকে। সুতরাং বলিতে হয় যে, এই ক্ষুদ্র জীবকণাগুলিও প্রাণীর প্রধান গুণের অধিকারী। সুতরাং প্রাণী জগতের সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের একটি অধিবাসীর উল্লেখ করিয়া, প্রাণশক্তির বিশিষ্ট পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

প্রাণীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে প্রটোজোয়া, পরিফেরা প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণী অন্তর্ভুক্ত। পূর্বোক্ত প্রাণীকণা এই প্রটোজোয়ার অন্তর্গত। আমাদিগের পরিচিত স্পঞ্জ পরিফেরা-শ্রেণীর একরূপ সামুদ্রিক জীবের দেহ-কঙ্কাল মাত্র; ইহারা অমেরুদণ্ডী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাণী মেরুদণ্ডী নামে পরিচিত। এইস্থানে অমেরুদণ্ডী কেঁচো ও মেরুদণ্ডী প্রাণী মাছের কথা আলোচনা করিতেছি। পরে আরও কতকগুলি প্রাণীর কথা বলিব।

উদ্ভিদের কথা তোমরা পূর্বেই শিখিয়াছ। উদ্ভিদ-জীবনের আলোচনা করিতে গিয়া তাহাদিগকেও আমরা জীবের অন্তর্গত করিয়াছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই দ্বিবিধ জীবের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, সেইগুলির কথাও এখানে উল্লেখ করিলাম।

জীব ও জড়ের পার্থক্য

১। জীব ও জড়ের মধ্যে সমূহ পার্থক্য রহিয়াছে; জড় কখনও খাদ্য গ্রহণ করে না বা তাদের দেহের বৃদ্ধি কখনও দেখা যায় না, অথচ উদ্ভিদ বা প্রাণী উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করে ও তাহার সাহায্যে স্ব স্ব দেহ পুষ্ট করিয়া থাকে।

২। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই নিজ নিজ বংশ-বিস্তার করিতে সক্ষম; যদিও উহাদের বংশ-বিস্তারের উপায় বিভিন্ন। জড় পদার্থ কখনও ঐরূপ করিতে পারে না।

৩। পূর্বেই তোমরা শিখিয়াছ যে, উদ্ভিদ বা প্রাণী উভয়েই কোনও উত্তেজনা পাইলে তাহাতে সাড়া দিয়া থাকে। ঐরূপ প্রতিক্রিয়া অবশ্য এই দ্বিবিধ বস্তু হইতে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশিত হয়। জড় কখনও এইরূপ সাড়া দিতে পারে না।

৪। ইচ্ছামতো চলাফেরা করা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য। উদ্ভিদ এইরূপ শক্তির বিকাশ ব্যাপকভাবে না দেখাইলেও কোনও কোনও উদ্ভিদ ঐরূপ ইচ্ছামতো নড়াচড়া করিতে পারে।

৫। শ্বাসকার্য সম্পন্ন করা জীবের প্রধান লক্ষণ। উদ্ভিদও ঐরূপ কার্য করিতে সমর্থ; কিন্তু জড়ের সে ক্ষমতা নাই। উভয়ের দেহে শ্বাস যন্ত্রের আকার ও ক্রিয়া বিভিন্ন।

৬। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই প্রাণ-সম্পন্ন বলিয়া ইহার জন্ম-মৃত্যু আইনের অধীন। জড় পদার্থের মৃত্যু ঘটে না, উহাদের জন্মগ্রহণও আমরা দেখিতে পাই না।

৭। অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প অধিক মাত্রায় প্রাণীদেহের হানিকারক। উদ্ভিদ উহা হইতেই অঙ্গার ভাগ গ্রহণ করিয়া নিজ দেহের পুষ্টি ঘটায়। এইরূপ উদ্ভিদ প্রাণী জীবনকে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং বায়ু মার্গে অঙ্গার-দ্বি-অম্লজের আধিক্য ঘটিতে দেয় না। জীবদেহের পুষ্টির জন্য তাহাকে উদ্ভিদের উপর অথবা অন্য প্রাণীর মাংসের উপর নির্ভর করিতে হয়।

কেঁচো

(Earthworm)

তোমরা বর্ষার দিনে মাটির উপর একরূপ দীর্ঘদেহী কীটকে বিচরণ করিতে দেখিয়া থাকিবে। সাধারণতঃ ইহাকে আমরা কেঁচো বলিয়া থাকি। ইহারা কাহাকেও কামরায় না, কিন্তু ইহাদের কদাকার বক্রগতি আমার মনে ঘৃণার উদ্রেক করে। তাই আমরা উহার প্রতি চাহিয়া দেখি না। কিন্তু ইহারা আমাদের বন্ধুর কাজ করিয়া থাকে। মাটি খুঁড়িয়া তুলিয়া, বাগানের সব জায়গাটুকু সে গাছপালার জন্য উত্তমরূপে উপযুক্ত করিয়া

[redacted]

তোলে। দেখিতে তেমন সুন্দর নয়, মনকে বড় আকর্ষণ করে না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার দেহের গঠন, এবং জীবন-কথা যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হইবে মনে হয়। গতিশীল দীর্ঘদেহী এই কীট ঐ একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অবশ্য শ্রেণীর আলোচনা এখানে করিতে চাহি না, মাত্র কেঁচোর কথাই বলিব। মাছ ধরিবার সময় হয়তো তোমাদের কেহ, এই কদাকার কীটকে হাতে ধরিয়া দেখিয়াছ; আঙ্গুলের মধ্যে তাহার কিল্‌বিল্‌ গতি মোটেই আনন্দ দেয় না, বরং ঘৃণার উদ্রেক করে। তবে ধৈর্য থাকিলে উহার দেহের পরীক্ষা করিতে পারিবে।

দীর্ঘ নল-সদৃশ ইহার দেহটির পুরোভাগ অপেক্ষা পশ্চাদ্‌ভাগ ক্ষীণতর মনে হয়। সমস্ত দেহটি কতকগুলি গোলাকার খণ্ডের সমষ্টি মাত্র। এই খণ্ডগুলির সর্বপ্রথমটি সম্মুখের দিকে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি ও অপেক্ষাকৃত স্থূল। ইহার নিম্নভাগে রহিয়াছে উহার মুখ-গহ্বর। প্রত্যেকটির তলদেশে রহিয়াছে, অতি ক্ষুদ্র দুইটি কাঁটা সদৃশ লোম। এগুলি এমনভাবে বসান যে, সম্মুখে চলিবার সময় উহারা ইহার দ্বারা মোটেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না, পরন্তু এই লোমগুলির জন্যই উহাদিগের মসৃণ দেহ পশ্চাতে উল্টাইয়া পড়ে না। প্রত্যেকটি খণ্ডের নিম্নভাগে দুইটি করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্রও রহিয়াছে; তাহার সাহায্যে উহারা দেহের মধ্য হইতে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নিষ্কাশিত করিতে পারে। পঞ্চদশসংখ্যক দেহখণ্ডের নিম্নে আরও দুইটি বৃহত্তর ছিদ্র বর্তমান। ইহারাই পুং-জননেন্দ্রিয়ের কাজ করে। দ্বাত্রিংশ হইতে সপ্তত্রিংশ সংখ্যক দেহখণ্ডগুলি অন্যদের অপেক্ষা বৃহত্তর, কিন্তু উপরিভাগ দেখিয়া ইহাদিগকে পৃথক করিবার কোনও উপায় নাই। এই অংশ ক্লিটেলাম (clitallum) নামে পরিচিত। পরিশেষে ইহার দীর্ঘ দেহের শেষভাগে গুহ্যদ্বার বা পায়ু অবস্থিত রহিয়াছে।

মুখ-গহ্বর দিয়া ইহারা পচা পাতা প্রভৃতি পদার্থ গ্রহণ করে। এইগুলি খাদ্য-নালীর মধ্য দিয়া যেখানে নীত হয় তাহা থলি বিশেষ। তথা হইতে এই খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে প্রবেশ করে এবং পরে অন্ত্রের মধ্য দিয়া গুহ্যদ্বার বা পায়ু পথে নির্গত হইয়া যায়। ইহার পাচক-যন্ত্র এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি নলের ন্যায় বর্তমান রহিয়াছে, ইহাই পৌষ্টিক নালী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই নলের বহির্ভাগে এবং দেহাবরণীর অভ্যন্তরে উহার রক্ত চলাচলের শিরা বর্তমান। উহার শিরার মধ্য দিয়া লোহিত শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে। তবে এই রক্তকে সঞ্চালিত করিবার জন্য

কেঁচো দেহের অভ্যন্তর

হৃদয়ের ন্যায় কোনও বিশেষ যন্ত্র ইহার নাই। উহার দেহের ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ সংখ্যক বৃত্তখণ্ড বা সেগমেন্টের অভ্যন্তরভাগের রক্তবাহী শিরাগুলি অপেক্ষাকৃত স্ফীত এবং ইহারাই গতির অনুরূপ গতি-সাহায্যে এই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন করে বলিয়া ইহাদিগকেই উহার হৃদয় বলা হইয়া থাকে। তৃতীয় সেগমেন্টের নিম্নে গলনালীর উপরিভাগে কতকগুলি স্নায়ুসূত্র একত্র হইয়া স্ফীত আকারে বর্তমান। ইহাকেই মস্তকের স্নায়ুসূত্র বলা যাইতে পারে। ইহারই শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন সেগমেন্টে বর্তমান থাকিয়া, স্নায়ুর ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে।

কেঁচো উভ-লিঙ্গ (hermaphrodite) প্রাণী অর্থাৎ ইহাদিগের সন্তানোৎপাদনের জন্য পৃথক পুরুষ অথবা স্ত্রী নাই। ইহাদিগের প্রত্যেকের দেহে সন্তানোৎপাদনের দুইটি কেন্দ্রই বর্তমান। আমরা পুষ্পের মধ্যেও এইরূপ দেখিয়াছি। পুষ্পের ন্যায় এখানেও সঙ্কর সম্মিলনেই সন্তানোৎপাদন কার্য সংঘটিত হয়; এই সম্মিলনের ফলে যে ডিম্ব প্রস্তুত হয়, তাহাই ক্রিমিকোষে আবদ্ধ হইয়া মৃত্তিকায় রক্ষিত হইলে পরে উহার মধ্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমিগুলি নির্গত হইয়া ক্রমে বাড়িতে থাকে।

এই কেঁচোর মধ্যে আমরা প্রাণী জীবনের সকল বিশেষত্বই লক্ষ্য করিতেছি। সুতরাং ইহারা যে প্রাণী শ্রেণীভুক্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? পানির মধ্যে যে বিভিন্ন মৎস্য ছুটিয়া বেড়ায় তাহারাও অন্য শ্রেণীভুক্ত প্রাণী। উহাদের জীবনেও এই সকল বিশেষত্ব সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

মৎস্য

মৎস্য মেরুদণ্ডী জীব। ইহাদিগের শরীরের গঠন এবং অভ্যাসবিশেষে কতকগুলি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। এখানে মৎস্যের বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। উহাদিগের জীবধর্ম সম্বন্ধেই কিছু বলিতে চাই।

রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস প্রভৃতি মাছ এক পর্যায়ভুক্ত। ইহাদিগের শরীর এমনভাবে গঠিত যে, পানির মধ্যে চলাচল করিতে ইহাদিগের কোনও অসুবিধা হয় না। রুই, কাতলা, কৈ প্রভৃতির দেহের উপরিভাগ মসৃণ আঁশযুক্ত। ইহা এত পিচ্ছিল যে,

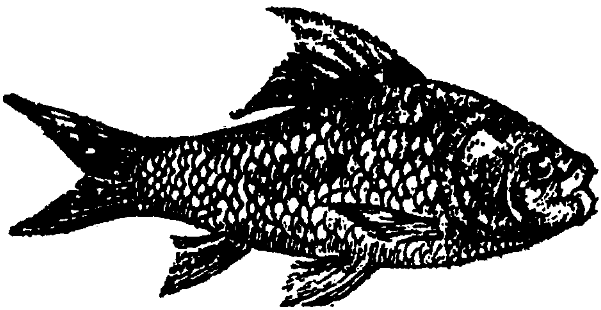

কাতলা

উহাদিগকে সহজে ধরিয়া রাখা যায় না। কোনও কোনও মাছের দেহ মসৃণ পর্দায় আবৃত — যেমন, সিঙ্গি, মাগুর, আড় প্রভৃতি। সম্মুখে মস্তক অপেক্ষা দেহের মধ্যভাগ অধিকতর স্থূল, এবং লেজের অগ্রভাগে ডানা (fins) রহিয়াছে। এই ডানাগুলি কাঁটা ও পাতলা পর্দার সাহায্যে এমনভাবে প্রস্তুত যে, তাহারা ইচ্ছানুযায়ী উহাকে সঙ্কুচিত বা বিস্তারিত করিতে পারে। ইহারই সাহায্যে পানির মধ্যে উহারা নিজ গতি নিয়ন্ত্রিত করে। লেজের অগ্রভাগে যে ডানা রহিয়াছে, উহারই সাহায্যে তাহারা নিজ গমন-পথ এবং গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া লয়। মাছ সমস্ত লেজটি ৪ সংখ্যার আকারে নাড়িয়া থাকে এবং এই সঞ্চালন-ক্রিয়ার ফলে দেহ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলে। জীবের এই প্রধান গুণটি, উহার মধ্যে এইভাবে পরিস্ফুটিত হয়। উহা আহার গ্রহণ করে। এই আহার্য পদার্থ মস্তকের পুরোভাগে অবস্থিত মুখ-গহ্বরের মধ্য দিয়া উদরে প্রবিষ্ট হয়, এবং তথা হইতে ক্রমে অন্ত্রমধ্যে আসিয়া পড়ে। এইরূপ গমনকালে খাদ্যদ্রব্য পাচিত হইয়া তাহার পুষ্টি সাধন করে।

একটি মাছের দেহের অন্তর্ভাগ নিম্নের ছবিতে দেখান হইয়াছে। উহার মধ্যে ফুল্‌কার নীচে যে স্থান অপেক্ষাকৃত স্থূল, এই অংশই ইহার হৃদ্‌পিণ্ডের কাজ করে। দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে অপরিষ্কৃত রক্ত উহার মধ্যে আসিয়া জমিলে, এই হৃদ্‌পিণ্ডের সঙ্কোচন ফলে ঐ রক্ত নির্গত হইয়া কান্‌কোর নীচে যে ফুল্‌কাগুলি রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ফুল্‌কাই মাছের ফুস্‌ফুসের কার্য করে। ইহার মধ্যে দূষিত রক্ত আসিয়া পানিতে দ্রবীভূত অম্লজান সহযোগে নূতন রক্তের লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এই নিমিত্ত ফুল্‌কার রং উজ্জ্বল লোহিত। রক্তধারা এখান হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় দেহের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তখন আর হৃদ্‌পিণ্ডের সহায়তার প্রয়োজন হয় না। ইহার রক্তবাহী চক্র অন্য জন্তুর ন্যায় নহে।

আমাদের দেশে না থাকিলেও, এক প্রকার মাছ দেখিতে পাওয়া যায় যাহার দেহ-মধ্যে মানব দেহের ন্যায় ফুস্‌ফুসও রহিয়াছে। মাছের সমস্ত দেহমধ্যে স্নায়ু-জালও

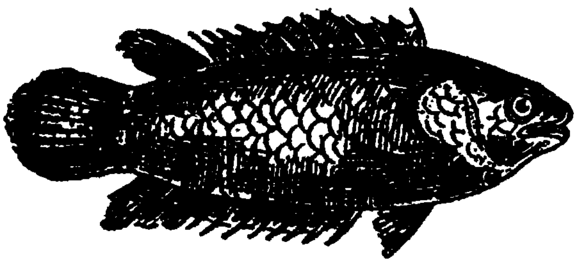

কৈ মাছ

মাগুর মাছ

ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং তাহার সাহায্যে দেহের সর্বস্থানে প্রয়োজনমতো সংবাদ-প্রেরণ কার্য চলিতে থাকে। মস্তকের অভ্যন্তর ভাগে, অস্থি বা আবরণের মধ্যে উহার মস্তিষ্ক বর্তমান এবং কান্‌কোর দুই পার্শ্বে শ্রবণেন্দ্রিয়ও রহিয়াছে। মস্তকের পুরোভাগে দুই চক্ষু ও কান, স্নায়ুসূত্রের সাহায্যে মস্তিকের সহিত সংযুক্ত। উহাদের দেহের মধ্য স্থানে একটি বায়ুপূর্ণ থলিয়া বর্তমান। ইহার মধ্যস্থিত বায়ু মাছকে পানির মধ্যে ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে; কিন্তু ইহার দ্বারা মৎস্য-দেহের নিশ্বাস কার্য চলে না। ইহাই চলিত কথায় মাছের পটকা বলিয়া পরিচিত।

মাছের বংশ-বিস্তার

মাছ বংশ-বিস্তার করে উহার ডিমের সাহায্যে। তোমরা অনেকেই মাছের ডিম খাইয়াছ। এক একটি ডিমের ছড়ায় হাজার হাজার ডিম পাওয়া যায়। ইলিশ মাছের ডিমের সংখ্যা অগণিত। এই সকল ডিম কালে মৎস্যে পরিণত হয়। ডিমের এই সংখ্যাধিক্য বশতঃ

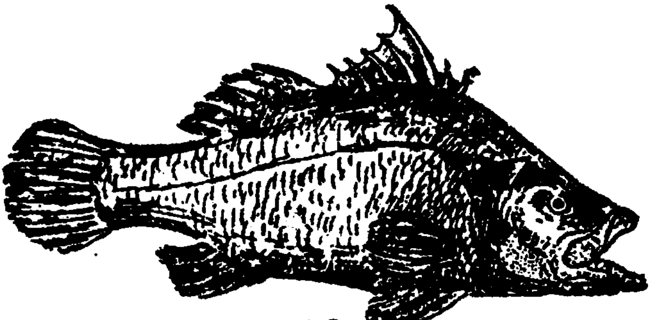

ভেটকী

প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মাছ ধরা পড়িলেও ইহার বংশ লোপ পায় না। সব মাছের ডিম একই অবস্থায় পরিণতি লাভ করে না। কোনও কোনও মৎস্য পুষ্করিণীর স্থির পানিতে ডিম পাড়িয়া সন্তান উৎপাদন করে। আবার কেহ কেহ স্রোতের পানিতে ডিম ছাড়ে এবং তাহা হইতে মৎস্য-শিশু জন্মলাভ করিয়া থাকে। ইউরোপের সামন মৎস্য

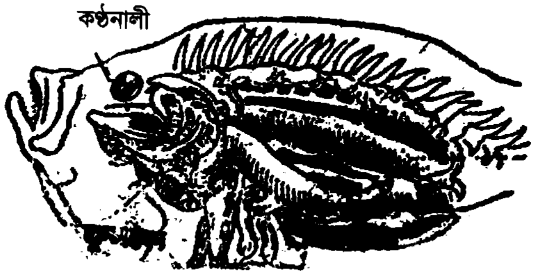

আমাদের দেশের ইলিশ মাছের ন্যায় সমুদ্র হইতে আসিয়া নদীর পানিতে ডিম ছাড়ে। আমাদের দেশেও রুই, কাতলা প্রভৃতি নদীর স্রোতেই ডিম ছাড়িয়া দেয়; এবং ঐ ডিম শিশু-মৎস্যে পরিণত হইলে, উহাকে ধরিয়া পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দিলে কিছুদিন পরে সুবৃহৎ মৎস্য পাওয়া যায়।

অধিকাংশ মৎস্যই চিরকাল পানির মধ্যে বাস করে। কিন্তু কৈ মাছ পানি হইতে উঠিয়া ডাঙ্গায়ও কিছুকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। উহাদের ফুল্‌কার পাশে একটি থলিতে, কিয়ৎ পরিমাণ বায়ু উহারা সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং পরে তাহারই সাহায্যে কিছুকাল শ্বাসকার্য চালাইয়া লয়। মাটির উপর দিয়া চলিবার সময় ইহারা কানকোর সাহায্য লইয়া থাকে। বাজারের টুকরি হইতে কিরূপ চমৎকার উপায়ে কৈ মাছ মাটির উপর দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হয়তো তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবে। এই কৈ-এর ন্যায় শিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মাছও পানির উপর হইতে বাতাস গ্রহণ করিয়া শ্বাসকার্য চালাইয়া থাকে, এইজন্য উহাদিগের দেহমধ্যে ফুল্‌কার পার্শ্বেই একটি বিশিষ্ট যন্ত্র রহিয়াছে। ফলে, এই মাছগুলিকে পানি হইতে বাহিরে আসিয়াও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়।

মাছ আমাদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। নানামাছের নানারকম আস্বাদ। ইহারা নানাবিধ পচা দ্রব্য এমন কি পুরীষও আহার করিয়া থাকে। কেহ কেহ মশার লার্ভাগুলিকে ভক্ষণ করিয়া আমাদিগকে মশার উপদ্রব হইতে রক্ষা করে। আবার কড্‌, হ্যালিবট প্রভৃতির যকৃৎ-নিঃসৃত তৈল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত, শিরীষ ও প্রচুর পরিমাণে তৈল বড় বড় সামুদ্রিক মাছের দেহ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভেজিটেবল ঘি নামেও রূপান্তরিত মাছের তৈল বাজারে বিক্রি হয়।

মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী জীবের তুলনামূলক পরিচয়

অমেরুদণ্ডী কেঁচো ও মেরুদণ্ডী মাছের বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে।

১। মেরুদণ্ডী জীবের শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড রহিয়াছে। উহাদিগের স্নায়বিক তন্ত্রগুলি পিঠের দিকেই বিদ্যমান থাকে, অথচ অমেরুদণ্ডী জীবের শিরদাঁড়ার অভাব-বশতঃই উহার স্নায়ুতন্ত্র পেটের দিকে থাকে।

২। অমেরুদণ্ডী জীবের চক্ষু মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন।

৩। হৃদয়ের অবস্থান সম্বন্ধে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অমেরুদণ্ডী জীবের মধ্যে যাহাদের হৃদয় রহিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের অবস্থান পিঠের দিকে, কিন্তু মেরুদণ্ডী জীবের হৃদয় ঠিক উহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ পেটের দিকেই থাকে।

৪। গলনালীর ফ্যারিংসের ছিদ্র অমেরুদণ্ডীর গলায় দেখা যায় না, কিন্তু মেরুদণ্ডী মাছের গলায় এইরূপ ছিদ্র দুই দিকেই থাকে।

সহনশীলতা

(Adaptation)

একটি চলিত কথা আছে — 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়' — কথাটি মানব দেহের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, সাধারণভাবে জীব-দেহের উপরেও ইহার তেমনি প্রয়োগ হইতে পারে। জীবমাত্রেরই ইহা আশ্চর্য ক্ষমতা যে, সে পারিপার্শ্বিকতার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয়, কারণ এই সামঞ্জস্য না থাকিলে উহার মৃত্যু অনিবার্য। গাছপালা সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি জীব-জন্তু শ্রেণীর জন্যও সেই একই কথাই খাটে। জলজ উদ্ভিদকে যেমন শুষ্ক মাটিতে বসাইয়া বাঁচান যায় না, তেমনি নভশ্চর পাখীগুলিকে ধরিয়া পানির মধ্যে রাখিলে তাহারাও বাঁচিতে পারে না। অথচ দেখা যায় যে, একটি উদ্ভিদ-শিশুর উপর এককালে অতিমাত্রায় চাপ পড়িলে, উহার ডাল-পালা বা কাণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু এই চাপের মাত্রা অল্প অল্প করিয়া বাড়াইলে ক্রমে উদ্ভিদের কাণ্ডটিকে ইচ্ছানুযায়ী বাঁকাইয়া লইতে পারা যাইবে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, অধিক পরিমাণে আফিম খাইলে মানুষ মারা পড়ে, অথচ অল্পমাত্রায় এই দ্রব্যটি গ্রহণ করিয়া মানুষ কিছুদিন পরে যথেষ্ট পরিমাণে উহা খাইতে পারে। ইহাতে মনে হয় যে, প্রাণীমাত্রেই তাহার পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে বরাবরই তৎপর। এই সমতা কিন্তু দুই রকমে রক্ষা করা যায়। প্রথমতঃ জীবমাত্রই উত্তরাধিকাসূত্রে এইগুণ লাভ করিয়া থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ ধীরে ধীরে এই শক্তি নিজেই তাহারা আহরণ করিয়া লয়।

উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়গুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমরা শীতের দিনে দেহকে নানারূপ জামাকাপড় দিয়া আবৃত করিয়া শীতের প্রকোপ হইতে নিজেকে রক্ষা করি। আবার গরমের দিনে জামাকাপড় গায়ে রাখাই কঠিন হইয়া পড়ে। মানব বুদ্ধিমান জীব, সে নানাভাবে এইরূপে নিজেকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু গরু, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুদের অনাবৃত দেহকে শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিতে হইলে স্বাভাবিক উপায়ে তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এই সকল গৃহপালিত পশুর দেহের লোম উহাদিগকে উত্তাপের তারতম্য হইতে রক্ষা করে। দেখা যায়, ঘোড়ার গায়ের লোমগুলি শীতের প্রারম্ভে দীর্ঘতম ও অধিকতর ঘন হইয়া থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মের আগমনের সহিত এই লোমগুলি দেহ হইতে পতিত হইয়া যায়। শীতের সময় দেহে আবরণের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু গ্রীষ্মের সময় আর উহার প্রয়োজন থাকে না বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

ভারবাহী পশুর স্কন্ধদেশের চামড়ার উপর ক্রমে একটি কঠিন আবরণ গঠিত হয়। কারণ ভারবহন কার্যবশতঃ স্কন্ধদেশের কোমল আবরণটি ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া তথায় কঠিন আবরণ না জন্মাইলে ক্ষত উৎপাদিত হইতে পারিত।

বিষাক্ত নানা ঔষধ, সময় সময় মানব দেহের উপকার-কল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরিমাণ অধিক হইলে দেহ ইহাকে সহ্য করিতে পারে না বলিয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু একই দ্রব্য অল্প পরিমাণে দিয়া ক্রমে দেহকে সহনশীল করিয়া লওয়া হয়, এবং তখন অধিক মাত্রায় ঐ সকল বিষাক্ত ঔষধ গ্রহণ করিতে দেহ সক্ষম হইয়া থাকে। এমনও দেখা যায় যে, অভ্যাসবশে একজন যে পরিমাণ বিষ পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে, সেই পরিমাণ বিষ অন্য লোকের পক্ষে প্রাণঘাতী হইয়া থাকে।

আরও দেখা যায় যে, কোনও পাখীকে খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখিলেই তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়। এই জন্যই বৃহত্তর খাঁচার মধ্যে পায়রা রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে; তাহারা ডিম প্রসব করে এবং তাহা হইতে ছানাও উৎপন্ন হয়; কিন্তু ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া পায়রার বংশ-বিস্তারের বাধা দেওয়া হয়।

ক্ষতস্থানের আরোগ্য ক্রিয়াও প্রকৃতপক্ষে একরূপ অবস্থান্তরিত পরিবর্তন মাত্র। তোমরা টিকটিকির কথা শুনিয়াছ কি? উহাদিগের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা কোনওরূপে লেজ হারাইলে সেই স্থানে নূতন লেজ গজাইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিকতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার প্রচেষ্টাই এই পরিবর্তনের মূল কারণ।

আমিষ জাতীয় দ্রব্য প্রাণীদেহের বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য। এই জাতীয় পদার্থ জীব দেহ হইতে বিষের আকারেও নির্গত হয়। সাপের বিষও এই জাতীয় পদার্থ, কুঁচের মধ্যেও এই আমিষ জাতীয় বিষ বর্তমান; ইহাদিগের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহারা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার ফলে তথায় একটি প্রতিরোধক পদার্থ (anti-body) প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ বিষের পরিমাণ অধিক হইলে এই পদার্থের শক্তি ব্যাহত হয়, এবং তখন জীব বিপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অল্পমাত্রায় এইসকল বিষ দেহে যে প্রতিষেধক প্রস্তুত করে, তাহার সহায়তায় পরে এই সকল বিষের অধিকতর পরিমাণের শক্তিকে রোধ করিবার ক্ষমতা লাভ করে। এই জন্য সাপের বিষ দ্বারা অশ্বের ন্যায় প্রাণীর দেহের রক্তকে বিষাক্ত করিয়া নূতন সর্পবিষ-প্রতিষেধক সিরাম প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই সিরাম মানব-রক্তে সঞ্চালিত করিয়া সাপের বিষ হইতে মানুষকে রক্ষা করা হইতেছে। এই প্রতিষেধক পদার্থগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সমতা রক্ষা করিবার জন্য দেহের আকুল প্রচেষ্টার ফলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অনেক জীবকে বাঁচিতে হইলে তাহার চতুষ্পার্শ্বের পদার্থের সহিত এমনভাবে মিশিয়া থাকিতে হয়, যেন তাহাকে শত্রুরা ধরিতে না পারে; এইজন্য দেখা যায়, স্বভাবতঃ স্বল্প-শক্তিসম্পন্ন সামুদ্রিক জীব আশপাশের গাছপালার সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া থাকে যে, শত্রু দ্বারা সহজে আবিষ্কৃত হয় না। নিজ খাদ্য আহরণ করিবার সময় তাহাদের শিকারগুলিও সহজে উহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া উহারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই পরিবর্তন সংসাধিত হয় বংশানুক্রমে অর্থাৎ নিজেকে পাশের বস্তুগুলির সহিত মিলাইয়া রাখিবার এই শক্তি উত্তরাধিকার সূত্রেই উহারা পাইয়া থাকে।

পতঙ্গ

(Insect)

শ্রেণী-বিভাগ (classification)

জীব-জগতের যাবতীয় অধিবাসীকে আমরা কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। কত শত প্রাণীই আমরা ভূ-পৃষ্ঠে দেখিতে পাই। ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে না পারিলে উহাদিগের সম্বন্ধে অধিক আর কিছু জানিবার পথে নানাবিধ অসুবিধা উপস্থিত হইতে পারে। প্রাণীবিদ এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর দেহের গঠন-প্রণালী, উহাদিগের অভ্যাস প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া উহাদিগকে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে আমরা গোড়াতেই দুইটি প্রধান শ্রেণীর উল্লেখ করিতে পারি — প্রথম অমেরুদণ্ডী বা মেরুদণ্ডহীন এবং দ্বিতীয় মেরুদণ্ডী সম্প্রদায়।

নানাবিধ প্রাণীর পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ইহাদিগের অনেকগুলির পৃষ্ঠদেশে নিম্নভাগ হইতে কটিদেশ পর্যন্ত কতকগুলি অস্থিখণ্ড দীর্ঘ একটি মালার আকারে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। কতকগুলি জন্তুর দেহে এই অস্থিমধ্যে কয়েকটি বক্ষ-পঞ্জরের অস্থিখণ্ডগুলির সহিত সংযুক্ত। এই দীর্ঘ দণ্ড সদৃশ অস্থিমালাই মেরুদণ্ড নামে অভিহিত। যাহাদের দেহে এইরূপ অস্থিময় দণ্ড বিদ্যমান, তাহারাই মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং যাহাদিগের দেহে এইরূপ অস্থির সমাবেশ দৃষ্ট হয় না, তাহারাই মেরুদণ্ডহীন জীব। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে মাছ, ব্যাং, সাপ, পায়রা, মুরগী, গরু, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই অন্তর্ভুক্ত। কেঁচো, মৌমাছি, পিপীলিকা, মাকড়সা, মশা প্রভৃতি কিন্তু অন্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মনে হয়, এই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সকলগুলিই একরূপে জীবনযাপন করে না। ইহাদিগকে জীবনযাপনের বিভিন্ন ব্যবস্থা অনুসারে পুনরায় অনেকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন জলচর, মৎস্য, সরীসৃপ, চতুষ্পদ, পক্ষী প্রভৃতি। মেরুদণ্ডহীন প্রাণীগুলিও ঐরূপে নানাভাগে বিভক্ত। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে, আমরা কতকগুলির জীবন-কথা এখানে আলোচনা করিয়া তোমাদিগকে ইহাদিগের বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

যে সকল মেরুদণ্ডহীন প্রাণী গ্রন্থিযুক্ত পদবিশিষ্ট তাহাদিগকে আর্থোপড্‌স (arthropods) বা সন্ধিপদী বলা হইয়া থাকে। মাছি, মৌমাছি, প্রজাপতি, পিপীলিকা, মশা — ইহারা সকলে এই শ্রেণীভুক্ত। চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি জলজ জীবও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তবে পূর্ববর্ণিত প্রাণীগুলি পতঙ্গ বা insecta নামীয় উপশ্রেণীর অন্তর্গত, এবং শেষোক্ত প্রাণীগুলি ক্রাস্‌টেশিয়া (crustacea) উপশ্রেণীভুক্ত। আবার ইহারই মধ্যে বহু-পদী (centipede) উপশ্রেণী এবং এরাক্‌নিদ (arachnid) উপশ্রেণীও বর্তমান।

পতঙ্গ-দেহের বিবরণ (Description of Insect body)

আমরা এখানে বিশেষভাবে এই পতঙ্গ উপশ্রেণীর কথাই বর্ণনা করিব। মাছি, মৌমাছি প্রভৃতি যদিও জন্ম হইতে দেহের পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত ঠিক একইভাবে অগ্রসর হয় না, তাহা হইলেও উহাদিগের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় দেহের গঠনে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে; প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যগুলি একে একে পরে বলিব, কিন্তু দেহের গঠনের কথা প্রারম্ভে বলিলেই যেন সুবিধা হয়।

মাছি (The House fly)

পর পৃষ্ঠায় একটি মাছির ছবি দেওয়া হইয়াছে; উহারই পার্শ্বে ও পর পৃষ্ঠায় অন্য কতকগুলি পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের ছবি দেওয়া হইল। এই ছবিগুলি পরীক্ষায় দেখিতে পাইবে, ইহাদিগের গঠনপ্রণালী প্রায় একরূপ। প্রত্যেকের দেহকেই তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; প্রথম মস্তক, দ্বিতীয় বক্ষ-গহ্বর (thorax) তৃতীয় উদর (abdomen)।

মাছি

মৌমাছি

মাছি, মৌমাছি, প্রজাপতি পিপীলিকা, মাকড়সা ইহাদিগের মস্তকের সম্মুখে দুইটি দীর্ঘ শুঁড় রহিয়াছে। ইহা স্পর্শনেন্দ্রিয় (antannae) নামে পরিচিত। এইগুলি উহার মুখ-গহ্বরের বহির্দেশে সংযুক্ত। মাছির মুখের উভয় পার্শ্বে দুইটি চক্ষু বর্তমান। এই চক্ষু দুইটির মধ্যে, অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য লেন্স (lens) রহিয়াছে, ফলে ইহারা একই পদার্থের বহু সংখ্যক চিত্র দেখিয়া থাকে। ইহাই উহার কম্পাউন্ড নেত্র বা (compound eye) পুঞ্জাক্ষি। এই দুটি পুঞ্জাক্ষি ব্যতীত আরও তিনটি চক্ষু ইহাদিগের মধ্যবর্তী স্থানে বর্তমান রহিয়াছে। মক্ষিকার মস্তকে স্পর্শনেন্দ্রিয় দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এগুলি কখনও মসৃণ এবং কোনও কোনও পতঙ্গের মুখে ইহাদিগকে লোমশ দেখিতে পাওয়া যায়।

পতঙ্গের মস্তক

পতঙ্গমাত্রেরই মুখটি আকারে ক্ষুদ্র এবং তিন জোড়া চোয়ালবিশিষ্ট অধরোষ্ঠের চলাচল কতকটা কাঁচির ন্যায়। ইহাদিগকে কাহারও মুখ এমনভাবে প্রস্তুত যে, তদ্দারা কেবল

চোষণ কার্য চলিতে পারে এবং কাহারও মুখ চিবাইয়া খাওয়ার উপযুক্ত। মৌমাছি ফুলের মধ্য হইতে মধু আহরণ করে; সুতরাং ইহার মুখে মধুপান করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগের মুখের সহিত একটি দীর্ঘ অথচ সূক্ষ্ম নলের ব্যবস্থা

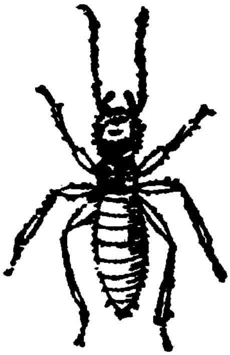

পিপীলিকা

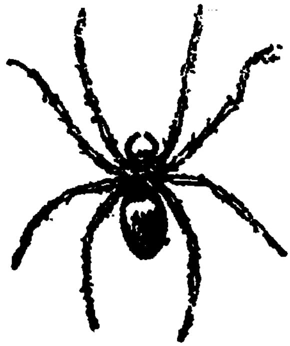

মাকড়শা

রহিয়াছে; উহাকে ফুলেল মধুভাণ্ডে প্রবেশ করাইয়া ইহারা তরল মিষ্ট সারকে টানিয়া লয়। এই নলটি প্রবোসিস্ (proboscis) নামে পরিচিত। সাধারণ মাছির মুখে যে প্রবোসিস্ বর্তমান, তাহাকে উহারা অব্যবহারকালে ইচ্ছামতো গুটাইয়া রাখে। পতঙ্গের মধ্যে অনেকেই পাতা প্রভৃতি খাইয়া জীবনধারণ করে; কিন্তু অনেক পতঙ্গ ক্ষুদ্রতর অন্য কীট ও পতঙ্গকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। মাছির মুখ তরল দ্রব্য চুষিবার উপযুক্ত কিন্তু মশা বা ডাঁশ উদ্ভিদ অথবা প্রাণী দেহ হইতে রস বা রক্ত শোষণ করে বলিয়া উহাদের মুখে ছিদ্র করিবার সূচ সদৃশ নল রহিয়াছে। মশার মুখে নলের মধ্য দিয়া অন্য দ্রব্যও মানব দেহে প্রবেশ করে বলিয়া কোনও কোনও মশার কামড়ে জ্বালা করে। মৌমাছি প্রভৃতি যে হুল ফোটায় তাহা মুখে থাকে না, উহার লেজে থাকে।

পতঙ্গের বক্ষগহ্বর (Thorax)

পতঙ্গ-দেহের দ্বিতীয় অংশে, বক্ষঃস্থলের সহিত উহাদিগের পাখা এবং পদগুলি সন্নিবেশিত রহিয়াছে; পদগুলি সংখ্যায় ছয়টি, কিন্তু পাখার সংখ্যা চারটি মাত্র। মাছির দেহে আমরা বেশ বড় দুইটি পাখা দেখিতে পাই। এই পাখাগুলির মূলে আরও দুইটি ক্ষুদ্র পাখাও রহিয়াছে, আবার কোনও কোনও পতঙ্গ-দেহে পাখা একেবারেই নাই। বৃহত্তর জন্তু-দেহে বক্ষঃস্থলের মধ্যেই শ্বাসযন্ত্র আবদ্ধ থাকে; পতঙ্গ-দেহে কিন্তু সেরূপ কোনও যন্ত্র নাই। ইহার শ্বাসকার্য, সমস্তই দেহ মধ্যে অবস্থিত কতকগুলি সূক্ষ্ম নলের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে, এই নলগুলি শ্বাসনালী (trachea) নামে পরিচিত।

ইহার সহিত উহার দেহের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত শ্বাসরন্ধ্র (stigmata) নামে পরিচিত ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি যুক্ত রহিয়াছে।

মৌমাছির স্নায়ুমণ্ডলী

পতঙ্গ-দেহের পাখার উপরও এই নলগুলি একটি জালের আকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। দেহমধ্যে হৃদ্‌পিণ্ড যন্ত্রটি অপেক্ষাকৃত সরল, একটি নাতিদীর্ঘ বেলন সদৃশ নল। ইহার মধ্য হইতে বর্ণহীন রক্তস্রোত নির্গত হইয়া দেহমধ্যে প্রবাহিত হয়, কিন্তু এই রক্তকে বহন করিবার জন্য কোনও বিশিষ্ট শিরা বা উপশিরা ইহাদিগের দেহের মধ্যে নাই।

পতঙ্গের উদর (abdomen of an insect)

কতকগুলি অর্ধবৃত্তাকৃতি খণ্ড (segment) মিলিয়া ইহাদিগের উদরদেশ নির্মিত। এগুলির সংখ্যা প্রায়ই নয়টি দেখা যায়। ইহারই শেষ প্রান্তে ইহাদিগের কাহারও কাহারও হুল বর্তমান, এবং উহাদিগের স্নায়ুসূত্রগুলি দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত আটটি স্নায়ুমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া দেহময় ছড়াইয়া রহিয়াছে। উপরের চিত্রটিতে মৌমাছির দেহের স্নায়ুসূত্রগুলি দেখান হইয়াছে।

প্রজাপতি (Butterfly)

পতঙ্গদেহের বিবরণ অবগত হইলেই উহার সম্বন্ধে সকল তথ্য জানা যায় না। পূর্বের বর্ণনামতো প্রায় প্রত্যেক পতঙ্গের দেহের গঠন জানা যাইবে। কিন্তু এই বিবরণ পরিণতবয়স্ক পতঙ্গ সম্বন্ধে খাটে। মানব-শিশু অথবা ছাগশিশু জন্মগ্রহণ করিতেই তাহাকে মাতাপিতার প্রতিকৃতির অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য তাহাদিগের চেহারা সম্পূর্ণরূপে মিলিবে না; কিন্তু তবুও দেহের যাবতীয় গঠন-প্রণালী একরূপ মনে হয়। এমন কি, ডিম হইতে যখন একটি মুরগীর ছানা নির্গত হয়, তখন তাহার দেহ একরূপ নূতন লোমে আবৃত থাকিলেও উহাকে মুরগীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

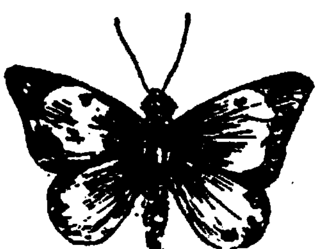
প্রজাপতি

ক্রমপরিবর্তন (Metamorphosis)

কিন্তু পতঙ্গ-শিশু সম্বন্ধে এই একই কথা খাটে না। পতঙ্গ জীবনের শেষ পরিণতি সন্তানোৎপাদন কার্য, কতকগুলি ডিম প্রসব করিয়াই শেষ হইয়া যায়। ইহার ডিম, দেওয়া শেষ হইলেই পতঙ্গ-মাতার পার্থিব জীবনও প্রায় শেষ হইয়া যায়। এই ডিম হইতে প্রথম যে শিশু-পতঙ্গ নির্গত হয়, তাহাকে দেখিলে পতঙ্গশিশু বলিয়া মোটেই ধারণা করা যায় না। কিন্তু দেহের ক্রমপরিবর্তনের ফলে, অবশেষে উহাই পতঙ্গের আকার প্রাপ্ত হয়। সর্বপ্রথম তোমাদিগকে প্রজাপতির ক্রমপরিবর্তন বা রূপান্তরের কথা বলিব। প্রজাপতি নানা বর্ণের এবং নানা শ্রেণীর। আমরা এখানে রেশমের গুটি-পোকার আলোচনাই বিশেষভাবে করিব। রেশমের মথ শিরোনামের পরের অনুচ্ছেদে ইহার রূপান্তরের বিভিন্ন স্তর দেখা হইয়াছে।

রেশমের মথ

তোমরা হয়তো জান একরূপ বিশিষ্ট গাছের পাতা খাওয়াইয়া রেশমের পোকাগুলিকে বড় করা হয়। এই গাছগুলি তুঁত গাছ নামে পরিচিত। প্রজাপতি-মাতা এককালে সংখ্যায় প্রায় ৩০০ হলদে রং-এর গোলাকার ডিম প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ডিম হইতে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমহীন নাতিদীর্ঘ দেহ-বিশিষ্ট কীটের জন্ম হয়। এই কীটই শূককীট বা লার্ভা (larva) নামে অভিহিত। ইহাদিগকে পলু-পোকাও বলে।

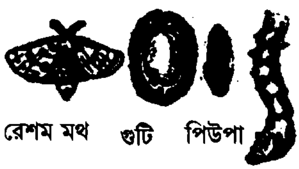

রেশমের গুটিপোকার ক্রমপরিবর্তন

এই কীটেরা জন্ম হইতেই প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিতে থাকে এবং অল্পকালের মধ্যেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। এই সময়ে অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিবার কারণ এই যে, ইহার অল্প কিছুদিন পরেই উহারা আর খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্যই অনাগত দিনের সংস্থান কিছু সংগ্রহ করিতে না পারিলে চলিবে কেমন করিয়া? শূককীট অবস্থা হইতে ক্রমে ইহারা দ্বিতীয় অবস্থায় আগমন করে। এই সময় সুপুষ্ট কীটগুলি নিজ দেহের চতুর্দিকে একরূপ সূতার ন্যায় দেহ্-নির্গত পদার্থ জড়াইয়া অপেক্ষাকৃত ঘোরতর বর্ণের পুত্তলি বা পিউপায় (chrysallis or pupa) পরিণত হয়। এই পিউপা নিজ দেহের চতুর্দিকে যে সূত্রজাল বিস্তার করে, ক্রমে তাহারই মধ্যে সে নিজেও অবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই সময় উহাকে গুটির আকারে দেখা যায়। এই গুটিটির চতুর্দিকই বদ্ধ। ইহার মধ্যে অবস্থানকালে পতঙ্গটির দেহে পক্ষ উদ্ভিন্ন হয় এবং সে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়া তাহার শৈশবে আহৃত খাদ্য দ্বারাই পুষ্টি লাভ করে ও দেহের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাহার পর দিনের আলোর জন্য তাহার কি বিরাট আগ্রহই অন্তরে জাগে। ফলে সে তাহার চতুর্দিকের রেশমের আবরণের অল্প অংশ কাটিয়া ফেলে এবং একদিন এই কাটা মুখের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পরই তাহার মাতৃত্বের প্রবল আগ্রহের বশে নূতন সৃষ্টির চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, ডিম প্রসব করে এবং জীবনের কর্তব্য সমাধা করিয়া কোন সুদূর অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় কে জানে?

এই গুটির চতুর্দিকে যে আবরণ তাহারা প্রস্তুত করে, মানবের হাতে তাহাই রেশমরূপে তাহার দেহের সৌন্দর্য-বর্ধনে নিয়োজিত হয়। রেশম-মথ গুটি কাটিয়া বাহিরে আসিলে এই কাটা গুটিতে আর দীর্ঘ রেশম-সূত্র পাওয়া যায় না; এই নিমিত্ত কীটগুলি যখন গুটি পূর্ণভাবে প্রস্তুত করিয়া ফেলে, তখন উহাদিগকে ঐ গুটিসমেত উত্তপ্ত পানি অথবা উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পে (steam) রাখিয়া মারিয়া ফেলা হয়। অবশ্য সবগুলিকে এইরূপে না মারিয়া, পুনরায় ডিম পাড়িবার জন্য আংশিকভাবে উহাদিগকে রাখিয়া, প্রজাপতিরূপে বাহিরে আসিতে দেওয়া হয়। প্রজাপতি দেহের ক্রমপরিবর্তন এই প্রকারে ঘটিয়া থাকে। কীটাবস্থায় উহার দেহের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দুইটি গণ্ড (gland) হইতে একরূপ পীত বর্ণের লালা নিঃসৃত হয়; উহাই পরে রেশম সূত্রে পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই গণ্ড হইতে যে পথে লালাটি নির্গত হয়, তাহাকে স্পিনারেট (spinneret) বলে। প্রত্যেকটি রেশম-কীট গড়ে প্রায় ১২০০ গজ দীর্ঘ রেশমের সূত্র প্রস্তুত করে।

রেশম-কীট তুঁত গাছের পাতা ভক্ষণ করিয়া পুষ্টি লাভ করে। এই জন্যই যে সকল দেশে তুঁতগাছ অধিক জন্মায়, রেশমের চাষও সেই সকল দেশে অধিক হইয়া থাকে। চীন দেশে বহুকাল পূর্বেও রেশমের চাষ হইত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলায় এবং বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় এখন অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বর্তমানে একরূপ রাসায়নিক পদার্থ হইতেও এক প্রকার রেশম সদৃশ সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহা কিন্তু কীটজাত রেশম নহে; ইহাই কৃত্রিম রেশম নামে পরিচিত। ভবিষ্যতে তোমরা ইহার বিশিষ্ট পরিচয় পাইতে পারিবে। কৃত্রিম রেশম ও প্রকৃত স্বাভাবিক রেশম দেখিতে অনেকটা এক রকম হইলেও স্বাভাবিক রেশম পোড়াইলে তাহা পোড়া পালকের গন্ধ ছাড়ে কিন্তু কৃত্রিম রেশম ঐরূপ গন্ধ দেয় না। আরও একরূপ রেশম সদৃশ সূত্র কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হয় তাহাকে নাইলন বলে।

মৌমাছি

বাল্যকালে পঠিত — 'মৌমাছি, মৌমাছি, কোথা যাও নাচি নাচি, দাঁড়াও না একবার ভাই' — কবিতাটি হয়তো তোমাদের মনে আছে। মৌমাছি তোমাদের সুপরিচিত। কত গল্প, কত কবিতা এই ছোট পতঙ্গটির সম্বন্ধে তোমরা ইতঃপূর্বে পড়িয়াছ। তাহার উপকার করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে নানা কথাই তোমরা শিখিয়াছ। আজ সে সব কথা তোমাদিগকে বলিব না। আমি এখানে তাহাদের ঘরের কথা ও বংশের বিবরণ কিয়ৎ পরিমাণে দিবার চেষ্টা করিব। গুণ গুণ করিয়া মৌমাছির দল ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিয়া তাহার বিরাট ছয়-কোণা ঘরে পূর্ণ চাক বা বাসাটিতে গিয়া উপস্থিত হয়, আবার উড়িয়া চলে। এই সকল ব্যাপার এমনি দেখা যায়; তার জন্য গবেষণা বা চিন্তার দরকার হয় না। আমরা উহার চাকের সংবাদটা প্রথম লইব।

মৌচাক (bee-hive)

এখানে অনেকগুলি মৌমাছি একত্রে বাস করে। মানুষ একসঙ্গে এতগুলি বাস করিতে পারে না, তাহারা নানারূপ বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করে। অথচ এই ক্ষুদ্র পতঙ্গগুলি একত্রে বাস করিয়া বেশ সহজভাবে জীবন যাপন করে মনে হয়। মানুষ বুদ্ধিমান জীব, তাহার শক্তিও সীমাবদ্ধ নহে; আজ যে সামান্য প্রজা, কাল সে নিজ ক্ষমতায় সিংহাসনও অধিকার করিতে পারে। প্রকৃতি মানব-সৃষ্টির সময় এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং যে অধিক পরিমাণে শক্তি আহরণ করে, সেই তাহার পাশ্ববর্তী দুর্বল প্রতিবেশীকে পরাভূত করিয়া রাখে।

মৌমাছির শ্রেণীবিভাগ (classification of bees)

কিন্তু মৌমাছির বেলায় দেখা যায় যে, স্বাভাবিক উপায়েই ইহারা কতকগুলি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম রাণী মৌমাছি, ইহার কাজ বংশবৃদ্ধি করা মাত্র, অর্থাৎ ডিম পাড়িলেই তাহা হইতে সন্তান উৎপাদন কার্য ব্যতীত আর কোনও কাজ এই রাণী মৌমাছি করে না। পুরুষ মৌমাছি বা ড্রোন (drone), রাণী মৌমাছি অপেক্ষাও আকারে বড়, ইহারা কোনও কাজ করে না, কেবলমাত্র রাণী মৌমাছির সঙ্গ প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় এবং একবার এইরূপ সঙ্গম লাভ করিলেই রাণী মৌমাছির ডিম উর্বরতা লাভ করে। কিন্তু এই সম্মিলনের পর ড্রোনটি প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাধারণতঃ ড্রোনগুলিকে খাদ্য দান করিলেও যখন খাদ্যবস্তু কমিয়া আসে এবং ফুল হইতে খাদ্য-আহরণ কষ্টসাপেক্ষ হয়, তখন ফৌজ-মৌমাছিরা সকলে মিলিয়া এই পুরুষ মৌমাছিকে মারিয়া ফেলে। তোমরা জান, মৌমাছির দেহে হুল ফুটাইবার

যন্ত্র আছে; তাহার দ্বারাই উহারা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু পুরুষ মৌমাছির আত্মরক্ষার এই সরঞ্জাম নাই। এইজন্যই যুদ্ধে বরাবরই তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। মৌমাছিদের তৃতীয় দলই সাধারণ ফৌজ-মৌমাছি। ইহারা কর্মী মৌমাছি নামেও পরিচিত। তাহাদিগকেই তোমরা চতুর্দিকে উড়িয়া বেড়াইতে দেখ। প্রত্যেকটি মৌচাকে একটি রাণী মৌমাছি এবং একটি পুরুষ মৌমাছি থাকে। অপরগুলি সবই এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী ফৌজ। এই কর্মী ফৌজগুলি প্রকৃতপক্ষে অপরিণত স্ত্রী মৌমাছি। ইহারা ডিম প্রসব করিতে পারে না, কেবলমাত্র খাটিয়া খাটিয়া তাহাদের পতঙ্গ-জীবন শেষ করে। কর্মী ফৌজগুলির একদল পুষ্প হইতে মধুর রস (nectar) আহরণ করিয়া তাহাকে মধুতে পরিণত করে; দ্বিতীয় দল প্রসূত ডিমগুলিকে লালন-পালন করে; এবং অন্যদল উহাদের চাকের ছয়-কোণা ঐ ঘরগুলি প্রস্তুত করে। কেহ মোম তৈয়ার করিতেছে, এবং কেহ বা সান্ত্রীর কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে।

মৌমাছি পরিবারের দৈনন্দিন জীবন এইরূপে কাটিয়া যায়। রাণী মৌমাছি যে ডিমগুলি প্রসব করে, তাহার মধ্যে কয়েকটি থাকে অধিকতর পুষ্ট, এবং এইগুলিকে অতি যত্ন সহকারে পালন করা হয়; ইহা হইতেই রাজকন্যাদের জন্ম হইয়া থাকে। রাজকন্যারা পরিণত বয়স প্রাপ্ত হইলেই, নিজ কাজ শেষ করিয়া, রাণী মৌমাছি এক মৌচাক হইতে অন্যত্র গমন করে, এবং নবজাত এই রাজকন্যাদের একজন মৌচাকের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে, ও অপর রাজকন্যাদের মারিয়া ফেলা হয়। এইভাবেই মৌমাছি-জীবনের একতা রক্ষা হইয়াছে।

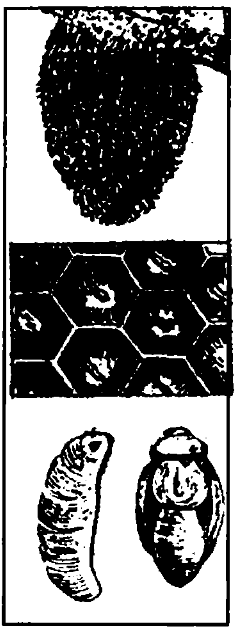
উপরে মৌচাক-নিম্নে মৌমাছির অপরিণত শিশু

মৌমাছির ক্রমপরিবর্তন (metamorphosis of the bee)

মৌমাছির দেহও ক্রমপরিবর্তনের ফলে গঠিত হয়; ক্ষুদ্র একটি ডিম মৌচাকের ছয়-কোণবিশিষ্ট একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে।

মৌমাছি শিশুর লালন-পালন কালে উহাদিগকে কর্মী-মৌমাছিরা নিজ মুখের রস খাওয়াইতে থাকে। দুইতিন দিন পরে তাহাদিগের অনেকে নিজেরাই মধু ও পুষ্প-পরাগ আহার করিতে পারে। যাহারা কর্মী মৌমাছির মুখ-মধুর দ্বারা পালিত হয় তাহারাই পরে রাণী মৌমাছিতে পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিক সংখ্যক মৌমাছি পিউপা অবস্থায় পরিণত হইতেই তাহাদিগকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া কর্মী মৌমাছি ঐ ঘর মোম দ্বারা বন্ধ করিয়া দেয়। উহার অভ্যন্তরে মধু-মিশ্রিত পুষ্প-রেণু আহার করিয়াই

পিউপাগুলি বাড়িতে থাকে। প্রায় দ্বাদশ দিন পরে মৌমাছি-শিশু আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। ইহার দেহের পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি। মাত্র দুই-একটি কথা বলিলেই উহার বিশেষত্বগুলি বলা হইবে। উহার বক্ষদেশে দুইটি ডানা সংযুক্ত। এই ডানা দুইটির সহিত আরও দুইটি ডানা দুই পার্শ্বে যুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ মোটের উপর উহার ডানার সংখ্যা চারিটি। ইহার দেহের অভ্যন্তরে একরূপ বিষাক্ত পদার্থ রহিয়াছে। উহা একটি কাঁটাযুক্ত নল সাহায্যে তাহার শত্রু-দেহে পরিচালনা করিতে পারে। এই কাঁটাযুক্ত নলটিই হুল, উহাদিগের উদরের শেষপ্রান্তে উহা অবস্থিত।

প্রবোসিসের সাহায্যে পুষ্প হইতে মধুরস টানিয়া উহারা নিজ দেহ-মধ্যস্থিত মধুভাণ্ড পূর্ণ করে এবং তথায় এই মিষ্ট রস প্রকৃত মধুতে পরিণত হয়। এই মধু পরে উহারা মোম-নির্মিত উহাদিগের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ঢালিয়া দেয়। মৌমাছির চাক ভাঙ্গিয়া এই মধুই মানুষ আহরণ করে।

পিপীলিকা

পিপীলিকা একটি সঞ্চয়ী জীব। ইহারা সারা বৎসর খাটিয়া খাদ্যবস্তু আহরণ করে এবং খাদ্যাবশিষ্ট সংগ্রহ করিয়া, নিজ মৃত্তিকা নিম্নস্থ গৃহে রাখিয়া দেয়। ইহারাও একত্র দলভুক্ত হইয়া বাস করে, এবং জীবনযাপনের জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন, সেই সকল কার্য নিজেদের মধ্যে বিভিন্নভাগে ভাগ করিয়া লয়। কর্মী শ্রেণীভুক্ত পিপীলিকার দল খাদ্য আহরণ প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকে। নিম্নে তিন শ্রেণীর পিপীলিকার চিত্র প্রদত্ত হইল। আকারে ইহারাও অন্য পতঙ্গের অনুরূপ।

পিপীলিকার ক্রমপরিণতি (metamorphosis of an ant)

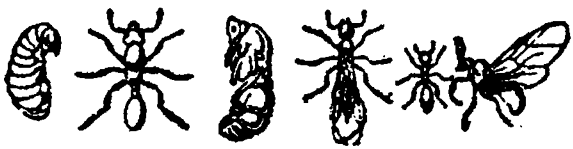

বিভিন্ন শ্রেণীর পিপীলিকা

পিপীলিকা ক্রমপরিবর্তনের ফলে পুষ্টিলাভ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ডিমগুলি প্রথমে শূককীটে পরিণত হয় এবং পরে পুত্তলিতে রূপান্তরিত হইতে থাকে। এবং অবশেষে উহা হইতেই পূর্ণ পিপীলিকা নির্গত হয়। ইহাদিগের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রী-পিপীলিকার ডানা উৎপন্ন হইতে থাকে, কিন্তু কর্মী শ্রেণী ডানা-বিহীন। ডানা উৎপন্ন হইলে, পুরুষ এবং স্ত্রী-পিপীলিকা দল বাঁধিয়া ভূগর্ভস্থ আবাসস্থল হইতে নির্গত হয় এবং পুরুষ ও স্ত্রীর সম্মিলন ঘটে। এইবার যখন স্ত্রী-পিপীলিকা ডিমভারে ভারাক্রান্ত, সেই সময় উহাদিগের ডানা দুইটি পড়িয়া যায় এবং ডিম পাড়িবার জন্য উহারা নূতন স্থানের সন্ধানে নিযুক্ত হয়।

ইহাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় সাতিশয় তীক্ষ্ণ শক্তিসম্পন্ন। পিপীলিকাদিগের ঘ্রাণশক্তিও তীব্র। এই দেহযন্ত্রগুলি ইহাদিগের মস্তকের পুরোভাগে অবস্থিত। স্পর্শনলের সাহায্যে ইহারা আঘ্রাণের কার্য সম্পাদন করিতে পারে এবং মুখে দুই পার্শ্বে যে স্নায়ু-সূত্রের গ্রন্থিগুলি অবস্থিত, তাহার সাহায্যে ইহারা আস্বাদ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। মোটের উপর পতঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে পিপীলিকার স্বাভাবিক বুদ্ধি বেশ ভালরূপে পরিপুষ্ট বলিয়া

মনে হয়। ইহাদিগের দৈহিক শক্তিও অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি। একটি শক্তিশালী অশ্ব নিজদেহের ওজনের ৭ গুণ ভার বহন করিতে পারে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, পিপীলিকারা নিজ দেহের ১৪ হইতে ২৬ গুণ ভারী পদার্থ অনায়াসে বহিয়া লইয়া যায়।

পিপীলিকা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি চমৎকার কথা বলিতে পারা যায়। সাধারণতঃ ইহারা একই দলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ইত্যাদি না করিলেও, সময় সময় অন্য দলের সহিত যুদ্ধ বাধায় ও বিজিত দলের সঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী এমন কি ডিমগুলি পর্যন্ত লুটিয়া লইয়া যায়। ডিম ও বাচ্চাগুলিকে কিন্তু যত্নসহকারে পালন করিয়া পরে নিজ দলের কর্মী শ্রেণীতে উহাদিগকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইহারা বর্ষার পূর্বে কৃষিকার্যের অনুকরণে কখনও একরূপ বেঙের ছাতার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছের বীজ মাটিতে ছড়াইয়া রাখে; গাছ হইলে প্রাণ ভরিয়া তাহা আহার করে। আবার কেহ কেহ, মধু পান করিতে পারে এইরূপ অন্য পতঙ্গকে নিজ দলে রাখিয়া, ইহাদিগের দেহ হইতে মধু পান করিয়া থাকে। এ সকল অতিশয় আশ্চর্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও সবই সত্য।

পিপীলিকা ও মৌমাছির তুলনা করিলে আমরা কয়েকটি বিষয় এইরূপ লক্ষ্য করিয়া থাকি।

১। বিভিন্ন শ্রেণীর পিপীলিকা ও মৌমাছির আকার দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, রাণী-পিপীলিকা সর্বাপেক্ষা বড় ও পুরুষ সর্বাপেক্ষা ছোট, কিন্তু মৌমাছির বেলায় পুরুষ-মৌমাছি সর্বাপেক্ষা বড় ও কর্মীদের সর্বাপেক্ষা ছোট দেখা যায়।

২। পিপীলিকার পুরুষ ও স্ত্রীর দুই জোড়া করিয়া ডানা আছে, শ্রমিকের তাহা নাই, কিন্তু সর্বশ্রেণীর মৌমাছির ডানা বিদ্যমান।

৩। পিপীলিকা ও মৌমাছির মুখের গড়ন বিভিন্ন।

৪। পিপীলিকাদিগের অধিকাংশের দেহেই হুল নাই, কিন্তু শ্রমিক মৌমাছিদের লম্বা হুল রহিয়াছে, রাণীর হুল অপেক্ষাকৃত ছোট, পুরুষ মৌমাছির কিন্তু একেবারেই হুল নাই।

৫। পিপীলিকার দুইটি চোখ, মৌমাছির কিন্তু পাঁচটি চোখ, দুইটি বড় ও তিনটি ছোট।

মশা

মাছি আর মশার ন্যায় বড় শত্রু মানবের আছে কি না সন্দেহ। ইহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মানবের শত্রুতা সাধন করে। মাছি উড়িয়া গিয়া ময়লার স্তূপে বসে, আর সেখান হইতে যত রাজ্যের আবর্জনা, শত রোগের ভীষণ জীবাণুগুলি, নিজের ঐ ছয়খানি পায়ে মাখিয়া মানুষের আহার্য পানীয় প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থকে, কেবল অপবিত্র করে না, তাহাদিগকে বিষাক্তও করিয়া তোলে। মশা রক্তপায়ী জীব, — মানবদেহের কোমল চর্মের মধ্য দিয়া তাহার মুখস্থিত আহার্যবাহী নল প্রবেশ করাইয়া রক্ত টানিয়া লয়। এই দংশনের ফলে রক্ত তো যায়ই, উপরন্তু উহার মুখ হইতে বিষ-বস্তু আসিয়া সুস্থ দেহে রোগের সঞ্চার করে।

দেহের গঠন-ভেদে মশাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে এনোফিলিস, ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত শোষণকালে, উহার দেহ হইতে ম্যালেরিয়ার যে বীজাণু গ্রহণ করে, তাহাই পরে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। এই পরম সত্য বহুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে, কলিকাতার মেডিকেল কলেজে কার্য করিবার সময় স্যর রোনাল্ড রস প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং পরবর্তী যুগে এই মহা সত্যের আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীগণ রোগ নিবারণ করিয়া শত শত লোকের প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ নোবেল ফাউন্ডেশন সোসাইটি, এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার দ্বারা স্যর রসকে সম্মানিত করেন। স্টেগোমিয়া মশক, এইরূপ পীত জ্বরের জীবাণু বহন করিতে পারে; উহাদের অন্য শ্রেণী, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগের জীবাণু বহন করিয়া বেড়ায়। এই ভীষণ জীবগুলির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার।

মশার দেহ

মশাও পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত। উহার দেহের গঠন, পূর্ববর্ণিত অন্যান্য পতঙ্গেরই যে অনুরূপ, তাহা পূর্বেই দেখিয়াছ। তবে উহাদের পক্ষ-সংখ্যা দুইটি; এই জন্য উহারা দ্বিপত্রী বা ডিপটেরা (diptera) বলিয়া পরিচিত। আর একজোড়া পক্ষের স্থানে যে দুইটি যন্ত্র উহার পক্ষদেশের মূলে অবস্থিত তাহাদিগকে হলটেয়ার্স্ (halteres) বলে। মুখের গঠন সর্বপ্রকার মশার একরূপ নহে। পুরুষ-মশা রক্তপায়ী নহে, উহারা গাছপালার রস আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করে। সুতরাং উহাদিগের মুখে রক্ত শোষণ করিবার কোনও ব্যবস্থা নাই। স্ত্রী-মশাই বিপদের প্রধান কারণ, ইহারাই মানবের রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মস্তকের পুরোভাগে, চক্ষু দুইটির সম্মুখে, স্পর্শ-নলের সঙ্গে আরও ৭টি প্রায় সমদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট প্রবোসিস্ নল অবস্থিত। তাহাদের মধ্যে ছয়টি নল চামড়ার মধ্যে কিছু দূরে গমন করিয়া রক্ত টানিতে থাকে, সপ্তমটি বাহিরেই থাকে, এবং রক্ত শোষণকালে ইহাকে ধনুকের ন্যায় বাঁকান দেখা যায়।

মনে হয়, ইহার বক্ষঃস্থল তিনটি বৃত্তখণ্ডের সহযোগে নির্মিত। ইহাদিগের প্রত্যেক খণ্ডের সহিত দুইটি করিয়া পা সংযুক্ত এবং উহাদিগের উপরিভাগের ডানা দুইটি জোড়া রহিয়াছে। বক্ষঃস্থলের পুরোভাগে এবং দেহের মধ্যে কতকগুলি লালা-নিঃসারক গণ্ড রহিয়াছে। ইহারই মধ্যে একরূপ তৈল জাতীয় পদার্থ থাকে। মশা যে স্থানে দংশন করে, তথায় এই লালা গিয়া প্রবিষ্ট হয়। কোনও কোনও মশার লালায় একরূপ বিষাক্ত পদার্থ থাকে; যখন চামড়ার নীচে এই পদার্থের স্পর্শ ঘটে, তখন অতিশয় জ্বালা অনুভূত হয়। অবশ্য সব জাতীয় মশার দেহে এই পদার্থটি থাকে না; কিউলেক্স (culex) জাতীয় মশারই ইহা বিশেষত্ব।

মশার ক্রমপরিবর্তন (metamorphosis of the mosquito)

মশার দেহ ক্রমপরিবর্তনের ফলেই গঠিত হয়। স্ত্রী-মশার উদরের শেষ প্রান্তে থাকিয়া ডিম্বগুলি পুষ্ট হইতেই তাহারা পানির উপর এই ডিম্ব ছাড়িয়া দিয়া আসে। অবশ্য তাহারা দেখিয়া শুনিয়া স্থির পানি, যেমন পুষ্করিণী বা ডোবার পানিতেই এই ডিম

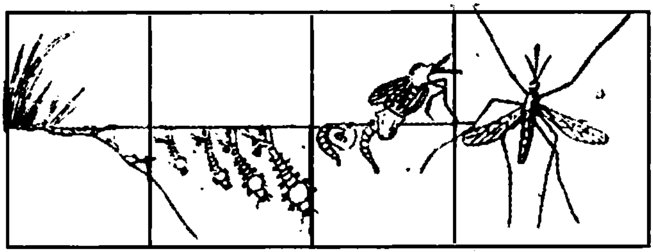

মশার ক্রমপরিবর্তন

ছাড়িয়া থাকে। মনে হয়, একটু ময়লা হইলেই যেন পানি এই ডিমের পক্ষে অধিকতর উপাদেয় হয়। এই ডিম হইতে ধীরে ধীরে একরূপ শূক-কীট বা লার্ভা নির্গত হয়। লার্ভাগুলি পানি হইতে আহার্য গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে; বিশেষতঃ পানিমধ্যে পচা পাতা প্রভৃতি থাকিলে তো কথাই নাই। পানিতে অবস্থানকালে কখনও কখনও ইহারা পানির নীচে চলিয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই পানির উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে এবং পানির মধ্য হইতে উপরে উঠিয়া বাতাস লইয়া বাঁচে। এইসময় উহাদিগকে দেখিলে জলচর কীট বলিয়াই মনে হইবে। ইহারাই যে মশার বংশধর তাহা তখন নির্ণয় করা কঠিন। মশার শূক-কীটের যে বড় ছবি উপরে দেওয়া গেল, তাহা দেখিলেই আমাদের কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবে। আমাদের দেশের উত্তাপ ডিমগুলির ক্রমবর্ধনে যথেষ্ট সাহায্য করে। ডিম হইতে শূক-কীট জন্মিয়া বড় হইতে মাত্র পাঁচ ছয় দিন সময় লাগে। এইবার ক্রমপরিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে উহারা আসিয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে পুত্তলিতে পরিণত হয়। তাহার দেহের এই আবরণটি আরও দুই কি তিন দিন থাকে এবং পরে তাহার মধ্য হইতে ইমাগো (imago) বা সম্পূর্ণ মশা নির্গত হয়।

মশার ধ্বংস

পূর্বে বলিয়ছি, মশা মানবের একটি প্রধান শত্রু। এই শত্রু ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবন করার ফলেই ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া লোকে জগতের একটি আশ্চর্য কীর্তি সুবৃহৎ পানামা খাল কাটিতে পারিয়াছিল। মশার হস্ত হইতে, মশারির সাহায্যে কতকটা পরিত্রাণ পাইলেও, তাহা তত নিরাপদ নহে। এইজন্য উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলাই সমীচীন। এই কার্যের জন্য কখনও কখনও রাত্রে দ্রব্য বিশেষের ধোঁয়া, আমরা ব্যবহার করি, কিন্তু তাহাতে মশা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় কিনা সন্দেহ। কেরোসিন সাহায্যেই ইহারা মরিয়া যায়। বিশেষতঃ পানিতে যখন ইহারা অপরিণত অবস্থায় ছুটিয়া বেড়ায়, সেই সময় উহার উপর কেরোসিন ছড়াইলে তাহারা মরিয়া যায়। অধুনা অন্যান্য দ্রব্যও এই কার্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে ডিডিটি-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পদার্থটি করোসিন তৈলে গুলিয়া চতুর্দিকে ছড়ান হয়। উহার সহিত মশার স্পর্শ ঘটিলেই মশাটি নিশ্চিত মরিয়া যায়।

মাকড়সা

মেরুদণ্ডহীন জীবের মধ্যে মাকড়সা আর একটি। ইহার পরিচয় তোমাদের নিকট নূতন নহে। তবে তোমরা বোধ হয় সকলে জান না যে, ইহার স্বজাতি আর একদল মাকড়সা পানিতে বাস করে। এই জলচর মাকড়সা নিজ দেহনিঃসৃত একরূপ আঠাল পদার্থ সহযোগে পানির মধ্যে নিজ বাসের জন্য ঘর প্রস্তুত করে। এই ঘরগুলির প্রবেশদ্বার নিম্নদিকে। প্রথমে এই ঘর পানিতে ভরিয়া থাকিলেও, উহারা পানির উপর আসিয়া নিজ লোমশ পায়ের সাহায্যে উপর হইতে বায়ু লইয়া যায় ও নিজ ঘর হইতে পানি সরাইয়া বায়ু দ্বারা উহা পূর্ণ করে। এই বায়ু তাহারা নিজ শ্বাসকার্যে নিয়োজিত করে। পানির মধ্যে উহারা মাছের দেহের রস, পানির উপর হইতে কীট-পতঙ্গ লইয়া গিয়া আহার করে।

মাটির উপরে যাহারা চলিয়া বেড়ায়, জাল তৈয়ার করে, অব্যবহৃত কামরার প্রত্যেক কোণেই বাসা বাঁধে, সেই সকল মাকড়সাও ঠিক এক শ্রেণীর জীব নহে। ইহাদিগকেও কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দলের বিশেষ পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে। উহাদিগের সাধারণ গঠন-প্রণালী এবং অভ্যাসের কথা বলিয়াই মাকড়সার কাহিনী শেষ করিব।

মাকড়সা মেরুদণ্ডহীন প্রাণী, কিন্তু পূর্ববর্ণিত পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত নহে। এই শ্রেণীকে প্রাণীবিদ আর্থপোডা (arthopoda) শ্রেণীর মধ্যে এরাকনিদ শাখাভুক্ত করিয়াছেন। কাঁকড়াবিছা প্রভৃতিও ইহারই আর একটি শাখা-শ্রেণীর অন্তর্গত। মাকড়সার ছবিটি দেখিলে পতঙ্গের সহিত ইহার পার্থক্য নজরে পড়িবে। ইহার দেহটি দুই অংশে বিভক্ত; যে অংশে মস্তক ও বক্ষঃস্থল রহিয়াছে তাহার নাম সিফালোথোরাক্স (cephalothorax) এবং অন্য অংশটি উদর প্রদেশ নামে অভিহিত। সিফালোথোরাক্স-এর পুরোভাগে ইহার চারিজোড়া সরল চক্ষু সংস্থাপিত; উহার মধ্যে মাছির ন্যায় বহুসংখ্যক লেন্স নাই, সাধারণ চক্ষু বলিয়াই ইহা পরিচিত। মুখ-গহ্বরের সম্মুখে পতঙ্গের ন্যায় antannae না থাকিলেও, যে দুইটি লোমশ নল বিদ্যমান তাহার দ্বারা সে শত্রুদেহে বিষ সঞ্চালন করিতে পারে। এই দুইটি চেলিসেরা (chelicera) নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যেভাগ ফাঁপা এবং মস্তকের মধ্যে পুরোভাগে অবস্থিত বিষ-ভাণ্ডের সহিত ইহারা সংযুক্ত। সিফালোথোরাক্স-এর সহিত মাকড়সার আটটি পা সংযুক্ত, এই

মাকড়সার দেহের অভ্যন্তর

আটটি পায়ের জন্যই ইহারা অষ্টপদী। এই পাদদেশের শেষ প্রান্ত হইতে উদর দেশ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার উদর অপেক্ষাকৃত নরম। উদরের শেষ প্রান্তে গুহ্যদ্বার অবস্থিত, কিন্তু উহার পুরোভাগের নীচের দিকে অন্য একটি দ্বার রহিয়াছে, যাহার মধ্য দিয়া ডিম প্রসূত হয়। ইহার শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য সম্পাদিত হয় কতকগুলি পুস্তকাকার ফুসফুসীয় কোষ (pulmonary sacs) সাহায্যে। ইহাকে ফুসফুস-বই নাম দেওয়া যাইতে পারে। এইগুলি দেহনিম্নে সিফালোথোরাক্স্-এর শেষ প্রান্তে উদরভাগেই বিদ্যমান। এই পুস্তকাকার ফুসফুসের পাতার মাঝে মাঝে রক্ত যাইয়া অম্লজান সহযোগে শোধিত হয়। গুহ্যদ্বারের পার্শ্বে তিনটি এরাকনিদা বর্তমান, ইহার মধ্য হইতে একরূপ তরলপদার্থ নির্গত হয়, যাহা বায়ুর সহিত সংস্পর্শ ঘটিলেই শক্ত হইয়া রেশমের আকার ধারণ করে। এই পদার্থ দ্বারাই মাকড়সা নিজ বাসের জন্য এবং খাদ্য আহরণের ফাঁদ স্বরূপ জাল পাতিয়া থাকে। দেহের অভ্যন্তরে রক্তবাহী নলগুলি বর্তমান। ঠিক উদর-ত্বকের নিম্ন দিয়াই বৃহত্তম রক্তবাহী নলটি অবস্থিত; ইহারই স্ফীত অংশ হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য করিয়া থাকে। পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে মাকড়সার দেহমধ্যস্থ বিভিন্ন যন্ত্রের অবস্থান দেখান হইয়াছে। মাকড়সাকে মাথা হইতে উদরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মাঝামাঝি কাটিলে যে রূপ দেখা যায় তাহাই চিত্রে দেখান হইল।

মাকড়সা কিন্তু পতঙ্গের ন্যায় ক্রমপরিবর্তনের ফলে পরিণত দেহ প্রাপ্ত হয় না। স্ত্রী-মাকড়সা যে ডিম প্রসব করে, তাহার মধ্যেই মাকড়সা-শিশু ধীরে ধীরে বাড়িয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলেই বাহির হইয়া আসে। ডিমগুলি স্ত্রী-মাকড়সা দেহের নিম্নভাগে একটি থলির ন্যায় আবরণের মধ্যে রাখিয়া অনবরত রক্ষা করে। সম্পূর্ণ দেহ-গঠনের পর শিশু-মাকড়সা যখন প্রথম বাহিরে আসে, তখন তাহাকে অপরিণত ছাগশিশু বা গরুর বাছুরের মতোই মাতার অনুরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট মনে হয়। ক্রমে উহারা পুষ্ট হইয়া পরিণত দেহ পাইয়া থাকে।

মাকড়সা ও পতঙ্গের দেহের মধ্যে সাদৃশ্য অতি অল্পই আছে; পার্থক্যই অধিক। যেমন ধর ঃ

১। পতঙ্গ দেহ—মাথা, বুক ও পেট এই তিনটি অংশে বিভক্ত; কিন্তু মাকড়সার দেহ, মাথা ও পেটের সমন্বয়ে প্রস্তুত।

২। পতঙ্গ শ্রেণীর অধিকাংশেরই ডানা আছে, কিন্তু মাকড়সার তাহা নাই।

৩। মাকড়সার চক্ষু সরল কিন্তু সংখ্যায় আটটি, পতঙ্গ কিন্তু পুঞ্জাক্ষ-বিশিষ্ট।

৪। পতঙ্গ-মুখে শুঙ্গ ও এন্‌টানি থাকিলেও মাকড়সার মুখে তাহা নাই।

৫। পতঙ্গ-দেহে হুল ফুটাইবার ব্যবস্থা আছে, মাকড়সার সেইরূপ হুল নাই বটে, তবে বিষের আধার উহার দেহে বর্তমান রহিয়াছে।

৬। পতঙ্গ শ্বাসকার্য সম্পাদন করে বায়ু-নালীর সাহায্যে, মাকড়সার সে স্থানে ফুসফুস-বই রহিয়াছে।

৭। শ্রেণীবিভাগ ব্যাপারেও ইহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন, মাকড়সার পুরুষ ও স্ত্রী এই দুইটি শ্রেণী, কিন্তু অধিকাংশ পতঙ্গেরই পুরুষ ও স্ত্রী ব্যতীত কর্মী শ্রেণীও রহিয়াছে।

৮। পতঙ্গ-দেহ সাধারণতঃ ক্রমপরিবর্তন-ফলে গঠিত হয়, কিন্তু মাকড়সা-শিশু ডিম হইতেই জন্ম লাভ করে।

ব্যাঙ্-এর কথা

এতদিন তোমরা কতকগুলি মেরুদণ্ডহীন জীব সম্বন্ধেই কিছু জ্ঞান লাভ করিলে। মেরুদণ্ডী জন্তুদের মধ্যেও নানাবিধ প্রাণী বর্তমান। ইহাদের কেহ বা পানিতে বাস করে, কেহ বা স্থলে বাস করিয়া থাকে; কেহ বা পদহীন আবার অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণী পদবিশিষ্ট। পাখীরা মেরুদণ্ডী শ্রেণীভুক্ত। উহাদিগের পায়ের সংখ্যা দুইটি, এবং দুইটি পাখা অন্য দুইটি পায়ের স্থানে বিদ্যমান। বাদুড় মেরুদণ্ডী প্রাণী, কিন্তু ইহারা পাখীর শ্রেণীভুক্ত নহে। পশু-পক্ষী সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা তোমরা পরে জানিবে। ইতঃপূর্বে একপ্রকার মেরুদণ্ডী জীব — মাছের কথা তোমাদের বলিয়াছি; এখানে মাছ অপেক্ষা উন্নততর আর একটি জীবের পরিচয় দিব। এই শ্রেণী উভচর বা এম্‌ফিবিয়া (amphibia) নামে পরিচিত। ব্যাঙ্ ইহাদিগের অন্তর্গত। ইহারই বিশিষ্ট পরিচয় এখানে দিবার চেষ্টা করিব।

ব্যাঙ্ একপ্রকার নহে; দেহের বহির্ভাগের রূপবিশেষে ইহাদিগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। আমাদের দেশে, জলে স্থলে কয়েক রকম ব্যাঙ্ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কোলা ব্যাঙ্, সোনা ব্যাঙ্, সবুজ গেছো ব্যাঙ্, কটকটে ব্যাঙ্ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের মধ্যে সোনা ব্যাঙ্ ও সবুজ ব্যাঙ্-এর সংখ্যা

কোলা ব্যাঙ্ কটকটে ব্যাঙ্

অত্যন্ত অল্প, কারণ শৈশবাবস্থায় উহাদিগের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়। জমি চাষ দিবার সময় ইহারা জলপূর্ণ জমির মধ্যে বর্ষাকালে ডিম পাড়িয়া থাকে। এই দুই জাতীয় ব্যাঙ্ ধরিয়া এখনও পল্লীগ্রামের ছেলে-মেয়েরা ব্যাঙ্-এর বিবাহ দেয়। পশ্চিমে কিন্তু সুসভ্য মানুষ ব্যাঙ্-এর মাংসের আস্বাদ পাইয়াছে এবং এই দুই রকম ব্যাঙ্ সে দেশে মানুষের সেবার জন্যও ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় বর্তমানে মাছের ন্যায় ব্যাঙ্-এরও চাষ হইয়া

থাকে। কিন্তু কটকটে ব্যাঙ্-এর পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি ছোট ছোট থলির ন্যায় দানা রহিয়াছে; উহাদের মধ্যে একরূপ বিষাক্ত রস সঞ্চিত থাকে, সেজন্য উহারা আর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না।

নিম্নে ও পূর্ব পৃষ্ঠায় ব্যাঙ্-এর যে ছবি দেওয়া হইল, তাহা হইতেই উহার বহির্ভাগের রূপ সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিতে পারিবে। ইহারা চারিপদ-বিশিষ্ট জন্তুর ন্যায়। পার্থক্য এই যে, ইহার পুরোভাগের পদ দুইটি পরস্পর-জোড়া চারি অঙ্গুলী-বিশিষ্ট। কিন্তু নিম্নভাগের দুইটি পদে পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলী রহিয়াছে, তন্মধ্যে পঞ্চম অঙ্গুলী অতিশয় ক্ষুদ্র। এই অঙ্গুলীগুলিও পরস্পরের সহিত হাঁসের পায়ের ন্যায় পাতলা ত্বকের সাহায্যে জোড়া। পায়ের এইরূপ গঠনের ফলেই উহারা পানিতে সাঁতার কাটিতে সমর্থ। উহার সম্মুখে রহিয়াছে মুখ-গহ্বর এবং পশ্চাদ্‌প্রান্তে গুহ্যদ্বার অবস্থিত। পরিণতবয়স্ক ব্যাঙ্-এর দেহে লেজ দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার মুখ আকর্ণ বিস্তৃত, উপরের চোয়ালে কতকগুলি তীক্ষ্ণ দন্ত বিদ্যমান, কিন্তু নিম্ন চোয়ালে দাঁত নাই। মস্তকের সম্মুখভাগে দুইটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ চক্ষু একটু যেন উঁচু রহিয়াছে; ইহাদিগের মধ্যস্থানে ওষ্ঠপ্রান্তের উপরে নাসিকার ছিদ্র বর্তমান এবং চক্ষুদ্বয়ের পশ্চাতে দুইটি চক্ষু-আবরণীও আছে; ইহাই পশ্চাতে কর্ণরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। কর্ণরন্ধ্র পাতলা পরদা দ্বারা আবৃত থাকে; উহার মধ্যে রহিয়াছে কর্ণপটহ। মাছের মস্তকে এই কর্ণপটহ দেখিতে পাওয়া যায় না। দেহের আবরণ বিভিন্ন শ্রেণীর ভেকের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের; কাহারও বা ধূসর এবং কাহারও রং ধূসর মিশ্রিত সোনালী এবং কেহবা ধূসরের সহিত সবুজ বর্ণবিশিষ্ট।

গেছোব্যাঙ্

ইহাদের দেহের আভ্যন্তরীণ চিত্র অনেকটা মানব দেহের ন্যায়। ভেকের কঙ্কাল প্রায় নরকঙ্কালের মতো। পর পৃষ্ঠার চিত্র হইতে ইহা বুঝিতে পারিবে। তবে প্রভেদ এই যে, মানব দেহের ন্যায় ইহার মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি বাঁকিয়া বক্ষঃস্থলের বিভিন্ন যন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য পঞ্জরের আকার গ্রহণ করে নাই। ইহার দেহনিম্নে পেলভিক অস্থি মানব শরীরের অনুরূপ নহে। মস্তকের খুলিও ঠিক একরূপ নহে, এবং অস্থি-সঙ্গমগুলিও বিভিন্ন প্রকারের।

উহার মাথার খুলির অভ্যন্তরে মস্তিকের বিভিন্ন অংশ বর্তমান। ইহাই স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রভূমি। এই স্থান হইতেই ব্যাঙ্-এর শরীরের বিভিন্ন কার্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে, সে কথা তোমরা বড় হইলে জানিতে পারিবে। রক্ত চলাচলের জন্য রক্তবাহী চক্র ইহার দেহের মধ্যেও বর্তমান রহিয়াছে, এবং হৃদ্‌যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। অপরিষ্কার শিরা-প্রবাহী (venous) রক্ত, হৃদ্‌পিণ্ড সাহায্যে ফুস্‌ফুসের মধ্যে গিয়া অক্সিজেন সংযোগে নূতন হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে। ইহারা ফুস্‌ফুসের দ্বারাই বাতাস গ্রহণ করে, অর্থাৎ ভেকের পরিণত অবস্থায় নিশ্বাসকার্য ফুস্‌ফুস সাহায্যে সম্পাদিত হয়।

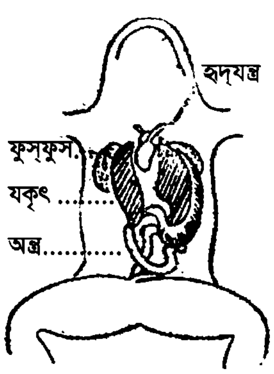

ব্যাঙ্-এর দেহের অভ্যন্তর

ব্যাঙ্ খাদ্য গ্রহণ করে স্বীয় জিহ্বার সাহায্যে। জিহ্বা বাড়াইয়া উহারা তৎপরতার সহিত স্বীয় খাদ্যবস্তু ধরিয়া মুখে পুরিয়া ফেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা কীট-পতঙ্গ খাইয়া জীবন ধারণ করে। উহার উপরের চোয়ালে যে দাঁত রহিয়াছে, তাহারই সাহায্যে এই পতঙ্গ প্রভৃতিকে ধরিয়া রাখিতে পারে, এবং এইরূপে ধৃত কীট মুখ হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। নিম্ন চোয়ালে দাঁত না থাকায় ইহারা চর্বণ কার্য করিতে পারে না; ব্যাঙ্-এর জিহ্বা দীর্ঘ, নমনীয় ও আঁঠাল, এবং উহার মুখের সম্মুখভাগের সহিত সংযুক্ত। খাদ্যবস্তু কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে উপস্থিত হয় এবং ক্রমে অন্ত্রমধ্যে আসিয়া পৌঁছে। ইহার শরীরে যকৃৎ এবং পিত্তকোষও (gall bladder) বিদ্যমান, পিত্তপ্রবাহিকার (bile duct) চতুষ্পার্শ্বে পাচক গ্রন্থিগুলি (pancreas) অবস্থিত।

ব্যাঙ্-এর ক্রমপরিবর্তন (metamorphosis of a frog)

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্-এর গঠনপ্রণালী প্রায় একরূপই। ব্যাঙ্ কিন্তু ডিম হইতে উৎপন্ন হয়, এবং ইহার জন্ম-কাহিনী অতিশয় বিস্ময়কর। ক্রমপরিবর্তনের ফলেই ডিম হইতে ইহার দেহের পূর্ণ পরিণতি হইয়া থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে ইহারা ডোবা ও পুকুরের স্থির পানিতে ডিম ছাড়িয়া থাকে। ব্যাঙ্-এর ডিমগুলি পানিতে ভাসিয়া বেড়ায় এবং প্রায় পুকুরের কিনারায়, ঘাস-পাতার মধ্যে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে এই ডিমগুলি গোলাকার লালা-সদৃশ মনে হয়, এবং উহার মধ্যভাগে একটি কাল রং-এর দানা থাকে (পর পৃষ্ঠার চিত্রের উপরিভাগে দেখ)। এই দানাটিই ক্রমে বাড়িয়া বেঙ্গাচির জন্ম দেয় (ঐ চিত্রের নিম্নদেশে দেখ) ক্রমে উহার মস্তকের দুই পার্শ্বে ফুল্‌কার ন্যায় শ্বাসযন্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উহারা মাছের ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ

করিয়া চলে। পরে ক্রমে লেজের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি পদের আবির্ভাব হয়। এবং কিছু দিন পরে সম্মুখের পা দুইটি গঠিত হইতে থাকে। এই সময় উহাদিগের দেহের অভ্যন্তরে ফুস্‌ফুসও নির্মিত হয়। কিছুকাল পর্যন্ত উহারা ফুল্‌কা এবং ফুস্‌ফুস উভয় যন্ত্রের সাহায্যেই শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে; তারপরই উপরের আবরণ ত্বকটি পরিত্যাগ করে। এই সময় ফল্‌কাও নষ্ট হইয়া যায় এবং উহারা তখন ফুস্‌ফুস সাহায্যেই শ্বাস গ্রহণ করে। এই অবস্থার পূর্ব পর্যন্ত পানির মধ্যে সব্জি পদার্থ খাইয়া ইহারা বাড়িতেছিল। এইবার খাদ্য-পদার্থও পরিবর্তিত হয়, এবং এখন আমিষ আহারই উহারা অধিকতর পছন্দ করে। এই সময় পর্যন্ত উহাদিগের একটি ক্ষুদ্র লেজ থাকে। কিন্তু ক্রমে পশ্চাতের পদদ্বয় যতই পুষ্ট হইতে থাকে, লেজও ততই ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। ইহারা নানারূপ পতঙ্গ কীট প্রভৃতি আহার করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

ব্যাঙ্‌-এর বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার শরীর মাছের তুলনায় অনেক

ব্যাঙ্‌-এর দেহের ক্রমপরিণতি

উন্নত ধরনের। মানব শরীরের সহিত ইহার দেহের অনেক সাদৃশ্য আছে। অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু ইহা অপেক্ষা আরও উন্নত ধরনে গঠিত, এবং মানব দেহেই এই উন্নতির চরম পরিণতি ঘটিয়াছে।

ব্যাঙ্‌ ও মাছের দেহের তুলনায় নিম্নের বিষয়গুলি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

১। মাছের দেহে পাখনা রহিয়াছে, কিন্তু ব্যাঙাচি বা ব্যাঙের দেহে ঐরূপ পাখনা নাই।

২। মাছ ও ব্যাঙাচির চোখে পাতা নাই, কিন্তু ব্যাঙের চোখে পাতা রহিয়াছে।

৩। ব্যাঙ ও ব্যাঙাচির নাকের সহিত মুখও সংযুক্ত কিন্তু মাছের দেহে এইরূপ সংযোগ নাই।

৪। মাছের দেহ আঁইশ-যুক্ত, ব্যাঙ্ বা ব্যাঙাচির দেহ ঐরূপ নহে। মাছ বা ব্যাঙাচির কানের অস্তিত্ব বাহির হইতে বুঝা যায় না, কিন্তু ব্যাঙ্-এর কান ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে ও তাহা বুঝিতে পারা যায়।

৫। মাছ ও ব্যাঙাচি সাধারণতঃ পানিতে বাস করে তবে ব্যাঙ্ উভচর। জল ও স্থল উভয় স্থানেই ইহাদিগকে বিচরণ করিতে দেখা যায়।

৬। মাছের হৃদয় দুইটি প্রকোষ্ঠ সম্বলিত, ব্যাঙাচির হৃদ্‌যন্ত্র প্রথমে সেইরূপ থাকিলেও, পরে উহা তিনটি প্রকোষ্ঠ-সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৭। মাছ সাধারণতঃ ফুল্‌কার সাহায্যেই নিঃশ্বাস কার্য চালায়। ব্যাঙাচির প্রথম অবস্থায় ঐরূপ ব্যবস্থাই থাকে, তবে কিছুদিন পরে ফুল্‌কা ও ফুস্‌ফুস দুইটি যন্ত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। পরিণত ব্যাঙের কিন্তু ফুল্‌কা থাকে না, কেবলমাত্র ফুস্‌ফুসই থাকে।

৮। মাছ এনোফিলিস্ মশার অপরিণত শিশুগুলিকে খাইয়া মানুষের উপকার করে, ব্যাঙাচিও গলিত মৃতদেহের অংশ খাইয়া পানি পরিষ্কার করে। ব্যাঙ্ কিন্তু নানাবিধ ক্ষুদ্র কীট খাইয়া বহু শস্য রক্ষা করে।

৯। মাছ মানুষের খাদ্য, মাছের তেলও উপকারী পদার্থ, উহার আঁশ ও কাঁটা বা অস্থিও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। ব্যাঙ্ সাধারণতঃ ঐরূপ কাজে লাগে না, তবে কোনও কোনও দেশের লোক ব্যাঙ্-এর মাংস খায় ও উহার চামড়া দ্বারা ছোট জুতা ও মানিব্যাগ ইত্যাদি তৈয়ারী করে।

প্রাণী এবং উদ্ভিদের পরস্পর সম্বন্ধ

(Interdependence of plants and animals)

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, উদ্ভিদও প্রাণ-সম্পন্ন; সুতরাং উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে একটি নিকট সম্বন্ধ বর্তমান। উদ্ভিদ নড়িয়া চলিতে পারে না, কিন্তু তবু তাহাকে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিতে হয়। মাটির মধ্যস্থিত পানি ও অন্যান্য বস্তু, অথবা বাতাসে বিদ্যমান অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প, অধিকাংশ উদ্ভিদের ইহাই প্রধান খাদ্য। কিন্তু এমনও দেখা গিয়াছে যে, উদ্ভিদও হিংস্র হইতে পারে, ইহাদিগের কেহ কেহ আমিষ পদার্থ পাইলে তাহাও ভক্ষণ করিয়া থাকে। যেমন কোনও শ্রেণীর বৃক্ষ, পত্র সাহায্যেও নানাবিধ কীট-পতঙ্গ ধরিয়া আহার করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে ঝাঁজিদাম নামীয় একরূপ জলজ-উদ্ভিদ, লাল ভেরেণ্ডা, ড্রসেরা প্রভৃতি স্থলজ উদ্ভিদের কথা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অধিকাংশ উদ্ভিদ নিজে বংশ-বিস্তারের জন্য পতঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। পতঙ্গগুলি হয় পুষ্পের সৌন্দর্যে, গন্ধে অথবা উহার মধ্যস্থিত মধুরসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন পুষ্পে গমন করে; এবং তথায় গর্ভকেশরের সহিত পরাগ বা পুষ্পরেণুর সম্মিলন ঘটাইয়া নূতন ফল এবং বীজের সৃষ্টি করে। এইরূপ না ঘটিলে বহু উদ্ভিদের বংশরক্ষা করা সম্ভবপর হইত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উদ্ভিদ বিশেষভাবেই জীব-জগতের কাছে ঋণী।

উদ্ভিদের ঋণের পরিমাণ এইখানেই সীমাবদ্ধ নহে। তোমরা পূর্বে শুনিয়াছ যে, উদ্ভিদ এই নাইট্রোজেন-সম্বলিত খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে মাটির মধ্য হইতে। সাধারণতঃ এই নাইট্রোজেন সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন প্রকার পুরীষ ও জীবের দেহাবশেষ সহযোগে। গোময় এবং পাখীর বিষ্ঠা মাটিতে পড়িয়া, নানারূপ জীবাণুর সাহায্যে পরিবর্তিত হইয়া, উদ্ভিদের উপযোগী নাইট্রোজেন পদার্থ উৎপাদন করে। নানা প্রকার মৃত প্রাণীর দেহ হইতেও উদ্ভিদের উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত হয়; বিশেষতঃ ফস্‌ফোরাস, জীব-জন্তুর অস্থি হইতেই মৃত্তিকায় গমন করে, এবং তথা হইতে পুনরায় উদ্ভিদ দেহে আসিয়া, উহার দেহের গঠন-ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে। নভশ্চর বিদ্যুৎ শক্তিও বাতাসের অম্লজান ও নাইট্রোজেনকে পরিবর্তিত করিয়া উদ্ভিদের উপযোগী খাদ্য পদার্থে পরিণত করিয়া থাকে।

বিভিন্ন শত্রুর অত্যাচার হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার নানাবিধ উপায় বৃক্ষরাজি অবলম্বন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শত্রু উহার কম নাই। নানাবিধ প্রাণী, উদ্ভিদ জগৎ হইতেই উহাদিগের আহার্যবস্তু সংগ্রহ করিয়া থাকে। কেহ বা পাতা, কেহ বা

টাট্‌কা পাতাই ভক্ষণ করে; পতঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় উহারা যেমন পত্রভুক, তেমনি মধু এবং পুষ্প-রেণুও উহাদিগের নানা অবস্থায়, দেহ গঠনে সহায়তা করে। হিংস্র মাংসাশী জন্তুর কথা ছাড়িয়া দিলেও, উন্নততর স্তরের প্রত্যেক প্রাণীই, উদ্ভিদের সাহায্যে দেহের পুষ্টি সাধন করে দেখা যায়। গাছের ফুল, ফল, পাতা, মূল কোনওটিই একেবারে ত্যাগ করিবার বস্তু নহে।

মানব বুদ্ধিমান জীব। তাহার সেবায় যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাই নিয়োজিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ বৃক্ষের ফলই, তাহার প্রধান খাদ্য, কিন্তু পাতাও একেবারে পরিত্যক্ত হয় না। এখন তো জানা গিয়াছে যে, সবুজ পাতা, যথা লেটুস, ধনে পাতা, পুদিনা প্রভৃতি এবং টাট্‌কা ফল না হইলে জীবন ধারণের সর্ব প্রকার উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, উদ্ভিদ এবং জন্তু, ইহারা পরস্পরের উপর নিরতিশয় নির্ভরশীল, — একেকটির জীবন আর একটির সাহায্য না পাইলে অচল হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়।

উদ্ভিদ সৌরশক্তির প্রভাবেই জন্মগ্রহণ করিয়া পরিবর্ধিত হয়। উদ্ভিদ দেহের পত্র, পল্লব, পুষ্প ও ফল সমস্তই আলোকের প্রভাব ব্যতিরেকে পরিণতি লাভ করিতে পারিত না। পূর্বেই দেখিয়াছি সূর্যালোক কিরূপে উদ্ভিদ জীবনের জন্য পরম প্রয়োজনীয়। তাই যদি বলা যায় যে, উদ্ভিদ পদার্থ প্রকৃত প্রস্তাবে সৌরশক্তির দান, তাহা মিথ্যা হইবে না।

পুনরায় ইহাও এখন স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গেল যে, প্রাণীজীবন উদ্ভিদের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। আহার না হইলে প্রাণীজীবনের নড়িবার বা চলিবার শক্তি থাকে না। কাজেই প্রাণীজীবনের শক্তি উদ্ভিদ দেহ হইতে প্রাপ্ত খাদ্যের পরিবর্তন দ্বারা উদ্ভূত হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। এইজন্যই ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সৌর-শক্তি পরিবর্তিত আকারে উদ্ভিদ দেহে পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে, তাহাই দেহে প্রবেশ করিয়া পুনরায় প্রাণীর প্রত্যেকটি অঙ্গ চালনায় ব্যঞ্জনা লাভ করে। আশ্চর্য এই বিশ্বস্রষ্টার বিধান! কত রকমে শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাই, কিন্তু একটু যত্ন সহকারে চিন্তা করিলে এই সমস্ত শক্তির উৎস ঐ বিরাট শক্তিমান সূর্যে ন্যস্ত রহিয়াছে, বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

তৃতীয় পর্ব

নরদেহের ইতিকথা

"নগণ্য এক বিন্দুরে নিয়া
জমাট বাঁধা করিনু তারে,
জমাটের পরে পরিবর্তিনু
ক্ষুদ্র এক পিণ্ডাকারে,
তুচ্ছ পিণ্ডরে অর্পিয়া অস্থি
পরানু তাহারে মাংসভার
দিনু পুনঃ তারে সৃজনীশক্তি
অন্যেরে যেন পারে সৃজিবার।"

— পবিত্র কোরান

মানবদেহের পরিচয়

মানবের দেহ বিশ্বস্রষ্টার একটি বিশিষ্ট এবং আশ্চর্য সৃষ্টি। দেহের বহিরাবরণ দর্শন করিয়া উহার অভ্যন্তরভাগের কোনও ধারণা করিতে পারা যায় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার বৈচিত্র্য অভ্যন্তরভাগেই নিহিত রহিয়াছে। আমরা দেখি, মানবের দেহ সমস্ত দিবস ধরিয়াই নানা কার্য করিয়া চলিয়াছে, এবং দিবাশেষে ক্লান্ত দেহ যখন বিশ্রাম-আশায় ঘুমে অচেতন হইয়া পড়ে, তখনও দেহের মধ্যভাগে স্রষ্টার বিচিত্র যন্ত্র নিজ কার্য করিয়া চলে। এই জন্য ঘুমন্ত মানব দেহের উপর দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাই, তাহার বক্ষদেশ নিরন্তর উঠিতেছে ও নামিতেছে। বক্ষ-স্পন্দন হইতে বুঝিতে হয়, তাহার হৃদ্‌যন্ত্র কাজ করিয়াই চলিয়াছে। ইহার সহিত আরও অনেকগুলি যন্ত্র এমনভাবে সংযুক্ত যে, তাহারাও উহার সঙ্গে কাজ করিয়া থাকে। দেহের এই বিভিন্ন অংশের একটু বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন।

দেহের বহির্ভাগ দর্শন করিয়া তাহাকে যত সুন্দর বলিয়া আমাদিগের ধারণা হয়, তাহার অন্তর্ভাগের পরীক্ষায় সেই সৌন্দর্যের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। মানবের

বৈশিষ্ট্য প্রকৃতপক্ষে উহার বহিরাবরণের জন্য; দেহের অন্তরভাগ প্রায় সকলেরই একরূপ। দেহের বিশ্লেষণ করিলে উহাকে প্রধানতঃ তিনটি অংশে ভাগ করা যায়, — প্রথম ইহার বহিরাবরণ চর্ম, দ্বিতীয় মাংস ও পেশী সমুদয়, এবং তৃতীয় অস্থি। এই অস্থি প্রকৃতপক্ষে দেহের কাঠামো, এবং ইহারই উপর মাংস এবং পেশীসমূহ যথাযথ বিন্যস্ত হইয়া দেহ গঠন করে। নিম্নে মানবদেহের বিভিন্ন চিত্র দেওয়া হইল। প্রথম চিত্রে দেহের কাঠামো বা কঙ্কাল মাত্র রহিয়াছে, এবং দ্বিতীয় চিত্রে কঙ্কালের উপরিভাগে পেশীগুলি বিন্যস্ত রহিয়াছে। ইহারই উপর ত্বকের আবরণ দিলে মানব দেহের সম্পূর্ণ রূপ দেখা যায়।

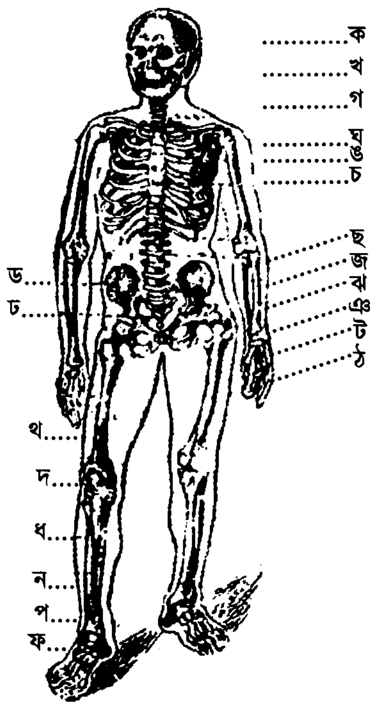

নর-কঙ্কাল

পেশীসমূহ

প্রথম চিত্রের মধ্যে দেহের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা গিয়াছে। (ক) চিহ্নিত অংশ; অবশ্য না বলিলেও বুঝিবে যে, ইহাই মস্তকের করোটি, খর্পর বা খুলি। প্রকৃতপক্ষে করোটি কতকগুলি বিভিন্ন অস্থিখণ্ডের সংযোগে নির্মিত, কিন্তু তাহার সবিশেষ বর্ণনা তোমাদের তেমন মনোরম হইবে না। (খ) চিহ্নিত অংশের কথা জানা প্রয়োজন। এই অংশটি করোটির সঙ্গে যুক্ত হইলেও উহাকে সহজে পৃথক করা

যায়। ইহাই চোয়ালের হাড় বা হম্বস্থি নামে অভিহিত। মস্তকের সহিত দেহ সংযুক্ত হইয়াছে সারভিকাল (গ) নামীয় অস্থি সাহায্যে — স্কন্ধদেশে রহিয়াছে ক্লাভিক্যাল অস্থি-খণ্ড (ঘ) এবং উহারই পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত স্ক্যাপিউলা (ঙ), স্কন্ধাস্থি বা অংসফলক অবস্থিত। ইহারই পুরোভাগে পশ্চাতের মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত, কতকগুলি অস্থি একটি খাঁচার সৃষ্টি করিয়াছে; ইহারাই পঞ্জরাস্থি নামে অভিহিত। ইহাদিগের একদিক যেমন মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি বক্ষস্থলের মধ্যস্থানে বুক্কাস্থি বা স্টারনামের (চ) সহিত সংযুক্ত। পঞ্জরের পার্শ্বে হস্তের অভ্যন্তর ভাগে, উপরে হিউমেরাস (ছ) অবস্থিত, এবং ইহারই সহিত নিম্নভাগের আলনা (জ) এবং রেডিয়াস (ঝ) সংযুক্ত রহিয়াছে এবং উহাদের নীচে কব্জি অস্থি বা কারপাল (carpal) (ঞ) ও মেটাকারপাল (metacarpal) (ট) এবং অঙ্গুলির অস্থিগুলি (ঠ) অবস্থিত। পঞ্জরাস্থির তলদেশে দেহের দক্ষিণ এবং বামপার্শ্বে দুইটি অস্থি (ড) কেবলমাত্র পশ্চাতে মেরুদণ্ডের সহিত যুক্ত হইয়া ভাসমান অবস্থায় রহিয়াছে। নিজের পাঁজরের নীচে শ্বাস-গ্রহণের সময় হস্ত রাখিলেই, এই দুইটি অস্থি খণ্ডের চলাচল অনুভব করিতে পারিবে। পঞ্জরের নিম্নে মেরুদণ্ডের তলদেশে অবস্থিত (ঢ) লাম্বার মেরুর অস্থি নামে অভিহিত এবং ইহা (ণ) চিহ্নিত দাবনা অস্থি পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহারই পশ্চাদ্ভাগে প্রায় মধ্যস্থলে রহিয়াছে ত্রিকাস্থি বা সেকরাম (ত) পাদদেশে জঙ্ঘার মধ্যে রহিয়াছে ফিমার (থ) এবং ইহার নিম্নে হাঁটুর উপর পাটেলা (দ), এবং পরে আঁকড়া (ধ) ও বিম্বস্থি (ন), এবং উপর ও নীচে যথাক্রমে মেটাটারসাল (প) এবং পদাঙ্গুলির অস্থিরাজি (ফ) বিদ্যমান।

মানবদেহের কঙ্কালের পরিচয় দিতে গিয়া বিভিন্ন অস্থিখণ্ডের যে বিচিত্র নাম লিখিত হইল, প্রথম দর্শনে উহা শ্রুতিকটু এবং মনে রাখা একটু কঠিন বলিয়া ঠেকিলেও পূর্ব চিত্রটি সম্মুখে রাখিয়া দুই-একদিন উহার বিভিন্ন অংশ দেখিতে থাকিলে সহজেই ইহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারিবে। তোমরা সকলেই হয়তো চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিতে চাহিবে না। কিন্তু তবুও নিজ দেহের বিবরণ কতকটা জানা দরকার, এবং তাহা ছাড়াও, ইহাদিগের নামের উল্লেখ প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া এখানে ইহাদিগের সামান্য পরিচয় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হইল।

এই সকল বিভিন্ন অস্থি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে দ্বিবিধ উপায়ে। ইহাদিগের একটি সম্পূর্ণ সংযোগ (perfect joint) এবং অপরটি অসম্পূর্ণ সংযোগ (imperfect joint) নামে অভিহিত। পূর্ববর্ণিত মস্তকের অস্থিময় আবরণটি একখণ্ড অস্থি দ্বারা প্রস্তুত নহে। কতকগুলি বিভিন্ন আকারের অস্থি এমনভাবে একত্র সংযুক্ত হইয়া উহা নির্মাণ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে সহজে স্থানচ্যুত করা সম্ভব নহে। আবার মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অস্থিও এমনভাবে সংযুক্ত যে, তাহাদিগকে অধিক মাত্রায় নাড়াচাড়া করিবার উপায় নাই। এইরূপ সংযোগগুলিই অসম্পূর্ণ সংযোগ নামে অভিহিত। কিন্তু স্কন্ধদেশের স্ক্যাপিউলার সহিত বাহুর উপরিভাগের হিউমেরাস, অথবা হিপবোন বা দাবনার সহিত ফিমারের যেরূপ সংযোগ তাহাতে হস্তপদ উভয়ই যথা ইচ্ছা আমরা নড়াইতে পারি; এই জন্যই এই সকল সংযোগ সম্পূর্ণ সংযোগ নামে পরিচিত। শরীরের অন্যান্য অংশ যেরূপ অতি ক্ষুদ্র সেলের সমষ্টিমাত্র, অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ক্ষুদ্র একখণ্ড অস্থির পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অস্থি-সেলগুলির মধ্যভাগ চুন বা ক্যালসিয়ামের

ফসফেট এবং কার্বনেটের ন্যায় কঠিন পদার্থ দ্বারা পূর্ণ, কিন্তু পেশীগুলি নরম মাংসল সেল দ্বারা নির্মিত। শিশু অবস্থায় এই সকল অস্থিমধ্যে তখনও যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম জমিতে পারে না বলিয়া অস্থিগুলি তখন অপেক্ষাকৃত নরম ও নমনীয় থাকে, ইহাই তরুণাস্থি (cartilage) নামে পরিচিত। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত কঠিন পদার্থ অধিকতর পরিমাণে জমিতে থাকায় তরুণাস্থিগুলি কঠিন হইয়া যায়। অস্থিগুলির মধ্যে অসম্পূর্ণ সংযোগ যেখানেই হইয়াছে, সেখানেই ইহারা পরস্পরের সহিত এমন কাপে কাপে যুক্ত হয় যে, উহাদিগকে কোনওরূপেও নাড়ান যায় না। কিন্তু সম্পূর্ণ সংযোগের বেলায় বিভিন্ন অস্থি টেনডন-এর পেশী দ্বারা যুক্ত হয়। শরীরের যে সকল অস্থিময় অংশ আমরা ইচ্ছামতো নড়াচড়া করিতে পারি, তথায় এই টেনডেন সাহায্যেই অস্থি সংযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ পেশীর মধ্যে বিশেষভাবে দুই-একটির উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে।

নিম্নের চিত্রে বাহুর চলাচল দেখান হইয়াছে। বাহু যখন সরলভাবে লম্বমান থাকে, তখন মাংসল ঐ পেশীটি সরল দীর্ঘ অবস্থায় থাকে; কিন্তু হস্তের পুরোভাগ উঠাইলে ঐ পেশীটি তাহার স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আকার গ্রহণ করে এবং তখন ইহাকে অধিকতর পুষ্ট বলিয়া মনে হয়। এইটাই বাইসেপ্‌স পেশী নামে পরিচিত এবং ব্যায়াম দ্বারা ইহাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করা সম্ভবপর। এইরূপ হস্তের অন্য অংশে, পাদদেশে, উদরে এবং আরও অন্যান্য অংশের ভিন্ন ভিন্ন পেশী শরীর পরিচালন দ্বারা যথেষ্ট পুষ্ট হয় এবং তখন দেহের প্রতি চাহিতেই আনন্দ হয়।

ইচ্ছাধীন (voluntary) ও স্বেচ্ছাপেশী (involuntary muscles)

বাইসেপ্‌স প্রভৃতি পেশীগুলি আমরা ইচ্ছামতো পরিচালনা করিতে পারি। ইচ্ছাধীন ও স্বেচ্ছাপেশী তোমরা ব্যায়াম-বীরদিগের পেশী পরিচালনায় হয়তো দেখিয়াছ। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এইসকল মাংসপেশীর পরিচালনা আমাদের ইচ্ছাধীন; এই জন্যই ইহারা ইচ্ছাধীন মাংসপেশী নামে পরিচিত। কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও একপ্রকার পেশী দেহমধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে; যাহাদিগের চলাচল সম্বন্ধে আমরা সর্বদা সজাগ নহি। কারণ, সেই সকল পেশী আমাদিগের ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়াই নিজ কার্য করিয়া চলিয়াছে। এইরূপ পেশী দ্বারাই হৃদ্‌যন্ত্র নির্মিত। হৃদয় তাহার কাজ নিরন্তর করিয়া চলে, সে কখনও আমাদিগের ইচ্ছার অধীনতা স্বীকার করে না। মনে হয়, তাহার এই গতি, যেন কোনও অদৃশ্য কর্তার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহারই ইচ্ছায় একদিন ইহার চলাচল আরম্ভ হইয়াছিল এবং আর একদিন তাহারই

ইচ্ছাক্রমে ইহা স্থির হইয়া যাইবে। এই জাতীয় পেশী স্বতঃক্রিয় বা স্বেচ্ছাপেশী নামে পরিচিত।

স্নায়ু (nerves) ও রক্তবাহী শিরা (blood vessels)

মানবের সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া রক্তবাহী শিরা-উপশিরা ব্যতীত আরও একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় স্নায়ুতন্তু ছড়াইয়া রহিয়াছে। এবং ইহারাই পরস্পর যুক্ত হইয়া অবশেষে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। দেহের মধ্যে ইহারা বিদ্যুৎবাহী তারের ন্যায় কার্য করিয়া থাকে। মস্তিষ্কই মানবদেহের ইচ্ছাকেন্দ্র। এই ইচ্ছাকেন্দ্র হইতে যাবতীয় আদেশ ঐ তন্তুগুলির দ্বারা শরীরের বিভিন্ন স্থানে বাহিত হয়, ইহারাই স্নায়ুমণ্ডলী নামে পরিচিত। স্নায়ু ব্যতীত আরও এক প্রকার রক্তবাহী সূক্ষ্ম নল সমস্ত দেহে ছড়াইয়া রহিয়াছে; ইহাদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইহাদেরই এক শ্রেণী হৃদ্‌পিণ্ড হইতে রক্ত বহন করিয়া দেহের বিভিন্ন অংশে লইয়া গিয়া থাকে এবং অন্য শ্রেণী দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে রক্ত লইয়া হৃদ্‌পিণ্ডে আনিয়া উপস্থিত করে। ইহাদিগের আলোচনা পরে করিব। ইহাদিগের সহিত দেহের আর একটি যন্ত্র — ফস্‌ফুস্‌ বিশেষভাবে জড়িত। নাসিকার মধ্যে দিয়া যে বায়ু আমরা প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, তাহা রক্তের সহিত মিলিত হইয়া তথায় রক্ত পরিষ্কার করিয়া দেহের কিঞ্চিৎ মলিনতা নিঃসৃত করিয়া আনে। সেকথাও পরে একটু বিশদভাবে আলোচনা করিব। এই নল-বাহিত রক্ত-কণা, ইহারা প্রস্তুত হইতেছে আমাদিগের খাদ্য হইতে। খাদ্য-বস্তু মুখের মধ্য দিয়া উদরে প্রবিষ্ট হয়, এবং ইহার একাংশ রক্তে পরিণত হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে। এবং অন্য অংশ দেহ হইতে ঘর্ম, মল, মূত্রাদি রূপে নির্গত হইয়া যায়। এই খাদ্য-বস্তুর ক্রমপরিবর্তনের কথাই প্রথমে বলিব।

খাদ্য এবং উহার ক্রমপরিবর্তন

ক্ষুধা (hunger)

পরিশ্রমের ফলে ক্লান্তি আসে, দেহের অংশবিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহারই পূরণের জন্য দেহ নূতন বস্তু বাহির হইতে গ্রহণ করিতে চাহে; এই ব্যাপারই ক্ষুধা নামে অভিহিত। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আমরা আহার করি। যে সকল খাদ্য-বস্তু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহার বিশিষ্ট পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং এই পরিবর্তনের ফলে যে নূতন রস প্রস্তুত হইতেছে, তাহাই রক্তস্রোতে মিশ্রিত হইয়া দেহ গঠনের সহায়তা করে; খাদ্যের এইরূপ পরিবর্তন পাচন-প্রথা নামে অভিহিত; এইবার সেই সম্বন্ধেই একটু আলোচনা করিতে চাই। কিন্তু এই আলোচনার পূর্বে খাদ্য-বস্তু হিসাবে আমরা কোন কোন পদার্থ গ্রহণ করি, তাহার একটু পরিচয় প্রথমেই দিব।

খাদ্যের উপকরণ (constituents of diet)

আমরা বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত; কিন্তু ইহার সহিত আরও কতকগুলি পদার্থ আমরা আহার করিয়া থাকি; যথা — মৎস্য, মাংস, তরকারী, তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি। পাকিস্তানের লোকেরা ভাতের তেমন ভক্ত নহে; তাহারা রুটি, চাপাতি প্রভৃতি অধিকতর পছন্দ করে। আরও পশ্চিমে দেখা যায় পাঁউরুটির প্রচলনই অধিক। তবে সে সকল দেশে এই রুটির সহিত মাংস, ঘৃত অথবা অনুরূপ স্নেহ-পদার্থ সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সকল বিভিন্ন খাদ্য-বস্তু, রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে তিনটি বিশেষভাবে বিভক্ত হইয়াছে, যথা — আমিষ বা প্রোটিন, শ্বেতসার বা স্টার্চ এবং স্নেহ-পদার্থ বা তৈল ও চর্বি।

ভাতে আমিষের পরিমাণ অল্প, শ্বেতসারই অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বর্তমান, রুটির মধ্যে শ্বেতসারের সহিত অল্পমাত্রায় আমিষ পদার্থ রহিয়াছে কিন্তু ভাতের তুলনায় তাহা অধিক; এইজন্যই ভাত অপেক্ষা রুটি দেহের পক্ষে অধিকতর উপাদেয়। ঘৃত, তৈল প্রভৃতি শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল পদার্থ ব্যতীত অতি অল্প পরিমাণে লবণ এবং ঐ জাতীয় অন্য পদার্থও দেহের জন্য প্রয়োজন। ঠাণ্ডা শ্বেতসার পানিতে গুলিবে না, তবে ফুটন্ত পানিতে ইহাকে দ্রবীভূত করা যায়। তোমরা অসুখের সময় বার্লি কখনও কখনও খাইয়া থাকিবে; বার্লিই শ্বেতসারের সুন্দর উদাহরণ। দেহ কিন্তু বার্লির এই জলীয় দ্রবণ রক্তস্রোতে মিশাইতে পারে না। এই শ্বেতসার দেহমধ্যে চিনি জাতীয় পদার্থে পরিবর্তিত হয়, এবং তখনই ইহা দেহের কার্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে।

আমাদের খাদ্যের উপকরণগুলি অধিকতর ক্ষেত্রে রন্ধনের পর সহজে শরীর গ্রহণ করিতে পারে। কাঁচা অবস্থায় উহারা সুপাচ্য বা মুখরোচক হয় না। রন্ধনকালে উহাদের দানাগুলি নরম হইলে তবেই তখন তাহা সহজে পাচিত হইতে পারে।

ভাত খাইবার সময় চিবাইবার কষ্ট অনেকেই স্বীকার করেন না, কিন্তু উহা ভালরূপে চিবাইয়া খাওয়া প্রয়োজন; রুটি কিন্তু না চিবাইলে চলে না। ছোট একটি পাঁউরুটির টুক্‌রা মুখে দিয়া একটু বেশী সময় ধরিয়া চিবাইলে দেখিবে, উহা হইতে চিনির আস্বাদ পাওয়া যাইতেছে। সত্যই উহার মধ্যস্থিত শ্বেতসার মুখ-নিঃসৃত লালার সাহায্যে রূপান্তরিত হইয়া চিনিতে পরিণত হয়। আমিষ পদার্থও এইরূপে আকার পরিবর্তন করে। সে সকল কথা পরে বলিতেছি।

খাদ্যের পরিমাণ দেহের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যাহারা অধিকতর পরিশ্রমে অভ্যস্ত, তাহাদের খাদ্যের পরিমাণও অধিক। শিশুকালে দেহের সংগঠন কার্য চলিতে থাকে। সে সময় পুষ্টিকর খাদ্য অতিশয় প্রয়োজন। কিন্তু শিশুদিগের হজম করিবার ক্ষমতা তীক্ষ্ণ নহে বলিয়া সহজ-পাচ্য খাদ্য তাহাদিগকে দিতে হয়। যৌবনে দেহ অধিকতর পরিশ্রম করিতে থাকে। এই সময় সেই জন্য অধিক পরিমাণে খাদ্যও প্রয়োজন হয়। যাহারা কায়িম পরিশ্রম অধিক করে, তাহারা যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিবে, বসিয়া যাহারা অফিসের কাজে অভ্যস্ত, তাহারা সেই পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবে না। বয়োবৃদ্ধির সহিত কার্য করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। এই জন্য বৃদ্ধ ব্যক্তিরা অতি সামান্য পরিমাণে আহার গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রয়োজনের অধিক খাদ্য গ্রহণ করিলে অসুখ অবশ্যম্ভাবী।

ভিটামিন (vitamin)

পূর্ববর্ণিত আহার্যগুলির সূক্ষ্মতর পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, উহাদিগের মধ্যে পূর্বোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ ছাড়াও আরও কতকগুলি উপকরণ বিদ্যমান। ইহাদিগের ব্যবহার অতিশয় অল্প পরিমাণেই যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে। ইহারাই খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন নামে অভিহিত। খাদ্যে ইহাদের অভাব ঘটিলে শরীরে ব্যাধির সঞ্চার হয়। এই খাদ্যবস্তু এমনভাবে নির্বাচন করা প্রয়োজন, যাহাতে এই ভিটামিন অন্ততঃ অল্প পরিমাণেও দেহ গ্রহণ করিতে পারে — পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভিটামিন কতকগুলি বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্ত। ইহারাও রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ, আজিও সকলগুলির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় নাই। হয়তো একদিন তাহাদের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে সকল রাসায়নিকের আলোচনার বিষয়। আমি এখানে তোমাদিগকে ইহাদিগের গুণের পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইব। মনে রাখা দরকার যে, রন্ধন করা খাদ্যে ইহাদের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়, এইজন্য কোনও কোনও সব্জি ও ফল আমরা রন্ধন না করিয়াই খাইয়া থাকি।

ভিটামিনগুলির বিভিন্ন নাম এখনও স্থির হয় নাই। তাহাদিগকে এ,বি,সি,ডি এবং ঈ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

ভিটামিন 'এ' তৈল জাতীয় পদার্থে পাওয়া যায়। কড্‌ নামীয় একটি সামুদ্রিক মৎস্যের যকৃৎ নিঃসৃত তৈল ইহার জন্য প্রসিদ্ধ। তবে বর্তমানে হ্যালিবাট নামীয় আর একটি সামুদ্রিক মৎস্যের যকৃৎ-তৈলে ইহা আরও অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশের ইলিশ মাছের তৈলে, টাট্‌কা দুগ্ধে, মাখন, ঘৃত প্রভৃতির মধ্যেও এই পদার্থটি পাওয়া যায়। দেহে ইহার অভাব ঘটিলে শরীরের স্বাভাবিক সংগঠন প্রতিহত হয়। এই জন্য বিশেষতঃ শৈশব অবস্থায় ইহার প্রয়োজন অধিক। যদি প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্য দিয়া ইহা গ্রহণ করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে কড্‌লিভার তৈল অথবা হ্যালিভেরোল প্রভৃতির শরণ লইতে হয়।

ভিটামিন 'বি'-এর অভাবে শরীরে রক্তাল্পতা, স্নায়ুর দুর্বলতা এবং অন্ত্রের গোলমাল উপস্থিত হইয়া থাকে। বেরি-বেরি নামক মারাত্মক রোগ ইহারই অভাবে আবির্ভূত হয়। সুতরাং দেহের সুস্থতার জন্য এই ভিটামিনটিও কম প্রয়োজনীয় নহে। খাদ্য-বস্তুর মধ্যে ডিম, পশুর যকৃৎ, মৎস্যের ডিম, গমের আটা, ঢেঁকি ছাঁটা চাউল, মটরশুঁটি, সীম প্রভৃতির মধ্যে ইহা পাওয়া যায়। কলে ছাঁটা চাউলের উপর হইতে অতি পাতলা আবরণটি সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হয় বলিয়া, এই ভিটামিনও তখন আর পাওয়া যায় না। এইজন্য কলে ছাঁটা চাউল না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। টাট্‌কা দুগ্ধেও অল্প পরিমাণে এই দ্রব্যটি রহিয়াছে। শিশুর জন্য কিছু দিন পর্যন্ত দুগ্ধই যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'বি' সরবরাহ করিয়া থাকে। পানিতে ইহা গুলিয়া যায়, সব্জি তরকারী পানিতে ফুটাইবার সময় প্রধানতঃ ইহা পানির মধ্যে আগমন করে, এবং পরে অধিকতর উত্তাপের ফলে নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই ভাজা তরকারীর মধ্যে দ্রব্যটি মোটেই পাওয়া যায় না। ভিটামিন 'বি' এখন কয়েকটি বিভিন্ন আকারে পাওয়া গিয়াছে।

ভিটামিন 'সি', 'বি'-র ন্যায় সহজেই উত্তাপের ফলে বিনষ্ট হইয়া যায়। বায়ু সংযোগেও ইহা নষ্ট হয়। এইজন্য টাট্‌কা ফলমূল হইতে ইহাকে সংগ্রহ করিতে হয়। কাগজী লেবু, কমলা, পাকা আম, টমাটো প্রভৃতি নানাবিধ ফল, লেটুসের ন্যায় শাক ইত্যাদি হইতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। ইহার অভাবে দেহে স্কার্ভি নামক যন্ত্রণাদায়ক চর্মরোগের আবির্ভাব ঘটে।

ভিটামিন 'ডি', ভিটামিন 'এ'-এর গুণ-সম্বলিত। ইহার অভাবে দেহের অস্থিগুলি নিয়মিতভাবে পরিপুষ্ট হয় না। শিশুর খাদ্যে ইহার অভাব ঘটিলে দেহে রিকেট রোগের সূচনা হয়। দুগ্ধ হইতে ইহা পাওয়া যায়। তবে প্রধানতঃ সূর্যালোক সাহায্য দেহের মধ্যে ইহার সংগঠন ঘটিতে পারে। বাংলাদেশের মেয়েরা শিশুদিগকে যে রৌদ্রস্নান করাইয়া থাকেন, তাহারই কল্যাণে এদেশে রিকেট দেখা যায় না। ইংলন্ডের ন্যায় প্রায়-আলোকহীন দেশে শিশুরা এই রোগে বহুল পরিমাণে আক্রান্ত হয়। আরগেস্‌টেরোল নামীয় একটি দানাদার পদার্থ সূর্য রশ্মি, অথবা আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে পরিবর্তিত হইয়া ভিটামিন 'ডি'-তে পরিণত হয়। কড্‌লিভার তৈল, হ্যালিভেরোল প্রভৃতি পদার্থ হইতে ইহা অধুনা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভিটামিনগুলির এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ইহাদিগের একটি অন্যটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে না। দেহ সুস্থ রাখিতে হইলে এই বিভিন্ন ভিটামিনের প্রত্যেকটিই অল্প পরিমাণে প্রয়োজন। পূর্বে বলিয়াছি যে, উত্তাপ সহযোগে ইহাদিগের কোনও কোনওটি বিনষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য রন্ধন-কার্য যথেষ্ট সাবধানতা

সহকারে করা দরকার। আমাদের দেশীয় প্রথায় রন্ধনকালে অধিক সংখ্যক তরকারি আমরা ভাজিয়া খাই, ইহাতে কিন্তু ভিটামিনসমূহ প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। রন্ধন না করিলে শ্বেতসার বা আমিষ জাতীয় পদার্থ সহজে দেহগঠন কার্যে লাগে না, অথচ রন্ধন কার্য সাবধানে না করিলে ভিটামিনের মতো প্রয়োজনীয় দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়।

খাদ্যের পরিবর্তন

পূর্বোক্ত খাদ্য-বস্তু আমরা মুখে ফেলিয়া দন্ত সাহায্যে চর্বণ করি, এবং পরে গলাধঃকরণ করিয়া থাকি। চর্বণ কালে খাদ্য-বস্তু মুখ-নিঃসৃত লালার সহিত মিশ্রিত হয়, ফলে তখনই রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়। জিহ্বার নিম্নভাগে কতকগুলি গ্রন্থি রহিয়াছে; উহারাই এই লালা নিস্রাব কার্যে সহায়তা করে। এই লালার মধ্যে একরূপ অতিক্ষুদ্র জীবাণু বিদ্যমান, যাহারা শ্বেতসারকে ভাঙ্গিয়া শর্করায় পরিণত করিতে পারে। ভালরূপে চর্বণ করিয়া কোনও পদার্থ খাইলে উহার পরিবর্তন-কার্য মুখের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া যায়। নরম পদার্থ সহজে চিবাইতে পারা যায়, যে কোনও শক্ত খাদ্যদ্রব্য অতি উত্তমরূপে চর্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করা উচিত।

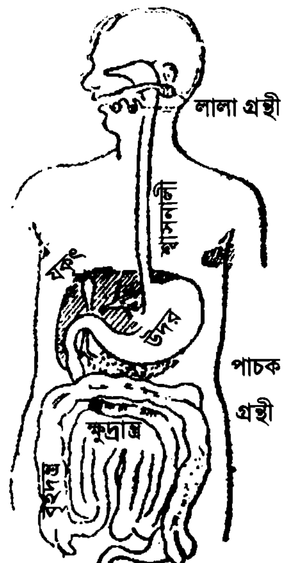

খাদ্যবাহী চক্র

এইবার পরবর্তী পরিবর্তনের কথা ভালরূপে বুঝিতে হইলে পরিপাক চক্রের বিভিন্ন যন্ত্রের কতকটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। পার্শ্বের চিত্রে এই যন্ত্রগুলি দেখান হইয়াছে।

মুখ-গহ্বর হইতে চর্বিত পদার্থমাত্রই জিহ্বার সাহায্যে ফ্যারিংস বা গল-নালীর মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। ফ্যারিংস বা গল-নালী মুখগহ্বরের পশ্চাতে ও অন্ননালী বা ইসোফেগাসের উপরে অবস্থিত পেশীময় একটি থলে বিশেষ। ইহারই নিকট ফুসফুসের মধ্যে বায়ু গমনাগমনের জন্য আর একটি পথ রহিয়াছে, উহার পরিচয় পরে দিব। এই বায়ু-নালীর উপরিভাগে এপিগ্লটিস নামে একটি পর্দা বিদ্যমান। তাহারই সাহায্যে খাদ্য-বস্তুর গমন-পথ নির্দিষ্ট হইয়া বায়ুনালীর পরিবর্তে অন্ননালীর মধ্যে প্রেরিত হয়। কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ যদি কোনও একটি খাদ্যকণা বায়ুনালীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখনই ঐ কণাটিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া দিবার যে চেষ্টা স্বাভাবিক উপায়ে আরম্ভ হয়, তাহার ফলই বিষম-লাগা বলিয়া পরিচিত।

খাদ্য-বস্তু অন্ননালীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই উহার উপরিভাগ সঙ্কুচিত হইয়া প্রসারিত নিম্নভাগ খাদ্য-বস্তুকে প্রেরণ করিয়া থাকে, পরে এই নিম্নভাগ সঙ্কুচিত হওয়ায় আরও নিম্নে প্রসারণ ঘটিয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত খাদ্যনালী ব্যাপিয়া যে সঙ্কোচন এবং প্রসারণ-ক্রিয়ার ফলে খাদ্যবস্তু ক্রমে পাকস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই পেরিস্‌টলসিস্ (peristalsis) বা কৃমিগতি নামে পরিচিত। পাকস্থলী হইতে অন্ত্রমধ্যে পরিচালিত হইবার সময়ও খাদ্যবস্তু এইরূপ কৃমিগতির সাহায্যেই অগ্রসর হইয়া থাকে।

পাকস্থলীর চিত্র হইতে বুঝিতে পারিবে উহার একাংশ অপেক্ষাকৃত স্ফীত। এই অংশ হৃদ্‌যন্ত্রের নিকট অবস্থিত বলিয়া ইহাকে পাকস্থলীর কার্ডিয়াক সীমা (cardiac end) বলা হইয়া থাকে এবং অন্ত্রের নিকটবর্তী অংশ পাইলরিক সীমা (pyloric end) নামে পরিচিত। এই দুই প্রান্তের দুইটি পেশীময় পর্দার সাহায্যে উহার মধ্যে খাদ্যের আগমন এবং বহির্গমন যথাক্রমে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে পাকস্থলীর শেষ প্রান্তবর্তী পেশীময় পর্দাটি স্ফিংটার বা পাইলোরাস (pylorus) বলিয়া পরিচিত। সমস্ত পাকস্থলীর অন্তরভাগ ব্যাপিয়া একটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucous membrane) বর্তমান। এই ঝিল্লির নিম্নে রক্তবাহী নল, এবং অতিশয় ক্ষুদ্র অনেকগুলি গ্রন্থিও রহিয়াছে। এই গ্রন্থি হইতে একরূপ রস নিঃসৃত হইয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই রসের সাহায্যে অধিকাংশ জলীয় পদার্থ, উহার মধ্যে সামান্য পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অম্ল এবং পেপসিন নামক জীবাণু বর্তমান। ইহার মধ্যে অম্লের পরিমাণ শতকরা ৪ অংশ মাত্র, কিন্তু তাহারই ফলে মুখ-নিঃসৃত লালায় বিদ্যমান টায়ালিনের ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়; অর্থাৎ পাকস্থলীতে শ্বেতসারের কোনও পরিবর্তন ঘটে না, পরন্তু আমিষ পদার্থ এই পাচক রসের (gastric juice) সহিত মিশ্রিত হইয়া ভাঙ্গিয়া পানিতে দ্রবণীয় পেপটোন পদার্থে পরিণত হয়।

পাকস্থলীর মধ্যে যে সঙ্কোচন-ক্রিয়া চলিতে থাকে, তাহার ফলে মথন বা আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তাহাতে খাদ্য-বস্তুর সহিত পাচক রসের সংমিশ্রণ সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়, এবং এখানেই পাচন-কার্য যথেষ্ট অগ্রসর হইয়া, পরে এই মিশ্রিত পদার্থকে ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে, পূর্ববর্ণিত পর্দা বা স্ফিংটারের সাহায্যে প্রেরণ করে। পাকস্থলী কৃমিগতির ফলে, যতই শূন্য হইতে থাকে, আমরা ততই ক্ষুধার অনুভূতি লাভ করি। কেহ কেহ বলেন, রক্ত ধারায় খাদ্য হইতে প্রাপ্ত গ্লুকোজ চিনির পরিমাণ কমিতে থাকিলে, তখন ক্ষুধার অনুভূতি আইসে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরিভাগ ডিউডিনম্ নামে অভিহিত। এই অংশ যকৃৎ এবং পাকস্থলীর নিম্নে পাচন গ্রন্থির (pancreas) সহিত নল দ্বারা সংযুক্ত। খাদ্যবস্তু ক্ষুদ্র অন্ত্রে আগমন করিবামাত্রই, যকৃতের সহিত সংযুক্ত পিত্ত কোষ (gall bladder) হইতে পিত্ত (bile) আসিয়া ঐ অর্ধ বা আংশিকভাবে জীর্ণ খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রণের ফলে, পাকাশয়ের অম্ল পদার্থগুলি, ক্রমে ক্ষার গুণ প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় টায়ালিনের কার্য আরম্ভ হইয়া যায়। ইহার পর কেবল শ্বেতসার নহে, স্নেহ পদার্থও ভাঙ্গিয়া থাকে, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।

এই ক্ষুদ্র অন্ত্র প্রায় ত্রিশ ফিট ব্যাপিয়া প্রসারিত। এই সুদীর্ঘ নলটি সোজাভাবে প্রসারিত হইতে অনেক জায়গার প্রয়োজন ঘটিবে। এইজন্যেই ইহাকে গুটাইয়া, পর্দার সাহায্যে ধরিয়া রাখা হইয়াছে। এই পর্দাই মেসেন্ট্রি নামে পরিচিত। এই অন্ত্রের মধ্য দিয়া খাদ্যবস্তু যতই অগ্রসর হয়, ততই জীর্ণ হইতে থাকে এবং সেই অন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য ভিলাই এবং ল্যাকটিয়াল নামক উদ্যত অংশগুলির সাহায্যে জীর্ণ খাদ্য, দেহের মধ্যে শোষিত হইয়া যায় এবং ক্রমে রক্তস্রোতে মিশ্রিত হইয়া দেহের শক্তি বর্ধন করে এবং বিভিন্ন অংশের পেশীও গঠন করিতে থাকে। খাদ্যের যে অংশ জীর্ণ হইতে পারে না, তাহাই ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে নিঃসৃত হইয়া বৃহদন্ত্রে জমে এবং তথা হইতে মলরূপে নির্গত হইয়া যায়।

দেহের উত্তাপ সংরক্ষণ (maintenance of body heat)

খাদ্য-বস্তু দেহের মধ্যে পরিবর্তিত হইবার সময় যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপই শরীরের তাপ রক্ষা করিতে সাহায্য করে। তোমরা হয়তো অনেকেই জান যে, শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ, তাপ-মাপ যন্ত্রে ৯৮·৪ ডিগ্রি (ফারেনহাইট) বলিয়া প্রতিপন্ন হাইয়াছে এবং বরাবর এই উত্তাপ দেহ মধ্যে বিদ্যমান থাকে। আমরা জানি যে, উত্তপ্ত দ্রব্য রাখিয়া দিলেই তাপ হারাইয়া শীতল হয়, কিন্তু দেহের উত্তাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও এই নব উদ্ভূত উত্তাপ দ্বারাই সে ক্ষতি পূর্ণ হইয়া যায়। আরও অন্য উপায়েও উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেমন ফুস্‌ফুসের সাহায্যে অম্লজান সহযোগে অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময় ঘটে। এই সকল উপায়েই দেহের উষ্ণতা রক্ষা হয়।

খাদ্যের সাহায্যেই দেহের ক্রমবর্ধন ঘটে, খাদ্যের অভাব ঘটিলে দেহ পুষ্টি পায় না, মানুষ শক্তি হারাইতে থাকে এবং ক্রমশঃ শরীর ক্ষীণ হইয়া যায়। মন্বন্তর খাদ্যের অভাবেই ঘটে, তাহার ফলাফল সকলেরই জানা আছে।

শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া

নিঃশ্বাস বায়ুর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the exhaled air)

দেহের জন্য আহার্যের প্রয়োজন সন্দেহ নাই; কিন্তু বায়ু আহার্য অপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজনীয় পদার্থ। বায়ুর অভাবে অতি অল্পকাল মধ্যে মানবের মৃত্যু ঘটে। এই বায়ু শরীরের কি প্রয়োজন পূর্ণ করে, কিরূপেই বা আমরা ইহাকে ব্যবহার করি, সে কথাটি জানাও দরকার। তোমরা রসায়ন শিক্ষার ফলে জানিতে পারিয়াছ যে, বায়ু কতকগুলি বাষ্পীয় পদার্থের সংমিশ্রণে প্রস্তুত। আমরা দেহের জন্য বায়ু মধ্য হইতে, কেবলমাত্র অম্লজান বাষ্পই গ্রহণ করিয়া থাকি। নিঃশ্বাসের সহিত যে বায়ু দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়, তাহার সহিত প্রশ্বাস বায়ুর অল্প পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, পরীক্ষায় ইহা আমরা প্রমাণ করিতে পারি।

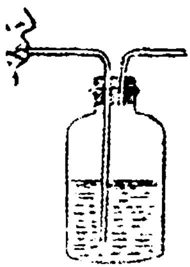

নিঃশ্বাস বায়ুর পরীক্ষা

নিঃশ্বাস বায়ু শীতল কাচের উপর পতিত হইলে, দেখিতে পাইবে কাচের উপরে একটি পাতলা জলীয় স্তর জমিয়া যায়। যে বায়ু আমরা নিরন্তর প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, তাহাতে কিন্তু এইরূপ জলীয় স্তর কাচের উপর না জমিলেও বরফপূর্ণ গ্লাসের গায়ে কিয়ৎ পরিমাণে এইরূপ পানি জমিয়া থাকে; সুতরাং বলিতে হয় যে, নিঃশ্বাস বায়ু প্রশ্বাস বায়ু অপেক্ষা অধিকতর জলসিক্ত।

উপরে প্রদর্শিত মতো একটি যন্ত্র লইয়া উহার ক্ষুদ্রতর নলটি নাসিকার সহিত যুক্ত কর। পাত্র-মধ্যে-অল্প পরিমাণ চুনের পানি রাখা হইয়াছে। ঐ নলের মধ্য দিয়া প্রশ্বাস টানিলে, বাহিরের বাতাস অন্য নলের সাহায্যে চুনের পানির মধ্য দিয়া আসিয়া নাসিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। এই সময় নিঃশ্বাস বায়ু বাহিরে ছাড়িতে থাক, অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রশ্বাসের সময় ঐ নলটি তোমার নাসিকার সহিত যুক্ত করিবে। দুই-তিন মিনিট এইরূপে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলেও, ঐ পানির মধ্যে বিশেষ কোনও পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না। এইবার প্রশ্বাস লইয়া, নিঃশ্বাস বায়ু চিত্রে প্রদর্শিত মতো মুখের সাহায্যে দীর্ঘতর দ্বিতীয় নলের মধ্য দিয়া পরিচালিত কর। দেখিবে দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই ঐ নির্মল চুনের পানি ঘোলাটে হইয়া যাইবে। ইহার কারণ এই যে, নিঃশ্বাসের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ (carbon di-oxide) আমরা ত্যাগ করিয়া থাকি। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছ যে, দেহের মধ্য হইতে নিঃশ্বাসের সহিত আমরা জলীয় বাষ্প এবং অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ ত্যাগ করি। প্রশ্বাস বায়ুর এই পরিবর্তন কিরূপে সাধিত হইতেছে, সেই কথা এইবার বুঝাইয়া বলিব।

শ্বাসনালী (Trachea)

আমরা সাধারণতঃ নাসিকার সাহায্যেই প্রশ্বাস গ্রহণ করি। কিন্তু সর্দির প্রভাবে নাসিকা বন্ধ হইলে সময় সময় আমরা মুখ দিয়াও প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। সুতরাং এই দুইটি পথই শ্বাসনালীর সহিত সংযুক্ত বলিতে হইবে। পূর্বে বলিয়াছি যে, মুখগহ্বর দিয়া খাদ্য পাকস্থলীতে গমন করিবার সময় কখনও কখনও বিষম লাগিয়া থাকে, ঐ ব্যাপার ঘটিবার একমাত্র কারণ এই যে, অসাবধানতা প্রযুক্ত কখনও যদি শ্বাস-নালীর মধ্যে কোনও খাদ্য-বস্তু গমন করে তাহাকে বাহির করিবার জন্য যে চেষ্টা তথায় হইয়া থাকে, তাহারই ফলে বিষম লাগে। অন্ননালী গলার পশ্চাৎ ভাগে রহিয়াছে। ইহার পুরোভাগে যে কণ্ঠনালী দেখিতে পাও, উহাই শ্বাসনালীর উপরিভাগ। এই স্থানে স্বরযন্ত্র (larynx) অবস্থিত; উহা হইতে স্বর নির্গত হইয়া থাকে। এই শ্বাসনালীর উপরিভাগে গ্লটিস নামে ছিদ্র বিদ্যমান। এই ছিদ্রটির উপর এপিগ্লটিস নামক তরুণাস্থি, উহাকে সব সময় বাহিরের পদার্থের প্রবেশ-সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিতেছে। নাসিকার পথে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া গ্লটিসের মধ্য দিয়া শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে। ঐ শ্বাসনালী অল্প দূর গিয়াই দুইটি ব্রঙ্কিআই-এ বিভক্ত হইয়াছে; ইহার পরে উহা ক্ষুদ্রতর শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পরিশেষে ফুস্‌ফুসে পরিণত হইয়াছে। এপিগ্লটিস এবং শ্বাসনালীর প্রায় সমস্ত অংশই তরুণাস্থি (cartilage) দ্বারা সংগঠিত। কিন্তু ব্রঙ্কিআই-এ এই অস্থি, অধিকতর নরম হইয়া ফুস্‌ফুসে আসিয়া, একেবারে পেশীতে পরিণত হইয়াছে।

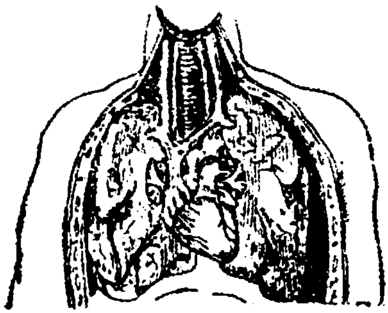

শ্বাস যন্ত্র

ফুস্‌ফুস্‌ (lungs)

ফুস্‌ফুসের আকৃতি অনেকটা আঙ্গুরের গুচ্ছের ন্যায়। পেশীময় কোষগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে। কখনও সুবিধা ঘটিলে কোনও জন্তুর ফুস্‌ফুস্‌ লইয়া পরীক্ষা করিলেই ব্যাপারটি ভালরূপে বুঝিতে পারিবে। এইগুলি বায়ুকোষ নামে পরিচিত। ফুস্‌ফুসের মধ্যে অসংখ্য বায়ুকোষ বিদ্যমান। প্রশ্বাস গ্রহণ করিলেই বায়ু দ্বারা ইহা স্ফীত হইয়া উঠে এবং নিঃশ্বাস পরিত্যাগকালে পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। রবারের বেলুনের ন্যায়, ইহারা স্থিতিস্থাপক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ মাত্র।

এই কোষের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য রক্তবাহী নল বর্তমান। আমরা যখন প্রশ্বাস গ্রহণ করি, তখন দেহের দূষিত বায়ু এই ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষগুলির মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় রক্ত কণিকারা (blood corpuscles) বাতাস হইতে অম্লজান গ্রহণ করে এবং রক্তের দূষিত অংশ অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ (carbon di-oxide) বাষ্প ঐ বাতাসের মধ্যে ত্যাগ করিয়া যায়। এই সময়ও দেহে কিছু তাপের উদ্ভব ঘটে। এই পরিষ্কৃত রক্ত ফুস্‌ফুস্ হইতে ফিরিয়া পুনরায় হৃদ্‌যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত দেহময় ছড়াইয়া পড়ে। বায়ু নাসিকার মধ্য দিয়া গমন করিবার সময় উহার মধ্যস্থিত ঝিল্লিময় আবরণের উপর দিয়া যাইতে থাকে ও এই সময় যথেষ্টরূপে জলীয় বাষ্প সিক্ত হইয়া যায়। পরে এই সিক্তবায়ু নির্গত হইয়া, দেহ হইতে জলীয় বাষ্প কিয়ৎ পরিমাণে অনবরত লইয়া যাইতেছে। ফুস্‌ফুস্ অপলাপ বা pleura নামীয় রস-ঝিল্লি দ্বারা আবৃত। বক্ষঃস্থলের অন্তরভাগে সিরাস্ মেমব্রেন (serous membrane) নামক অন্য একটি রস-ঝিল্লি, প্লুরা এবং পঞ্জর প্রদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত; এই দুইটি ঝিল্লির মধ্যভাগ সর্বদাই রস দ্বারা সিক্ত থাকে এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে ফুস্‌ফুস্‌দ্বয় যেরূপ চলাচল করে তাহাতে ইহাদিগের মধ্যে একটি সংঘর্ষ অনবরত সংঘটিত হয়, কিন্তু এই রসসিক্ত ঝিল্লি বিদ্যমান থাকায় পঞ্জরাস্থির অপেক্ষাকৃত কঠিন তলের সহিত সংঘর্ষে ইহার কোনওরূপ ক্ষতি হয় না।

নির্মল বাতাসের আবশ্যকতা

খাদ্য এবং পানীয় বস্তুর সহিত যেরূপ বিষাক্ত পদার্থ দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা, সেইরূপ বাতাসের সহিত বিষাক্ত বায়ু ফুস্‌ফুস গমন করিলে, পীড়া এবং মৃত্যু উভয়ই ঘটিতে পারে। এই জন্য নির্মল বায়ু সেবন করা প্রয়োজন। অনেক বায়বীয় পদার্থের বিশিষ্ট গন্ধ রহিয়াছে। নাসিকার পশ্চাদ্‌ভাগে গন্ধ অনুভব করিবার জন্য সৃষ্টিকর্তা যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে গন্ধযুক্ত বায়বীয় বিষ-পদার্থ সম্বন্ধে আমরা কতকটা সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারি। কিন্তু দৃষ্টির অন্তরালে কতকগুলি ভীষণ রোগ-জীবাণু নিরন্তর বায়ু-স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, ইহাদিগের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করা যায়? নাসিকার মধ্যে এক রূপ চুল রহিয়াছে। উহার দুই পার্শ্ব সর্বদাই সিক্ত থাকে। এই ব্যবস্থায় রোগ-জীবাণু এবং বায়ুস্থিত ধূলিকণা বহুল পরিমাণে নাসিকার মধ্যেই ধরা পড়িয়া যায়। কিন্তু কখনও কখনও ফুস্‌ফুসের মধ্যেও উহারা গমন করিতে পারে। এইজন্য সেবনীয় বায়ু নির্মল হওয়া বাঞ্ছনীয়; ধূলা, ধূম প্রভৃতি হইতে সর্বদা সাবধান থাকা প্রয়োজন।

রক্তবাহী চক্র

রক্তের প্রবাহ (circulation of blood)

সুদূর অতীতে, প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে, শরীরের মধ্যে রক্ত-স্রোতের প্রবাহ-কথা, পশ্চিমের লোক জানিত না। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে হারভি সর্বপ্রথম এই সত্যের প্রচার করেন যে, দেহমধ্যে রক্ত-স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। তখনও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার ঘটে নাই এবং লোকে এই রক্ত চলাচলের কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হয় নাই। এই প্রত্যক্ষ দর্শনের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াও হারভি এই মহাসত্য প্রচার করিতে দ্বিধা করেন নাই। তিনি বলেন যে, হৃদ্‌যন্ত্র হইতে নির্গত হইয়া রক্ত ফুস্‌ফুসের সাহায্যে পরিষ্কৃত হয়, ও পরে পুনরায় ঐ যন্ত্রের সহায়তায় সমস্ত দেহে প্রবাহিত হইতে থাকে। অল্পকাল পরেই এক ইতালীয় বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে রক্তবাহী অতি সূক্ষ্ম শিরাগুলিকে দেহের ফুস্‌ফুস্‌-মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এইরূপে হারভির আবিষ্কার পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তুমিও ইচ্ছা করিলে সহজেই এই রক্ত-প্রবাহের কথা প্রমাণ করিতে পার। দেহের কোনও অংশ, ধর — যেমন হস্ত বা পায়ের অংশবিশেষ কিছুক্ষণের জন্য টিপিয়া ধরিলে বা বাঁধিয়া রাখিলে ঐরূপে আবদ্ধ হৃদ্‌যন্ত্র হইতে অধিকতর দূরে অবস্থিত অংশে আর রক্ত চলাচল হয় না; ঐ স্থানে ক্রমেই রক্তহীন হইয়া পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে ও শীতল হইতে থাকে। বহুক্ষণ ঐরূপ আবদ্ধ থাকিলে ঐ স্থানের পেশী মরিয়া যায় ও উহা পচিতে আরম্ভ করে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে খুলিয়া দিলেই পুনরায় রক্ত চলাচল আরম্ভ হয় এবং উহা স্বাভাবিক রূপ গ্রহণ করে।

রক্ত-প্রবাহ দেহের সুস্থতার জন্য নিরতিশয় প্রয়োজন। হৃদ্‌যন্ত্র হইতে নির্গত হইয়া তাজা রক্ত দেহের বিভিন্ন স্থানে উহার প্রয়োজনীয় পদার্থ লইয়া যায়। আবার শিরা দিয়া ফিরিবার সময় দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে পরিত্যক্ত আবর্জনা বহন করিয়া নানাভাবে উহাকে দেহ হইতে নিঃসারিত করিয়া দেয়, এবং হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্‌ সাহায্যে পুনরায় তাজা রক্তে পরিণত হয়। ঐরূপেই রক্তধারা দেহের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

হৃদ্‌যন্ত্র (heart)

দেহের কোনও স্থান হঠাৎ কাটিয়া গেলে দেখা যায়, সেই স্থান হইতে রক্ত ক্রমাগত নির্গত হইতে থাকে। ত্বকের নিম্নে একটু গভীরতর ক্ষত হইলে রক্তস্রাব এত বেশী হয় যে, মানুষ রক্ত হারাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রক্তের নির্গমন ঠিক একই বেগে হয় না। পরন্তু, রক্ত-নির্গমন ক্রিয়া সবিরামভাবে ঘটিতে থাকে। অর্থাৎ একবার বেগে নির্গত হইয়া, অল্পকাল বিরামের পর পুনরায়

অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। ইহাতে মনে হয় যে, দেহমধ্যে কেহ কোনও বিশেষ শক্তির সাহায্যে রক্তকে মাঝে মাঝে ঠেলিয়া দিতেছে। এই চাপের ফলেই রক্ত সবিরাম গতিতে (intermittently) নির্গত হয়। কোনও ব্যক্তির রক্ত-নির্গমন এইরূপভাবে ঘটিলে আহত মানুষটিকে বাঁচাইবার প্রধান উপায় হইতেছে, উহার ঐ ক্ষতস্থানে অন্ততঃ অঙ্গুলির চাপ দিয়া এই রক্ত-প্রবাহ বন্ধ করা। যদি কোনও দিন এই ব্যাপার নিজেরা প্রত্যক্ষ কর, তাহা হইলে হাতটি পরিষ্কার করিয়া অঙ্গুলি সাহায্যে ক্ষতস্থানটি চাপিয়া ধরিবে বা বাঁধিয়া ফেলিবে এবং ডাক্তারের সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান ছাড়িবে না।

এই যে রক্ত, দেহাভ্যন্তরের কোনও চাপের ফলে নির্গত হইতেছে, এই চাপটি হৃদ্‌যন্ত্রের দ্বারাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। তোমাদের বক্ষস্থলের বাম পার্শ্বে পঞ্জরের নীচের দিকে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী রাখিলে, বুঝিতে পারিবে উহার নিম্নে কোনও একটি যন্ত্র ক্রমাগত নড়িতেছে। এই যন্ত্রই হৃদয়, ইহা একটি বিশিষ্ট প্রকার পেশীময় যন্ত্র; উহার আকার এবং অন্তর ভাগের অল্প পরিচয় নিম্নের চিত্র হইতে বুঝিতে পারিবে।

হৃদয়ের নিম্নভাগ, অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্ফীত পেশী দ্বারা নির্মিত; কিন্তু উপরিভাগের পেশীগুলি তত মোটা নহে। উহার অন্তরভাগ ফাঁকা এবং সর্বদাই রক্ত দ্বারা পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে উহার মধ্যভাগ চারি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত নিম্নের দুই প্রকোষ্ঠ ভেন্ট্রিকল্ (ventricle) বা নিলয় এবং উপরের প্রকোষ্ঠ দুইটি অরিকল্ (auricle) বা অলিন্দ নামে অভিহিত। ইহাদিগের মধ্যে বাম পার্শ্বের ভেন্ট্রিকল্ রক্তবাহী ধমনীর সহিত সংযুক্ত, এবং বাম অরিকল্ দ্বারা পরিষ্কৃত শিরাপ্রবাহী রক্ত, হৃদয়-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দক্ষিণপার্শ্বের অরিকল্ মধ্যে অপরিষ্কার রক্ত সমস্ত দেহ হইতে আসিয়া জমিয়া থাকে, এবং তথা হইতে দক্ষিণ ভেন্ট্রিকলে উপস্থিত হয়। অরিকল্ এবং ভেন্ট্রিকল্ পরস্পরের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত যে, উপর হইতে রক্ত অনায়াসে গড়াইয়া নীচে নামিতে পারে; কিন্তু এই নিম্নভাগের ভেন্ট্রিকল্ হইতে রক্ত যখন বিতাড়িত হয়, তখন আর উহা অরিকলে যাইতে পারে না। ঐ পথের পর্দা দুইটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায় এবং পার্শ্বের নল দ্বারা এই রক্ত বাহিত হইতে থাকে। দক্ষিণ ভেন্ট্রিকল্ হইতে এই অপরিষ্কার রক্ত ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং তথায় পরিষ্কৃত হইয়া পুনরায় বাম অরিকলে আসিয়া জমে। অরিকলে রক্ত জমিলেই উহা একটু স্ফীত হইয়া উঠে এবং যখন ঐ রক্ত তলদেশের ভেন্ট্রিকলে নামিতে থাকে তখন এই ভেন্ট্রিকল্ স্ফীত হইয়া উঠে। বাম ভেন্ট্রিকল্ কুঞ্চিত হইলে ঐ রক্ত পার্শ্বের নল

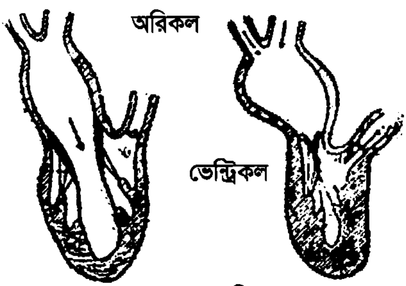

হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া

দ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে, হস্তে এবং পাদদেশে গমন করিয়া থাকে। হৃদয়ের এই কুঞ্চন এবং প্রসারণের ফলেই আমরা বক্ষঃস্থলে হৃদয়ের চলাচল অনুভব করিয়া থাকি। যাবৎ মানব জীবিত থাকে, তাবৎ তাহার হৃদ্‌যন্ত্র অনবরত চলিতে থাকে। তবে কখনও বা উহা দ্রুততালে চলে, কখনও বা অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিয়া থাকে। আমরা যখন চলাফেরা করি, দণ্ডায়মান থাকি, অথবা ব্যায়াম করি, তখন হৃদয় দ্রুততর গতিতে চলিতে থাকে; কিন্তু শুইয়া বিশ্রাম করিলে, তখন ইহার চলাচল মন্দ গতিতে হয়। পীড়ার সময় দেহে প্রদাহ হইলে তখনও ইহার গতি দ্রুত হয়।

নাড়ী (pulse)

অসুখ হইলে কবিরাজ মহাশয় তোমার হাতের কব্জিটি অঙ্গুলী দ্বারা অনুভব করিয়া থাকেন। এখানে তিনি কি দেখেন, কখনও শুনিয়াছ কি? হয়তো শুনিয়া থাকিবে তিনি এইরূপে তোমার নাড়ী পরীক্ষা করেন। নাড়ী কি? পূর্বে তোমাদের রক্তবাহী ধমনীর কথা বলিয়াছি। হৃদয়ের বাম ভেন্ট্রিক্‌ল্ হইতে নির্গত হইয়া একটি বৃহৎ ধমনী কতকগুলি শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। উহাদের একটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি হাতে গিয়াছে, এক অংশ ঊর্ধ্বমুখে ধাবিত হইয়া পরে মস্তকে গমন করিয়াছে, এবং অন্য অংশ নিম্নভাগে, শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পদদ্বয়ে চলিয়া গিয়াছে। দেহের মধ্যভাগেও ইহার অন্যান্য শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। ভেন্ট্রিক্‌লে রক্তের চাপ বাড়িতেই রক্তধারা এই বৃহৎ ধমনীটির মধ্যে দিয়া প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হয়। হৃদয়ের গতি সবিরাম, অর্থাৎ একবার চাপ পড়িয়া পরে একটু স্থির হয় এবং পুনরায় চাপ পড়ে। এই চাপের পরিবর্তন রক্তবাহী ধমনীর যে কোনও শাখা এবং প্রশাখা হইতে ধরা পড়িবে। হাতের কব্জির মধ্যে ধমনীর যে শাখাটি বিদ্যমান, উহার মধ্যেও এই রক্তের গতির কথা জানিতে পারা যায়। সুতরাং অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিয়া, এই স্থান হইতে কবিরাজ হৃদয়ের অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক বার্তা অবগত হইতে পারেন। তোমরাও এ কথা যদি কিছু জানিতে চাও, নিজের এক হাত দিয়া অন্য হাতের নাড়ী পরীক্ষা করিলেই দেখিবে উহার মধ্যে এই হৃদয়ের গতির ছন্দই ধরা পড়ে। হৃদয়ের গতিবেগও এইরূপে জানা যায়। তবে হৃদয়ের স্পন্দনটি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না কারণ হৃদয় হইতে হস্ত পর্যন্ত আসিতে রক্তের ঢেউগুলি অল্প একটু সময়

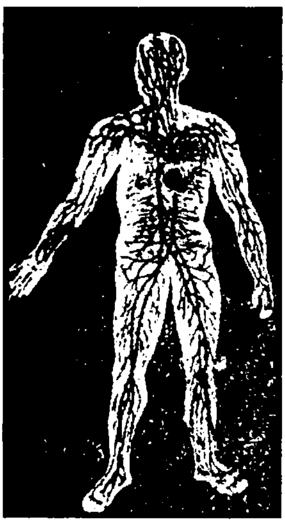

রক্তবহী চক্র

লইয়া থাকে; এইজন্য হৃদয়ের স্পন্দনের (beat) অল্পক্ষণ পরেই হাতের নাড়ী চলিবে। কোনও বন্ধুর দুই হাতের নাড়ী দুই হাত দিয়া টিপিলে কিন্তু দেখিবে ঐ দুই হাতের নাড়ি একই সময় চলিতেছে।

ধমনী দিয়া রক্ত, দেহের বিভিন্ন স্থানে গমন করিতেছে, এবং নিজের মধ্যে যে পুষ্টিকর পদার্থ আছে, তাহা দান করিয়া শিরার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ধমনী এবং শিরার গঠনবিধিতে একটু পার্থক্য রহিয়াছে। ধমনী একেবারে সাদাসিদা, কিন্তু শিরার মধ্যভাগে চিত্র-প্রদর্শিত মতো কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলি বা valve বিদ্যমান। ইহারা আছে বলিয়াই শিরার মধ্য হইতে রক্তস্রোত বিপরীত দিকে চালিত হয় না। ধমনীর মধ্যে রক্তের যে চাপ বর্তমান, শিরার মধ্যে গিয়া তাহার পরিমাণ কমিয়া যায়। এই জন্য এই থলিগুলি তথায় না থাকিলে, রক্ত হৃদয়ের দিকে না গিয়া বিপরীত পথে আসিতে পারিত। রক্ত দেহের বিভিন্ন স্থানে সমস্ত কার্য সম্পাদন করার ফলে, অম্লজান হারাইয়া অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ গ্রহণ করতঃ একটু ঘোরতর বর্ণ ধারণ করে, এই জন্য শিরাগুলিকে দেখিতে নীল বর্ণের মনে হয়। ফুস্‌ফুসের সাহায্যে এই নীলাভ লালবর্ণের শিরাবাহী রক্ত নূতন অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ধারণ করে। কোনওরূপে ধমনী ছিন্ন হইলে অধিকতর চাপের ফলে তথা হইতে অধিক পরিমাণ রক্ত নষ্ট হইবে, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই জন্যই বিধাতার বিচিত্র বিধানে ত্বকের ঠিক নিম্নে রহিয়াছে শিরাগুলি, কিন্তু ধমনী আরও নিম্নে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে অবস্থিত।

ধমনী শিরা

ধমনী ও শিরার দ্বিখণ্ডিত চিত্র

রক্ত-কণিকা (Blood corpuscles)

এই যে বিভিন্ন ধমনী মধ্যে প্রবহমান রক্ত, ইহা প্রকৃতপক্ষে কি? ক্ষত স্থান হইতে রক্ত ক্ষরণ দেখিয়াছ। উহা লোহিত বর্ণের একটি তরল পদার্থ বিশেষ। বায়ুর সহিত সংস্পর্শ হইলে, অতি অল্পকাল মধ্যেই এই রক্ত জমিয়া যায়। রক্ত জমিলে উহাকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা সম্ভবপর — একটি তরল জলীয় পদার্থ, উহাই প্লাজমা (plasma) বা লসীকা নামে পরিচিত, এবং অপর অংশটি ফাইব্রিন (fibrin)। রক্ত জমিবার পূর্বে উহাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন্ত কণিকা বিদ্যমান দেখা যায়। কিন্তু ইহাদিগকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখিলে দেখা যায়, এই কণিকাগুলি দ্বিবিধ। একটি বৃত্তাকার, ফিকা লাল রং-এর এবং উহারা দুই পার্শ্বে একটু চেপ্টা; দ্বিতীয় শ্রেণীর কণিকাগুলি শ্বেত কণিকা নামে পরিচিত। ইহাদিগের সকলের কোনও বিশিষ্ট আকার নাই এবং ইহারা সংখ্যাও অল্প। শরীরের মধ্যে কোনও রোগবীজাণু প্রবেশ করিলে, এই শ্বেত কণিকাগুলিই তাহাদিগের সহিত

যুদ্ধে নিযুক্ত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জয়ী হইয়া বীজাণুগুলিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। কিন্তু যদি বীজাণুগুলির শক্তি অধিকতর হয়, তাহা হইলেই মানব পীড়াগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে থাকে, এবং একদিন মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে পারে। রক্তের এই কণিকাগুলি মিলিয়াই জমাট রক্তের ফাইব্রিন প্রস্তুত করে। এই যে রক্ত-মধ্যে ত্রিবিধ পদার্থ, ইহারা প্রস্তুত হইতেছে বিভিন্ন উপাদান হইতে। খাদ্যদ্রব্য পাচিত হইয়া প্লাজমা বা লসীকা রূপে রক্তস্রোতে মিশ্রিত হয়, এবং অস্থিগুলির মধ্যে যে মজ্জা রহিয়াছে তাহা হইতেই এই কণিকাগুলি উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহারা চিরকাল বাঁচিয়া থাকে না, প্রায় পক্ষকাল মধ্যেই উহাদিগের মৃত্যু ঘটিলে, নূতন কণিকা নির্মিত হয়। এই কণিকা মধ্যে লোহিত বর্ণের কণিকাগুলি অস্থি-মধ্যস্থ লোহিত বর্ণের মজ্জা হইতে প্রস্তুত হইতে থাকে, এবং শ্বেত কণিকাগুলি অস্থিমধ্যে নিহিত ঈষৎ পীতবর্ণের অন্য একরূপ কণিকা হইতে উদ্ভূত হয়। রক্তের লোহিত বর্ণ হিমগ্লোবিনের জন্যই দেখা যায়; এই পদার্থটি লৌহ হইতে ঐ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল কণিকা ছাড়াও আরও একরূপ বিষ-প্রতিষেধক পদার্থ (anti-toxin) রক্তে বিদ্যমান। তাহার সাহায্যেও বিষ এবং রোগবীজের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

রক্ত ও শ্বেত কণিকা

মানুষের মস্তিষ্কই তাহার দেহের সমস্ত কার্যবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। হৃদয়ের চলাচলও ঐ একই শাসন-কর্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। মস্তিষ্ক তাহার যাবতীয় কার্য টেলিগ্রাফের তারের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম সূত্র-সদৃশ স্নায়ুতন্তুর সাহায্যে সম্পাদন করে। হৃদয়ের ঐরূপ তন্ত্রী সাহায্যে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। এই স্নায়ুমণ্ডলীর পরিচয় পরে দিব।

স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য

মস্তিষ্ক (Brain)

দেহের যাবতীয় যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যই মস্তিষ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার বিভিন্ন অংশ হইতে দেহের বিভিন্ন অংশের কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ইহার যে অংশ অবস্থিত, তথা হইতে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া একটি দীর্ঘ সূত্র-সদৃশ পদার্থ নিম্নে নামিয়া গিয়াছে, এবং তথা হইতে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা নির্গত হইয়া সমস্ত শরীরময় একটি স্নায়ু-সূত্রের জাল বিস্তার করিয়াছে। ইহাই স্নায়ুমণ্ডলী নামে অভিহিত হয়। এইবার ইহাদের সামান্য পরিচয় লিপিবদ্ধ করিব।

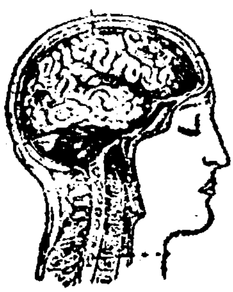

মস্তিষ্ক

মস্তিষ্ক কয়েকটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। এই সকল বিভিন্ন স্থান হইতে দেহের একটি যন্ত্রের কার্য নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। পার্শ্বের চিত্রে সমস্ত মস্তিষ্কই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; উহার বিভিন্ন অংশ দেহের বিভিন্ন কার্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া করে। মস্তিষ্কের নিম্নভাগ দিয়া যে স্নায়ুসূত্র নির্গত হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহাই পরে বিভক্ত হইয়া, দেহময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হইতে নানা আদেশ এই সকল স্নায়ুসূত্রের মধ্য দিয়া গিয়া স্থান বিশেষের পেশীগুলিকে কার্যে নিযুক্ত করে।

স্নায়ু (nerve)

স্নায়ুসূত্রগুলি দ্বিবিধ। প্রথম শ্রেণীর স্নায়ুসূত্রের শেষ অংশ প্রত্যেক দেহযন্ত্রের প্রায় উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এইগুলি সংজ্ঞাবহ (sensory বা afferent) স্নায়ু নামে পরিচিত। দেহের কোনও অংশ আহত হইলে অথবা অন্য কোনওরূপে আক্রান্ত হইলে, এই স্নায়ুসূত্র সাহায্যেই সেই স্থানীয় পেশীকে কার্যে উদ্দীপিত করিবার আদেশ বাহিত হইয়া আইসে। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নায়ুগুলি চেষ্টা-বহা (motor বা efferent) স্নায়ু নামে পরিচিত। ধর, তোমাকে কেহ আঘাত করিয়াছে; তোমার দেহে আঘাতের স্পর্শ হইবামাত্র আহত স্থানের ক্ষতিপূরণ মানসে সংজ্ঞা-বহা (afferent) স্নায়ুর আদেশক্রমে

সেই স্থানে রক্তসঞ্চালন অধিকতর পরিমাণে হইতে থাকিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার মস্তকের অন্য অংশ হইতে হস্তদ্বয়ের উপর আদেশ প্রচারিত হইল যে, এই আঘাতের প্রতিশোধ নাও। প্রতিশোধের চিন্তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তির অধিকতর উৎকর্ষ দ্বারা আমরা অনেক সময় এই স্বাভাবিক প্রচেষ্টাকে নিবারিত করিয়া থাকি। কখনও কখনও শরীরের মধ্যে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া থাকে, যেগুলিকে আমরা এই সংজ্ঞা-বহা স্নায়ুর দ্বারা বাহিত বলিয়া বুঝিতে পারি না। কিন্তু চেষ্টা-বহা স্নায়ুর আদেশ মস্তিষ্ক হইতে হইয়াছে বুঝা যায়; এইগুলিই স্বতঃপ্রবৃত্ত (spontaneous) উত্তেজনা বলিয়া কথিত। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

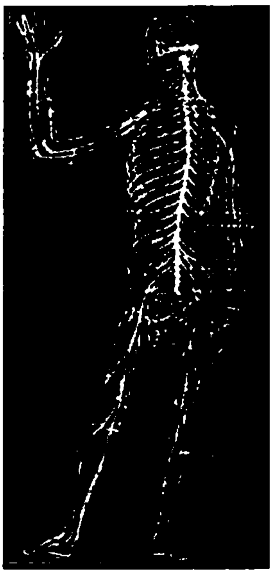

স্নায়ুমণ্ডলী

ধর, একটি অতিশয় উত্তপ্ত পদার্থের উপর হঠাৎ না জানিয়াই তুমি হাত রাখিয়াছ; ফলে তোমার হাতের উপর একটি এমন ধাক্কা অনুভব কর যে, ঐ উত্তপ্ত পদার্থ হইতে তোমার হাত দ্রুত সরিয়া আসে। এত দ্রুত এই ঘটনা সংঘটিত হয় যে, অল্প সময়ের মধ্যে সংজ্ঞা-বহা (afferent) স্নায়ু এই বিপদ-বার্তা বহন করিয়া যাইয়া নূতন আদেশ লইয়া আসিতে পারে না। এইরূপ ক্রিয়াই স্বতঃপ্রণোদিত বলিয়া মনে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, একস্থানের সংজ্ঞা-বহা (afferent) স্নায়ু একটি বিশেষবার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া তথা হইতে অন্য স্থানের পেশীকে উত্তেজিত করিয়া থাকে।

তুমি কখনও কোনও কারণে হঠাৎ লজ্জিত হইয়াছ কি? যদি হঠাৎ লজ্জা পাইয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয় জান যে, ইহার ফলে অকস্মাৎ মুখমণ্ডলের মধ্যে রক্ত চলাচলের বাহুল্য ঘটে। অন্য উত্তেজনায়ও এই ব্যাপারটি কখনও কখনও ঘটিয়া থাকে। লজ্জার উদ্রেক হইতে পারে এইরূপ কোনও কথা শুনিলে কানের মধ্যে দিয়া সংজ্ঞা-বহা (afferent) স্নায়ু যে বার্তা বহন করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায়, তাহারই ফলে সমস্ত মুখাবয়বে অধিকতর রক্তের সমাগম হয় এবং ফলে লাজুক ছেলেটি বা মেয়েটি সমস্ত মুখ রাঙ্গা করিয়া তোলে; সে সময় মুখ, এমনকি কর্ণমূল পর্যন্ত উত্তপ্ত মনে হয়। দুষ্ট ছেলেরা পরীক্ষা-গৃহে নকল করিতে যাইয়া ধরা পড়িলেও কানটি তার লাল হইয়া উঠে একই কারণে। অধিক পরিমাণে রাগান্বিত হইলেও এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অধিকতর আনন্দজনিত যে ভাব দেহমধ্যে প্রকাশ পায়, তাহার ফলে সমস্ত লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠে, ইহাই রোমাঞ্চ বলিয়া কথিত।

সংজ্ঞা-বহা (afferent) স্নায়ুর দ্বারা কোনও বার্তা মস্তিষ্কে যাইলেও আমরা ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে চেষ্টা-বহা (efferent) স্নায়ুকে কার্যে নিযুক্ত করিতে পারি। ইচ্ছা হইলে হস্ত উত্তোলন করিব, চেষ্টা-বহা (efferent) স্নায়ুর সাহায্যে এই আদেশ মস্তিষ্ক হইতে গমন করিতেই হস্ত উত্তোলিত হইল। বাম হস্তকে কার্যে নিযুক্ত করিতে মস্তিষ্কের দক্ষিণাংশে ইহার কেন্দ্র রহিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ হস্তকে কার্যে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মস্তিষ্কের বাম অংশে ইহার কেন্দ্র অবস্থিত।

যদি কেহ তোমাকে আঘাত করে, সংজ্ঞা-বহা স্নায়ু তোমার মস্তিষ্কে সেই বার্তা লইয়া যায় তাহার ফলে দুইটি কার্য ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ আঘাত-প্রাপ্ত স্থানে অধিকতর রক্ত চলাচল হয়, দ্বিতীয়তঃ মস্তিষ্কের তখন ইচ্ছা হয় চেষ্টা-বহা স্নায়ুকে কার্যে উদ্দীপ্ত করিয়া ঐ আঘাতকারীকে প্রত্যাঘাত করা।

কর্ণ (ear)

শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত মস্তিষ্কের যে যোগ স্নায়ুর সাহায্যে ঘটিয়াছে, তাহারই ফলে আমরা বাণী শ্রবণ করিয়া থাকি। এই ইন্দ্রিয়টির সামান্য একটু বিবরণ দরকার। কর্ণ দুইটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, — একটি বহির্ভাগে এবং অপরটি অন্তর্ভাগে অবস্থিত। একটি পাতলা পর্দা এই দুইটি প্রকোষ্ঠকে পরস্পর হইতে পৃথক করিতেছে, এই পর্দাটি টিমপ্যানিক পর্দা (tympanic) নামে পরিচিত। পর্দার ভিতর দিকে যে প্রকোষ্ঠটি রহিয়াছে, উহাই নলের আকারে আসিয়া মুখ-গহ্বরের পশ্চাদ্ভাগে মিশিয়াছে, এবং এই প্রকোষ্ঠের উপরিভাগে কুণ্ডলী পাকাইয়া স্নায়ুমণ্ডলী একটি ক্ষুদ্র পাত্রে একরূপ তরল পদার্থ মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে। কর্ণের বাহিরে ও ভিতরে বাতাস উপস্থিত থাকায় কর্ণ-পটহের (tympanic membrane) আন্দোলনকে, ইহার সহিত সংযুক্ত তিন খণ্ড অস্থির সাহায্যে ঐ পূর্বোক্ত তরল পদার্থের মধ্যে লইয়া গিয়া, তথায় আলোড়ন উপস্থিত করে এবং ইহাই ক্রমে স্নায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে গেলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই। স্নায়ুমণ্ডলী প্রত্যেকটি কর্ণের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম জালের সৃজন করিয়াছে, ইহারা হারমোনিয়ম বা পিয়ানোর

কর্ণের অভ্যন্তর

রীডগুলির সহিত উপমিত হইতে পারে। চিত্রে কর্ণের অভ্যন্তরভাগ কতকটা পরিষ্কারভাবেই দেখান হইয়াছে।

কর্ণ-পটহের বহির্দিকে কতকগুলি গ্রন্থি অবস্থিত; তথা হইতে একরূপ মোমের ন্যায় পদার্থ নির্গত হইয়া, সর্বদাই ঐ বায়ুর গমন-পথ, নলটিকে পরিষ্কার রাখে। ইহার ভিতর দিকের নলটিও বাতাসে পূর্ণ রহিয়াছে, সর্দির সময় আমরা এই ভিতরের নল-পথ বন্ধ হওয়ার দরুন কানে শুনিতে কষ্ট পাই।

চক্ষু (eye)

চক্ষু শরীরের একটি বিস্ময়কর যন্ত্র; ইহার প্রস্তুতবিধি কতকটা ক্যামেরার ন্যায়। উহার সম্মুখভাগে চক্ষু-তারকার পশ্চাতেই যে পরকলাটি (lens) অবস্থিত, তাহারই সাহায্যে পদার্থের ছবি, চক্ষুর মধ্যে পিছনের পর্দার পড়িয়া থাকে, এবং তথা হইতে স্নায়ু সাহায্যে ইহার বার্তা মস্তিষ্কে গিয়া উপস্থিত হইলে আমরা পদার্থ দেখিতে পাই। চক্ষুর মধ্যে যে বিভিন্ন পেশী অবস্থিত, তাহারাই পদার্থের চিত্রটিকে যথাস্থানে লইয়া যাইতে সহায়তা করে। কিন্তু এই পরকলা বা লেন্সটি যদি দুষ্ট হয়, তখন ঐ পদার্থের ছবি ঠিক পিছনের পর্দাটির উপর পড়ে না; বরং হয় তাহারও পশ্চাতে, অথবা সম্মুখে পতিত হইতে থাকে, তখনই আমরা চোখে কম দেখি। চশমার সাহায্যে এই ছবি যথাস্থানে ফেলা হয় বলিয়া, সঠিক চশমা দ্বারা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাই। ছবিটি যখন চক্ষুর পিছনে, রেটিনা নামীয় পর্দার উপর পতিত হয়, তখন উহা উল্টাভাবে পড়ে, এই বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছাইলে তথায় ইহার সঠিক অবস্থান নির্ণীত হইয়া থাকে। উপরের চিত্র হইতে চক্ষু-মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন অংশের পরিচয় পাইতে পারিবে।

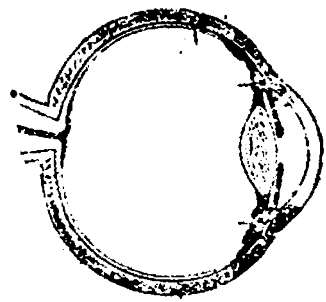

চক্ষুর অভ্যন্তর

মলবাহী যন্ত্র

দেহ হইতে গ্লানি এবং উচ্ছিষ্ট পদার্থ কতকগুলি বিশেষ পথ বাহিয়া নির্গত হয়। এই সকল মলবাহী পথ এইরূপ, যথা — নিঃশ্বাস বায়ুর সহিত দেহের জলীয় অংশ এবং দেহের বিভিন্ন স্থানে উদ্ভূত অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প নির্গত হইয়া অনবরত দেহকে সুস্থতর রাখিতেছে। ইহার বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। দেহ হইতে ভুক্ত পদার্থের যে অংশ দেহ পুষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় নাই, তাহা ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে বৃহদন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় জলীয় অংশ হারাইয়া, ক্রমে নাতি-কঠিন আকারে দেহ হইতে নির্গত হইবার নিমিত্ত, পূর্ব-বর্ণিত সেই কৃমি-গতির সাহায্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, এবং পরিশেষে মলরূপে গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায়। দেহের তরল ময়লা মূত্ররূপে ও ঘর্মরূপে নির্গত হইয়া থাকে।

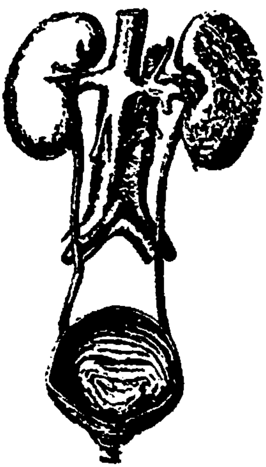

বৃক্কযন্ত্র ও মূত্রথলি

বৃক্কযন্ত্র (kidney) ও মূত্রথলি (bladder) — রক্তবাহী শিরা হইতে রক্ত গিয়া মেরুদণ্ডের তলদেশে উহার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত বৃক্ক-যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; তথায় একরূপ ছাঁকন ক্রিয়ার ফলে রক্তের কণিকাগুলি এক পার্শ্বে লসীকা-প্রবাহে রহিয়া যায়, এবং অন্য পার্শ্বে অপ্রয়োজনীয় জলীয় অংশ দেহ হইতে লবণ, ইউরিক এসিড প্রভৃতি নানারূপ রাসায়নিক পদার্থসহ নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দেহযন্ত্রের চলাচল এবং ক্ষয়ের ফলে নানা স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া রক্ত-স্রোতে বাহির হইতেছিল, এখন বৃক্ক সাহায্যেই উহাকে দেহ হইতে পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইল। এইরূপ ছাঁকন কার্যের পর ঐ জলীয় দ্রবণ আসিয়া বৃক্কের সহিত সংযুক্ত দুইটি নল-পথে বাহিয়া নিম্নে মূত্রথলির মধ্যে জমিতে থাকে। এই মূত্রথলি তিনটি নলের সহিত সংযুক্ত। ইহাদিগের মধ্যে দুইটি নল (ureter) দ্বারা বৃক্ক হইতে মূত্র আসিয়া ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং তৃতীয়ের সাহায্যে ঐ পদার্থ মূত্রনালীর (urethra) দ্বারা দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

ত্বক (skin)

দেহ হইতে আরও একটি পথ দিয়া, অনবরত জলীয় বাষ্প, অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ এবং অন্য পদার্থও নির্গত হইয়া থাকে, ইহাই আমাদিগের দেহাবরণ বা ত্বক। ত্বক-দেশ প্রকৃতপক্ষে দুই অংশে বিভক্ত। ইহাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেই উহার তিন অংশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ইহার একখণ্ড পরীক্ষা করিলে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝা যায়। ত্বকের বহির্ভাগ অধিত্বক (epidermis) এবং অন্তর্ভাগ অধত্বক (dermis) নামে কথিত। ইহারই চিত্র এতৎ নিম্নে রহিয়াছে। পেশীসমূদয় এপিডারমিস বা অধিত্বকের মধ্যে রক্তবাহী কোনও শিরা বা উপশিরা নাই। তবে ইহার মধ্যে স্নেহ পদার্থ থাকে, এবং লসীকা পদার্থও অল্প পরিমাণে ইহার মধ্যে প্রবাহিত হয়। ত্বকের উপরিভাগে আঁচড় লাগিলেই একটি জলীয় পদার্থ অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। উহাই এই লসীকা পদার্থ ও ইহা অধিত্বকের মধ্য হইতে বাহির হয়। মৃত জন্তুর চর্ম ছাড়াইবার সময় এই অধিত্বকই ছাড়াইয়া ফেলা হয়। ইহারই নিম্নে অধত্বক (dermis) রহিয়াছে; উহার মধ্যে রক্তবাহী শিরা-উপশিরাগুলি অবস্থিত এবং স্নায়ুসূত্রগুলিও ইহার মধ্যে জালের ন্যায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক স্নায়ুসূত্রের শেষ অংশ কুণ্ডলীর আকারে অধিত্বকের ঠিক নিম্নে অবস্থিত। পার্শ্বের চিত্রে এই সকল অংশ বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। ইহারই মধ্যে চর্ম-গ্রন্থিগুলি অবস্থিত। এই চর্ম-গ্রন্থি হইতে সূক্ষ্ম নালীপথ, অধিত্বকের উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত; এই পথ বাহিয়া ঘর্ম শরীর হইতে নিঃসৃত হয়। গ্রীষ্মকালে বিশেষতঃ বাতাস যখন আর্দ্র, তখন বাহিরের আর্দ্রতার আধিক্য বশতঃ দেহ-নিঃসৃত ঘর্ম দ্রুত শুকাইতে পারে না, ফলে ঐ সময় অধিক পরিমাণে ঘর্ম নির্গত হইতে থাকে; এবং উহার সহিত দূষিত পদার্থও পরিত্যক্ত হয়। এই পথ দিয়াই আর একরূপ স্বেদ ও স্নেহ পদার্থ অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। এই স্নেহ পদার্থ উপরে আসিয়া চর্মকে মসৃণ ও কোমল রাখে। লোমগুলিও অধত্বকের মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া সূক্ষ্ম নালী বাহিয়া অধিত্বকের উপরে আসে। এই পথ দিয়াও শরীরের পরিত্যক্ত বাষ্পীয় পদার্থ, অন্য নানাবিধ দ্রব্যের সহিত উঠিয়া বাহিরে আসে। এই সকল পদার্থের মধ্যে লবণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই জন্যই শরীর-নিঃসৃত ঘর্ম লবণ-আস্বাদ যুক্ত। ইহার সহিত এইরূপ জৈব পদার্থ অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে; উহার বিশেষ একরূপ দুর্গন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, ঘর্মসিক্ত বস্ত্রাদিতে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

ত্বকের কর্তিত রূপ

স্বাস্থ্য সুন্দর রাখিতে হইলে, চর্মের উপরিভাগ পরিষ্কার রাখা দরকার। তথায় অবস্থিত লোম-কূপগুলি কোনও রূপে বন্ধ হইয়া গেলে দেহের দূষিত পদার্থ নিয়মিতভাবে বাহিরে আসিবে না, ফলে অসুখ করিতে পারে। নখ এবং চুলও এই অধিত্বকের অংশবিশেষ। ঐ সকল স্থানের নিম্নে অধিক পরিমাণ রক্ত চলাচল হয় বলিয়া নখ এবং চুল প্রতিনিয়তই বাড়িতেছে। ইহাদিগকে কাটিলে পুনরায় উহারা বাড়িয়া চলে। পুরাতনের স্থান নূতন পদার্থ দিয়া পূর্ণ হয়।

রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার

আহারে নিয়মানুবর্তিতা

নাসা-পথ দিয়া আমরা যেমন অনবরত বাতাস গ্রহণ করিতেছি, মুখ-পথ দিয়াও তেমনি প্রত্যহ কিছু পরিমাণ খাদ্য এবং পানীয় দেহের প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করিয়া থাকি। দেহের প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া অধিক দ্রব্য আহার করিলেই, অথবা অত্যধিক পানীয় গ্রহণ করিলেই, পাচন-যন্ত্রের অসুবিধা উপস্থিত হয়। এই অসুবিধা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিলে, শরীর অসুস্থ হয়। কিন্তু যদি আমরা উহা সহ্য করিতে পারি তাহা হইলে দেহের পুষ্টির মাত্রা বাড়িতে পারে, ফলে দেহ পুষ্ট হইয়া উঠে। খাদ্য-বিশেষে দেহের পেশীবিশেষ অধিকতর পুষ্ট হয়। শরীরকে নীরোগ রাখিতে হইলে কিন্তু, উহার প্রয়োজন মতো খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। খাদ্য সম্বন্ধে "অধিকন্তু ন দোষায়" কথাটির প্রয়োগ চলিতে পারে না। এই কথাটি মনে রাখিলে পেটের অসুখের সম্ভাবনা অল্প হইবে।

অধিক আহার সাময়িকভাবে দেহ সহ্য করিতে পারিলেও চিরকাল তাহা সহ্য করিবে না। এই জন্য দেখা যায়, অল্প বয়সে যাহারা অধিক আহার করেন, বয়স বাড়িলে অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা পেটের অসুখে ভুগিতে থাকেন। আবার ইহাও দেখা যায় যে, যাহারা অল্প আহার করে, অর্থাৎ দেহের প্রয়োজন মতো আহার গ্রহণ করে না, তাহারা অল্পাহারে ক্রমে দুর্বল হইয়া নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। সুতরাং তোমরা সুস্থ এবং সবল হইয়া বাঁচিতে চাহিলে নিয়মিত এবং পরিমিত আহার করিতে ভুলিবে না।

আহার্যের পরিমাণ সম্বন্ধে যেরূপ নির্দিষ্ট নিয়ম রক্ষা করা প্রয়োজন, আহারের সময় সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়মের অধীন থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। অতীত ও বর্তমানের লোকদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া যাহারা বাঁচিয়া ছিলেন, তাহাদিগের প্রত্যেকে খাওয়ার পরিমাণ এবং সময় সম্বন্ধে চিরকালই সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। আজকাল আমাদিগের খাইবার সময়ের কোনওরূপ নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় স্বাস্থ্য ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সুস্থ শরীরে থাকিতে হইলে সকালে একবার দিনের মধ্যভাগে একবার, অপরাহ্নে অল্প একটু এবং রাত্রে শেষবার আহার গ্রহণ করা কর্তব্য। স্কুল কলেজে মধ্যাহ্ন ছুটির ব্যবস্থা করিয়া সকলের আহারের আয়োজন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষুধা না হইলে না খাওয়াই উচিত।

রোগ-বীজাণু (bacillus of a disease)

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, বিশেষ নিয়মের অধীন থাকিয়া আহার গ্রহণ করিতে থাকিলেও শরীর নানারূপ ব্যাধির আক্রমণে জর্জরিত হইয়া পড়ে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই সকল ব্যাধির প্রকৃত কারণ হইতেছে বিশিষ্ট প্রকারের রোগ বীজাণু। নিম্নে চিত্রে কতকগুলি বিভিন্ন রোগের বীজাণুর রূপ বড় করিয়া দেখান হইল।

ডিপথিরিয়া কলেরা প্লেগ টাইফয়েড

এই বীজাণুগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র জীবন্ত কণা। জীবের সাধারণ নিয়মানুযায়ী ইহারা আহার্য পাইলে বাড়িতে থাকে। দেহের মধ্যে উহাদের আহার্যের অভাব ঘটে না; তবে আহার্যের সহিত উহাদিগের শত্রু রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি দল বাঁধিয়া উহাদিগকে আক্রমণ করে এবং এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের উপর দেহের স্বাস্থ্য নির্ভর করিয়া থাকে। শ্বেত কণিকার জয় হইলে অবশেষে মানুষ পীড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়; কিন্তু বীজাণুর শক্তি অধিক হইলে যন্ত্রণা তো বাড়েই, অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যু আসিয়া যন্ত্রণা লাঘব করে। এই বিভিন্ন রোগ-বীজাণুগুলি আমাদের অজ্ঞাতে খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যের সহিত দেহে প্রবেশ করে এবং তথায় রক্ত-স্রোতে ঢুকিয়া মহা বিপদের সূচনা করে।

যে সকল রোগ এই বিভিন্ন রোগের বীজাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহারাই স্পর্শানুক্রমিক বা ছোঁয়াচে রোগ নামে অভিহিত। রোগীর সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকিলেও, অন্যভাবে এই রোগ-বীজাণুগুলি বাহিত হইয়া সুস্থ দেহকে আক্রমণ করে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি রোগের উল্লেখ করিতেছি।

টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক জ্বর অত্যন্ত ভীষণ রোগ। এই রোগের কারণ টাইফয়েড বীজাণু। এই বীজাণুগুলি সাধারণতঃ মাছি দ্বারা বাহিত হইয়া সুস্থ লোকের খাদ্যে এবং পানীয়ে ছড়াইয়া পড়ে। কোনও বস্তু ফুটন্ত পানি মধ্যে কিছুকাল বসাইয়া রাখিলে, উহার মধ্যে যাবতীয় রোগ-বীজাণু মরিয়া যায়। এই জন্য রন্ধন-করা খাদ্যে বীজাণু থাকে না, কিন্তু ঐ খাদ্য কোনও স্থানে খোলা অবস্থায় থাকিলে, মাছি আসিয়া তাহাকে অপবিত্র করে। এই জন্য মাছি মানবের প্রধান শত্রু। মাছির স্পর্শ হইতে যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য সযত্নে রক্ষা করা কর্তব্য। কলেরা রোগও স্পর্শানুক্রমিক। ইহার বীজাণুও মাছির দ্বারা বাহিত হইয়া আসিতে পারে। পানীয় জলের মধ্য দিয়াও টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত খোলা

পুষ্করিণীর পানি পান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এরূপ পানি ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া পান করা উচিত। ঢাকার ন্যায় বড় সহরের পানি, কলে আসিবার পূর্বে বীজাণু শূন্য হইয়া আসে। কিন্তু তবুও দেখা যায়, এই পানি সময় সময় পথিমধ্যে রোজ-বীজাণু দ্বারা দূষিত হইয়া ঢাকার স্থানবিশেষে নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। এরূপ ক্ষেত্রে পানীয় জল ফুটাইয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ। প্লেগ অথবা ডিপথিরিয়ার বীজাণুও মাছি প্রভৃতির দ্বারা বাহিত হইয়া সুস্থ দেহে বিপদ ঘটায়।

ম্যালেরিয়া রোগও বিশেষ রোগ-বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই বীজাণুর বাহক কিন্তু একরূপ বিশিষ্ট শ্রেণীর মশা, যাহাকে আমরা এনোফিলিস বলিয়া জানি। ম্যালেরিয়ার বীজাণু রোগীর রক্তমধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। এই সময় মশা রোগীকে কামড়াইয়া যে রক্ত গ্রহণ করে, তাহারই মধ্যে ম্যালেরিয়ার বীজাণু আসিয়া, মশক-দেহে অবস্থান করে; এবং ঐ মশাই পরে কোনও সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিলে রোগ-বীজাণু গিয়া সুস্থ ব্যক্তির রক্তে প্রবিষ্ট হয়। পরের কথা আর না বলিলেও চলে। মশাও এই জন্য মানবের ঘোরতর শত্রু। তাহাদিগকে একটি একটি করিয়া মারা অসম্ভব, এইজন্য উহার উৎপত্তিস্থান বাহির করিয়া, তথায় কেরোসিন ছড়াইলে সবগুলিই মারা যাইবে। কুইনিন এই রোগ-বীজাণুর পক্ষে বিষবৎ। এই জন্যই ইহা ম্যালেরিয়া রোগীকে সেবন করান হয়, এবং ইহার ইন্‌জেক্‌সন রক্তস্রোত মধ্যে ম্যালেরিয়া বীজাণুকে ধ্বংস করে। পীতজ্বরের বীজাণুগুলিও আর এক প্রকার মশা দ্বারা বাহিত হয়। এই জন্য সর্বদাই এই সকল ক্ষুদ্র শত্রু হইতে সাবধান থাকা কর্তব্য। মশারির ভিতর পরিষ্কার বিছানায় শয়ন করিলে ঐ সকল উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

যক্ষ্মার বীজাণু বাতাসে ভাসিয়া সুস্থ দেহকে আক্রমণ করে। উহারা বায়ুর সহিত দেহাভ্যন্তরে যাইয়া ফুস্‌ফুস্‌ গাত্রে স্থান লয়, এবং ক্রমে ফুস্‌ফুস্‌ বিদীর্ণ করিয়া দেহকে জর্জরিত করিয়া তোলে। ফুস্‌ফুস্‌ হইতে তখন রক্তস্রাব হয় এবং রোগীর জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ আসিয়া জুটে; এই ভীষণ ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এরূপ জায়গায় বাস করা দরকার, যেখানে প্রচুর পরিমাণে সূর্যালোক এবং প্রবহমান বায়ু রহিয়াছে। সূর্যরশ্মি এই বীজাণুর পরম-শত্রু, তাই রৌদ্র-স্নানে এই রোগ-বীজাণু নষ্ট হইয়া থাকে। বায়ু চলাচলের ফলে পুরাতন বীজাণুপূর্ণ বায়ু তাড়িত হইয়া নূতন বায়ু আগমন করে এবং রোগ-বীজাণুও দূরে সরিয়া যায়।

ভ্যাকসিন (vaccine)

এই সকল রোগের বীজাণু আবিষ্কৃত হইবার পর নানারূপ পরীক্ষায় নির্ণীত হইয়াছে যে, বসন্ত প্রভৃতি পীড়ার বীজাণু সুস্থ প্রাণীদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া, উহার দূষিত রক্ত হইতে একরূপ ভ্যাক্‌সিন প্রস্তুত হইতে পারে। উহাই সুস্থ দেহের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, সে রক্তে রোগের বীজাণুর সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি বাড়িয়া যায়; ফলে আর সুস্থ শরীরকে ঐ রোগ জীবাণু আসিয়া আক্রমণ করিলেও আহত করিতে পারে না। এই জ্ঞান লাভ করিবার পর সুবিখ্যাত রাসায়নিক পাস্তুর, সুস্থ মেষ-দেহে এনথ্রাক্‌স্‌ রোগ-

বীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহার রক্ত হইতে ঐ রোগের প্রতিষেধক সিরাম প্রস্তুত করেন। পরে এই সিরাম দ্বারা হাজার হাজার মেষ, এনথ্রাক্সের আক্রমণ এবং তৎফলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পায়। অধুনা ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের যে ইন্‌জেক্‌সন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাও এই একই মূলতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াই হইয়াছে। এই সকল পদার্থের আবিষ্কার ফলে কত লোক অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। নানা রোগের বীজাণু রক্তের রহিত মিশ্রিত হইবার জন্য সর্বদা উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। দেহের কোনও স্থান কাটিয়া গেলে তথায় এইরূপ বীজাণুবর্গ গমন করিয়া বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করে। এরূপ ক্ষেত্রে বীজাণু নষ্ট করিবার জন্য টিংচার আয়োডিন প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোনও স্থান কাটিয়া গেলে তথায় অল্প একটু আয়োডিন লাগাইতে ভুলিবে না। কারবলিক এসিড, বোরিক এসিড, প্রভৃতিও বীজাণুনাশক পদার্থ।

হরমোন (hormone)

এইস্থানে আর একটি কথা না বলিলে, দেহে রোগের আবির্ভাব সম্বন্ধে সব কিছু বলা হইবে না। দেহ-মধ্যে বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি নালীহীন গণ্ড বর্তমান; ইহা হইতেই একরূপ রস নিঃসৃত হইয়া দেহকে বিবিধ পীড়া হইতে রক্ষা করে। পাচক-গ্রন্থি হইতে পাচন-রস ব্যতীত আরও একটি পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, কখনও উহার অভাব ঘটিলে শরীরের শর্করা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগে না, তখন ইহার অনেক অংশ প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই রোগ বহুমূত্র (diabetes) নামে পরিচিত। এখন ডাক্তারেরা বহুমূত্র রোগে ইন্‌সুলিনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধরূপে ব্যবহার করেন।

বৃক্ক-যন্ত্রের উপরেই সুপ্রা-রেনাল গণ্ড হইতে এড্রিনেলিন নির্গত হইয়া দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এইরূপ গলগ্রন্থি হইতে থাইরক্‌সিন এবং মস্তিষ্ক নিম্নে অবস্থিত পিটুইটারী গণ্ড হইতে পিটুইট্রিন নির্গত হইয়া দেহ গঠনে সহায়তা করে। এই সকল গণ্ড-নিঃসৃত রস হরমোন নামে পরিচিত এবং ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি অধুনা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিয়া মানবের সাহায্যে নিযুক্ত করা হইতেছে। এই সকল পদার্থ ছাড়াও কত নূতন নূতন আশ্চর্যজনক পদার্থ মানবের সহায়তার জন্য রাসায়নিক নিত্য প্রস্তুত করিতেছেন, তাহার ইতিবৃত্ত যেমন বিস্ময়জনক, তেমনই মনোরম। সে সকল কথা তোমরা বড় হইয়া জানিতে পারিবে।

বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী

ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা

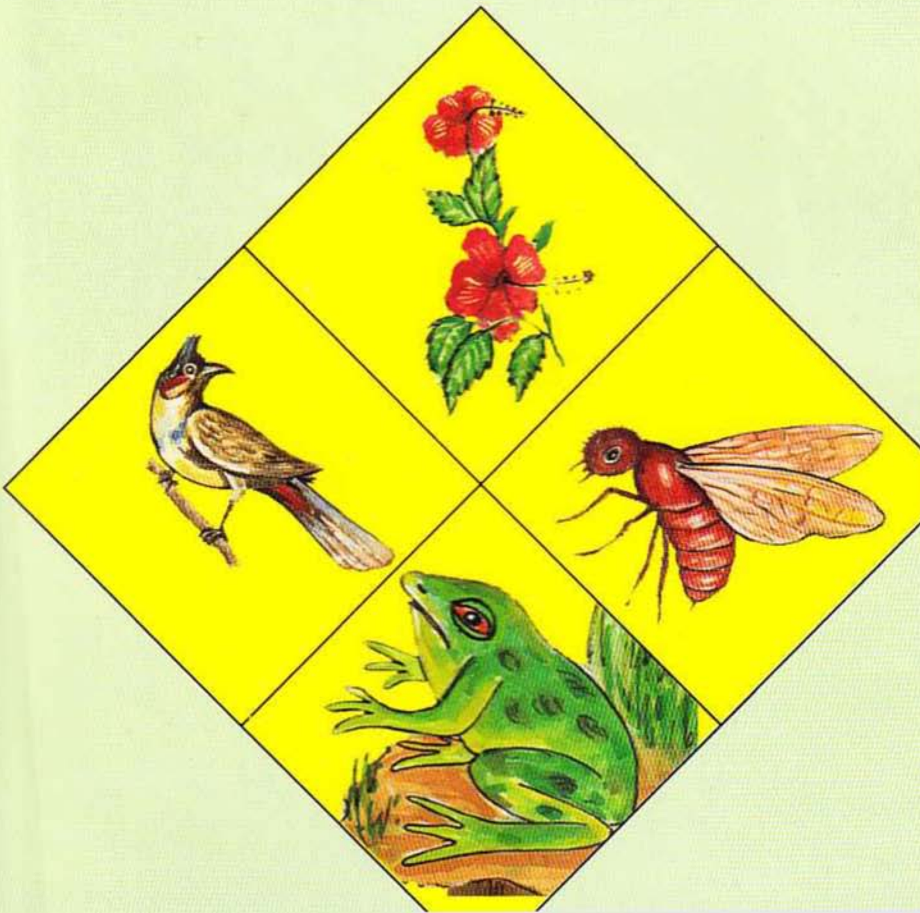

বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী

ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা

[ডি. এস-সি. (লন্ডন); ডি. আই. সি. (লন্ডন); পি. আর. এস;
মোয়াত্ মেডালিস্ট; এম. এস-সি.; গোল্ড মেডালিস্ট]

"বিশ্বপ্রভু (জ্ঞানের রাজা)
দান করে যান ইচ্ছামত
সেই সে পরমকল্যাণীয়,
জ্ঞানভারে যে হ'ল নত।"
—পবিত্র কোরান

"ধ্যানই হ'ল বিশ্বমাঝে
সুপবিত্র সবার চেয়ে
জ্ঞানীর ইহাই কাম্য প্রেয়
চায় সে হ'তে ধ্যানের নেয়ে।"
—উপনিষদ

পত্রুয়া

বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী

ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা

গ্রন্থস্বত্ব	লেখক
প্রথমপ্রকাশ	১৯৩৯
পড়ুয়া সংস্করণ	শ্রাবণ, ১৪১১/জুলাই, ২০০৪
প্রকাশক	কবির আহমেদ পড়ুয়া, ৪৫ আজিজ সুপার মার্কেট (নিচতলা) শাহবাগ ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ৮৬২১৭৬৬
প্রচ্ছদ	আনওয়ার ফারুক
মূল্য	একশো টাকা
ISBN	984-8141-50-2

উৎসর্গ

জীবনপ্রভাতে যে মহান চরিত্রের উন্নত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া,
যাঁহার আদেশক্রমে বিজ্ঞান সাধনায় রত হই,
সেই মহর্ষি, দেবোপম, পিতৃদেব মরহুম
ও মগফুরের পবিত্র চরণোদ্দেশ্যে
এই ক্ষুদ্র পুস্তক উৎসর্গ
করিলাম।

ভূমিকা

শিক্ষার সম্পূর্ণতা ততদিন হইতে পারে না, যতদিন সে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা না হয়। আমাদের অন্যান্য শিক্ষা মাতৃভাষার মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইলেও, এতদিন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার সুযোগ হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয় মাতৃভাষার মধ্য দিয়া সুসম্পন্ন করিতে নির্দেশ দিয়া দেশের যে প্রভূত কল্যাণ এবং জাতির যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়, এই জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার সুযোগ তো পাওয়া গেল। কিন্তু বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাববশতঃ এই কার্য দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। সকল কথার বাংলা প্রতিশব্দ প্রস্তুত করা সম্ভবপর নহে, পাশ্চাত্য দেশেও দেখা গিয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিভিন্ন দেশে প্রায়ই অনুরূপ। এই সকল কথার প্রতিশব্দ নানা দেশে নানারূপ হইলে পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্রের একান্ত অভাব ঘটে। ইহা বাঞ্ছিত নহে বলিয়া ইংরাজ, ফরাসী, জার্মানী, ইটালী এমনকি জাপানও মূল ল্যাটিন শব্দই ব্যবহার করিয়াছে। আমরা ইতিমধ্যে অনেক ইংরাজী, আরবী, ফরাসী ও ল্যাটিন শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছি। এখনও যদি এই নূতন কথাগুলি আমরা নিজস্ব করিয়া লই, তাহা হইলে আমাদের ভাষার সমৃদ্ধিই বাড়িবে। কষ্ট-কল্পিত অনুবাদ দ্বারা চলিত কথাগুলি অবোধ্য না করাই উচিত। এই কথা মনে রাখিয়াই এই পুস্তক প্রণয়ন কার্যে রত হইয়াছিলাম, এবং ইহার মধ্যে অনেক বিদেশী কথা বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনও কোনও জায়গায় পূর্বে ব্যবহৃত বাংলা প্রতিশব্দও ব্যবহার করিয়াছি। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'চলন্তিকা' অভিধান বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

ম্যাট্রিকিউলেশনে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির আলোচনা করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, আমাদের দেশের ছেলেদের মনে, বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির প্রাথমিক জ্ঞান দান করাই কর্তৃপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ঔৎসুক্য জাগানোই এখন যথেষ্ট নহে, কারণ সে কার্য ইতঃপূর্বে নিম্নতর শ্রেণীতে সম্পন্ন হইয়াছে। এ সময় তাহাদিগকে সকল বিষয় সম্বন্ধে একটু বিশদতর পরিচয় দেওয়াই দরকার। পরীক্ষণীয় বিষয় যাহাই হউক, শিক্ষার মানদণ্ড একটু উচ্চ না হইলে বালক-বালিকাদের মনের উপর সকল বিষয়ের ছাপ তেমনভাবে পড়িবে না। এই কথা স্মরণ রাখিয়াই আলোচ্য বিষয়গুলির একটু বিশদ বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি, ইহার দ্বারা আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবে। হয়তো কর্তৃপক্ষের কেহ কেহ মনে করিবেন যে, কোনও কোনও বিষয়ের এত বিস্তৃত বিবরণ না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহাদিগের নিকট আমার নিবেদন এই যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার নামে আমরা ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার জন্য শিশুপাঠ্যের প্রণয়ন করিয়া যেন শিক্ষা-বোর্ডের উদ্দেশ্য পণ্ড না করি। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যেরূপ ধার্য হইয়াছে, তাহাতে ছাত্রদিগের প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান দিবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষা-তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে মনে হয়। আমরা যেন শিক্ষার মানদণ্ড নামাইয়া আমাদের আদর্শকে খাটো না করি।

শিক্ষণীয় বিষয়গুলি এই পুস্তকে যেভাবে সাজান হইয়াছে আমার মনে হয়, উহাই স্বাভাবিক উপায়। পৃথিবী, যাবতীয় নক্ষত্রের ন্যায় নিজেও একদিন কোনও নীহারিকার অন্তর্গত ছিল; তাহার পর এক শুভদিনে উহার আবির্ভাব ঘটে। সেই অগ্নিময় পদার্থ, ক্রমে শীতল হইলে উহার মধ্যে পাহাড়, পর্বত, পাদপ ও প্রাণীর উদ্ভব হয়। মানব ইহার পরে জন্মলাভ করিয়াছিল। তাহারও বহুকাল পরে পদার্থবিদ এবং রাসায়নিকের গবেষণা শুরু হয়। এই স্বাভাবিক ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পুস্তকের বিভিন্ন বিষয়গুলি সাজাইয়াছি। অবশ্য ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থায়, স্থান-বিশেষের সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষকগণ যে কোনও বিষয়ই প্রথমে পড়াইতে পারেন সে বিষয়ে কোনও অসুবিধা হইবে না, আশা করা যায়। পাঠক-পাঠিকার সুবিধার জন্য পুস্তকের শেষে পরিশিষ্টে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ, পুস্তক মধ্যে কতকগুলি আদর্শ প্রশ্ন ও গোড়াতেই ইহার মধ্যে ব্যবহৃত বিষয়সূচী দেওয়া হইয়াছে।

বিদেশে থাকিবার সময় নানাবিধ 'সাধারণ পাঠ্য' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, বাংলার তরুণ-তরুণীদিগকে এই বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির পরিচয় তাহাদিগের মাতৃভাষায় প্রদান করিব। বাংলায় যখন প্রথম প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি, তখন ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। আজ সেই উদ্দেশ্য, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের আকারে রূপান্তরিত হইল। ইহার মধ্যে বিজ্ঞানের সবগুলি প্রয়োজনীয় শাখার আলোচনা করা হইয়াছে। নিজের সীমাবদ্ধ শক্তি ও ততোধিক সীমাবদ্ধ জ্ঞান এ বিষয়ে আমাকে কতদূর কৃতকার্য করিয়াছে জানি না, তবে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগের কাছে যদি ইহার আদর হয়, তাহা হইলেই আমি সুখী হইব।

পুস্তকটি যতদূর সম্ভব ভুল-ভ্রান্তি-শূন্য করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি কোথাও কোনও ভ্রম প্রমাদ রহিয়া থাকে, সুধীজন এবং সহৃদয় বন্ধুবর্গের নিকট হইতে সে বিষয়ে উপদেশ পাইলে পরবর্তী সংস্করণে সে সকল নিশ্চয়ই সংশোধন করা হইবে।

এই পুস্তক প্রণয়ন কার্যে বহু ইংরাজী ও বাংলা পুস্তকের সাহায্য লইতে হইয়াছে। ঐ সমস্ত পুস্তকের গ্রন্থকারদিগের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী এবং তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই স্থানে আরও দুইএকটি কথা না বলিলে আমার বক্তব্য বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিবে। আমার বাংলা লিখার আরম্ভ হইতে বরাবর উৎসাহ দান করিয়া যিনি আজ এই পুস্তক প্রণয়নে প্রধান উদ্যোগী পুরুষ, সেই শ্রদ্ধেয় মৌলবী মঈনউদ্দীন হোসয়ন সাহেবকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নব-বাংলার উদীয়মান শিল্পী, গভর্নমেন্ট শিল্প বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বন্ধুবর আবদুল মঈন যেরূপ যত্ন ও তৎপরতার সহিত ইহার ব্লক নির্মাণের সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। অকালে তাঁহার মৃত্যু পূর্ববাংলাকে এক শক্তিশালী শিল্পীর খেদমত হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। আল্লাহ তাঁহার রুহকে মাগফেরাত দিন—প্রার্থনা করি।

ঢাকা হইতে ইহার প্রকাশ এই প্রথম। আশা করি, পুস্তকখানি এখানেও তেমনি সমাদর লাভ করিবে, যেমন ইহার পূর্ববর্তী সংস্করণগুলি পাইয়াছে।

ঢাকা, জানুয়ারী, ১৯৫৫ — মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা

প্রসঙ্গ কথা

উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা প্রণীত "বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী" বইটি প্রকাশ করতে পারায় আমরা আনন্দিত।

বইটির ৩য় সংস্করণ ১৯৩৯ সালে মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা থেকে এবং ১৯৫৫ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পাক ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ঢাকা থেকে দ্বাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বিপুল পাঠপ্রিয়তার কারণে "বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী" বইটি হিন্দি, উর্দু ও অসমীয়া ভাষায়ও অনূদিত হয়েছিল।

অর্ধশতাব্দী পর উপমহাদেশের প্রখ্যাত জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা প্রণীত "বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী"-র ত্রয়োদশ সংস্করণ প্রকাশিত হল।

প্রাঞ্জল সাধু ভাষায় রচিত এই বিজ্ঞানবিষয়ক বইটির পাঠোপযোগিতা আজ অবধি হ্রাস পায়নি।

ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদার মহৎ উদ্যোগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য "বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী" বইটি দুই খণ্ডে পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞান চর্চায় এই বইটি বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক প্রণয়নে আগ্রহীদের অনুপ্রাণিত করবে বলে আমরা আশা করি।

প্রকাশক

বিষয়-সূচি

প্রথম পর্ব

সজ্জি জগৎ

পাদপ-কণার কথা, ১৩; গাছ, ১৭; সূর্যমুখীর জীবন-কথা, ৩৪; ধান, ৩৮; মটর, ৪৩।

দ্বিতীয় পর্ব

জীব-জীবন

জীবনের আবির্ভাব, ৪৭; কেঁচো, ৫১; মৎস্য, ৫৩; সহনশীলতা, ৫৭; পতঙ্গ, ৫৯; রেশমের মথ, ৬৪, মৌমাছি, ৬৬; পিপীলিকা, ৬৯; মশা, ৭১; মাকড়সা, ৭৪; ব্যাঙ-এর কথা, ৭৬; প্রাণী এবং উদ্ভিদের পরস্পর সম্বন্ধ, ৮১।

তৃতীয় পর্ব

নরদেহের ইতিকথা

মানবদেহের পরিচয়, ৮৩; খাদ্য এবং উহার ক্রমপরিবর্তন, ৮৮; শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া, ৯৪; রক্তবাহী চক্র, ৯৭; স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য, ১০২; মলবাহী যন্ত্র ১০৬; রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার, ১০৯।

বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পর্ব

সজি জগৎ

“বিটপির ঐ শ্যামল পাতা
দেখলে নিয়ে জ্ঞানীর চোখ,
মনে হবে এক গ্রন্থভারী;
যেন তাহার প্রতি ওরোক
কী দিচ্ছে শিক্ষা ভগবানের
রহস্যময় তত্ত্ব জ্ঞানের!”

—সা'দী।

পাদপ-কণার কথা

জীবন কি?

জীবন কি এবং ইহার আবির্ভাব কিরূপে হইয়াছিল, সে কথা সম্পূর্ণরূপে জানা নাই। তবে জীবিত পদার্থ সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, জীবের বিশেষ গুণগুলি এইরূপে প্রকাশ করা যায় — জীব এবং জড়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, জীবমাত্রেই আহার্য গ্রহণ করে এবং উহা পরিপাক করিবার ক্ষমতা রাখে; কিন্তু জড় পদার্থ এই শক্তি হইতে বঞ্চিত। খাদ্য গ্রহণের ফলে জীবদেহ পরিপুষ্ট হয়, তাহার দেহের যে ক্ষয় প্রতিনিয়ত সাধিত হইতেছে তাহাও পূর্ণ হইয়া উঠে। জীবমাত্রেরই দেহ হইতে কতকগুলি পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে। এইগুলি জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, এবং দেহের আবর্জনাস্বরূপ উহা পরিত্যাগ করা হয়। প্রাণীমাত্রেই আরও একটি বিশেষ গুণের অধিকারী যে, সে নিজের বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে অর্থাৎ নিজের অনুরূপ জীব সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাখে। জীবমাত্রেই নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে। অবস্থার পরিবর্তন হইলেও নিজেকে এই পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চালাইয়া লইতে পারে। জীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উত্তেজনায় জীবিত পদার্থ সাড়া দিয়া থাকে।

সজ্জিকণা (Unicellular plant) ও প্রাণীকণা (Amoeba)

জীবদেহের আলোচনা করিতে গিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারূপ পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু সৃষ্টির আরম্ভ কিরূপে হইল তাহা সন্ধান করিতে গিয়া মানব একদিন আবিষ্কার করিল যে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার পরিকল্পনা করা হয় অণু এবং পরমাণু দিয়া। জীবদেহের বিশ্লেষণ ফলেও সেইরূপ এক ক্ষুদ্রতম জীবিত কণা পাওয়া যায়, তাহা একটি জেলি সদৃশ পদার্থ দ্বারা নির্মিত ও তাহা প্রটোপ্লাজম নামে পরিচিত। ভূ-তত্ত্ববিদ পৃথিবীর ক্রমপরিবর্তন এবং জীবনের আবির্ভাব সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেও তাঁহার লিখিত ইতিহাস হইতে এই প্রটোপ্লাজম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। দেখা যায় যে, এই ক্ষদ্রতম জীবকণাগুলি উল্লিখিত জীবমাত্রের বিশেষ গুণগুলির অধিকারী। এইরূপ জীবকণা প্রাণী এবং সজ্জি-জগতের উভয়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বৈজ্ঞানিক সজ্জি এবং প্রাণীর মধ্যে একটি যোগসূত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। উপরে ক্ষুদ্রতম সজ্জি-কণা এবং একটি সূক্ষ্মতম প্রাণীকণার চিত্র দিয়া ইহাদিগের সাদৃশ্য দেখান হইল।

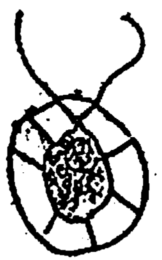

উদ্ভিদ কণা

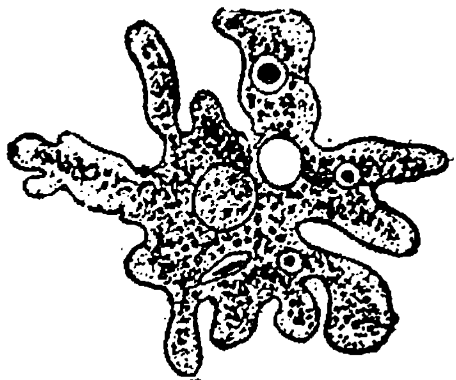

প্রাণী কণা

তোমরা পানি রাখিবার কোনও বৃহৎ পাত্রের তলদেশ কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কি? পর্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে, জলাধারের তলদেশে একরূপ অতিশয় পাতলা মসৃণ, সবুজ বর্ণের পদার্থ জমিয়া থাকে। পানির চৌবাচ্চায় এইরূপ পদার্থ জমিলে, তোমরা বলিয়া থাক যে ছ্যাৎলা জমিয়াছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই সবুজ পদার্থটি বর্তুলাকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। ইহাই সাধারণতঃ সজ্জিকণা সদৃশ এক-সেলী উদ্ভিদ বা আলগি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উপরে ইহার চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমান বিজ্ঞানীরা বলিতেছেন যে, ভবিষ্যতে এই এক-সেলী আলগি হইতে মানুষের খাদ্য প্রস্তুত হইবে, কারণ ইহার মধ্যে প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ ও শ্বেতসারের সহিত ভিটামিনও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

হিমাটোকক্কাস ঐরূপ আর একটি পাদপ-কণিকা। এই কণিকাগুলি চারিটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। একটি আবেষ্টনী পদার্থ বা সেল-ওয়ালের মধ্যদেশে একরূপ

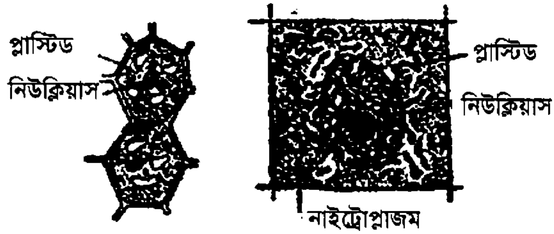

সজিকণার সমাবেশ

লালাসদৃশ পদার্থ বর্তমান। উহাই প্রটোপ্লাজম নামে পরিচিত। এই প্রটোপ্লাজমের মধ্যে যে গোলাকার ক্ষুদ্র একটি অংশ রহিয়াছে উহাই নিউক্লিয়াস এবং তাহার চতুর্দিকে যে গাঢ়তর লালা সদৃশ পদার্থ থাকে তাহার মধ্যে ঈষৎ হরিৎ বর্ণের ক্লোরোফিল মিশ্রিত রহিয়াছে, ইহাই ক্লোরোপ্লাস্ট নামে অভিহিত। এইরূপ একটি ক্ষুদ্র কণিকার দ্বারা প্রস্তুত পাদপকে এক সেলের পাদপ বলা হয়। ইহাদিগকে জীবাণুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল পাদপ আমরা দেখিয়া থাকি, উহারা এইরূপ বহু সেলের সমন্বয়ে প্রস্তুত; এবং উহার মধ্যে প্রত্যেকটি সেলই নিজ নিজ নির্দিষ্ট কার্য করিয়া চলিয়াছে। বিরাট মহীরুহের প্রথম জন্ম হয় ক্ষুদ্র একটি কণিকা হইতে, এবং এই কণিকাই মেরিস্টেম্যাটিক সেল নামে পরিচিত। এই সেলগুলি ক্রমেই সংখ্যায় বাড়িয়া চলে। প্রত্যেক সেলের মধ্যেই পূর্ববর্ণিতরূপ গাঢ় কেন্দ্রীয় পদার্থ বর্তমান। ইহাই নিউক্লিয়াস নামে পরিচিত এবং ইহার ন্যায় আরও কতকগুলি ক্ষুদ্রতর বিন্দু-সদৃশ প্লাস্টিড তথায় রহিয়াছে। সেলের অন্তর্নিহিত প্রটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম নামে পরিচিত। খালি চোখে এই সেলগুলি দেখা যায় না। অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই সেলের সকল অংশই পরীক্ষা করা সম্ভবপর। উপরের চিত্রে একস্থানে একটি ও তাহার পার্শ্বে দুইটি সেলের অন্তর ভাগ এবং তন্মধ্যে নিউক্লিয়াস দেখান হইয়াছে। বিভিন্ন বৃক্ষের সেলের আকার ভিন্নরূপ, তবে সেলের অভ্যন্তরভাগের ব্যবস্থা সর্বত্র প্রায় একরকম। এই সেলের মধ্যে কখনও কখনও অন্য পদার্থও দেখা যায়, কিন্তু ঐ সকল পদার্থ সেল হইতে নির্গত হইয়া বৃক্ষের রসদাগারে গিয়া জমিতে থাকে। ইহাই উদ্ভিদ জীবনের গোড়ার কথা। এইবার তোমাদিগকে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া ইহাদিগের প্রাথমিক কথা শেষ করিব।

উদ্ভিদকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি, প্রথম সপুষ্পক উদ্ভিদ (Phanerogam) ও দ্বিতীয় পুষ্পহীন বা অপুষ্পক উদ্ভিদ (Cryptogam)। এই উভয় শ্রেণীর উদ্ভিদই আমরা বহু সংখ্যায় দেখিতে পাই।

প্রথম শ্রেণীর সপুষ্পক উদ্ভিদগুলির সকলেই পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত হইয়া আমাদের আনন্দ বর্ধন করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ফুল পরে ফলে পরিণত হয় ও ফল দ্বারা তাহাদের বংশ-বিস্তার ঘটিয়া থাকে। জবা, দোপাটি, সূর্যমুখী প্রভৃতি ফুলগাছ যেমন এই শ্রেণীর অন্তর্গত, তেমনি আম, জাম, ডুমুর প্রভৃতিও ঐ একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অপুষ্পক উদ্ভিদের উদাহরণও তোমাদের অপরিচিত নহে। ব্যাঙের ছাতা, শেওলা, ফার্ণগাছ, শুশ্‌নি শাক, মস্ প্রভৃতি সবই অপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদের অন্তর্গত। আবার এই বিবিধ উদ্ভিদকে আরও কতকগুলি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন, সপুষ্পক উদ্ভিদের দুইটি শ্রেণী জিম্‌নোস্‌পার্ম ও এনজিওস্‌পার্ম। ইহাদিগকে যথাক্রমে নগ্নবীজ ও আবৃতবীজসম্পন্ন শ্রেণী বলিতে পারা যায়। এইরূপ নামকরণের প্রধান কারণ এই যে, এই শ্রেণীর গাছে বীজগুলি অনাবৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, যেমন পাইন গাছের বীজ। আবৃত বীজ, খোসায় ঢাকা থাকে, ইহারা আবার একবীজদলী ও দ্বি-বীজদলী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। কারণ ইহাদের কাহারও বীজ-মধ্যে মাত্র একটি দল বা দাল ও কাহারও মধ্যে দুইটি দাল বা দ্বি-বীজদল রহিয়াছে। এই সকল শ্রেণীর বিশদ বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ হইল।

অপুষ্পক উদ্ভিদকেও কতকগুলি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যেমন ফার্ণ জাতীয়, মস্ জাতীয় অথবা ব্যাঙের ছাতা জাতীয় উদ্ভিদ। ইহাদিগের সবিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তোমরা পরে এসব উদ্ভিদের পূর্ণতর তথ্য অবগত হইবে।

গাছ

দিকচক্রবালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই যে হরিতের শোভা নয়ন ও মনকে মুগ্ধ করে, তাহাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-কথা আমরা ভাবিয়া দেখি না। বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করে, পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া ফল-সম্ভারে সুসজ্জিত হয়। এই ফলের মধ্যে পাদপ-শিশু লুক্কায়িত থাকে; তাহারই সাহায্যে ইহারা স্বীয় বংশ-বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের জীবনে যে রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার কথা আমরা না ভাবিলেও উহার প্রতিটি অংশ হইতে আমরা উপকৃত হই। ইহাদের জীবন-কথার সাধারণ আলোচনা করিলে অনেক নূতন নূতন তথ্য জানিতে পারা যাইবে। বিশ্ব-স্রষ্টা তাঁহার নিপুণ হস্তের পরিচয়, এই বৃক্ষরাজির কার্যকলাপের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদিগের আলোচনায় তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম, ভক্তি এবং ভালবাসায় আমাদের মাথা স্বতঃই নত হইয়া যায়।

অঙ্কুর-উদ্‌গমন (Germination)

নিদাঘ দিনের নিদারুণ দুঃখের অবসান ঘটাইয়া হঠাৎ যে দিন বারিধারা শুষ্কভূমিকে সিক্ত করে, সে দিন যেমন চতুর্দিকে একটা শান্তি এবং সান্ত্বনার ভাব দেখা দেয়, মাটির নিচেও বিভিন্ন পাদপের বীজগুলি, তেমনই নূতন জলে স্নাত হইয়া, নব জীবনের আশায় চঞ্চল হইয়া উঠে। তোমরা বিভিন্ন বীজ লইয়া নিজেরা পরীক্ষা করিলেও তাহাদের এই নব জীবনের অপেক্ষায় বিপুল চাঞ্চল্যের পরিচয় পাইতে বিলম্ব ঘটিবে না। বিভিন্ন বীজে বিভিন্ন ভাবে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে।

অঙ্কুর উদ্গমন বদ্ধ জায়গায় পানি ও বাতাসের অভাবে হইতে পারে না। শুষ্ক স্থানে বহুকাল বীজ রাখিয়া তাহা দেখা যায়। মৃত্তিকার মধ্যে কেবল পানি ও বাতাস নহে, পরন্তু অল্পাধিক তাপেরও প্রয়োজন হয় অঙ্কুর নির্গমনের সময়। অতিশয় ঠাণ্ডা জায়গায় সহজে বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গমন হয় না। এই ব্যাপারটি একটি পরীক্ষায় সহজে প্রমাণিত হইতে পারে। একটি গ্লাস অর্ধেক পানি দ্বারা পূর্ণ করিয়া উহাতে একটি চ্যাপ্টা কাঠের টুকরা অর্ধেক ডুবাইয়া রাখ। ইহার উপরিভাগে একটি, পানির সঙ্গমস্থানে একটি ও পানিতে নিমজ্জিত অংশে আর একটি ছোলার দানা বাঁধিয়া উহাকে একটি অল্প গরম জায়গায় রাখিয়া দাও। দু-তিনদিন পরে দেখিতে পাইবে যে, পানির বাহিরের দানাটি অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। পানির সঙ্গমস্থানের দ্বিতীয় দানাটিতে অঙ্কুর উদ্গমন হইয়া শিশু-পাদপ জন্মাইয়াছে, কিন্তু পানির নিচে পানিমজ্জিত দানাটি ফুলিয়া উঠিয়া অঙ্কুরের উন্মেষ দেখাইলেও উহা হইতে অঙ্কুর উদ্গমন হয় নাই, প্রথম দানাটিতে পানির পরিপূর্ণ অভাব এবং তৃতীয়টিতে বাতাসের অভাবের জন্য অঙ্কুর উদ্গমন হইতে পারে নাই।

গম অথবা ভুট্টার একটি দানা সিক্ত হইলে উহার মধ্য হইতে প্রধান মূল নির্গত হইয়া মাটির দিকে ধাবিত হয় এবং পরে সেই একই স্থান হইতে ঊর্ধ্ব মুখে পাদপ-শিশুর প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান মূলের জন্মস্থান হইতে বহু সংখ্যক শাখা শিকড় (Secondary roots) সূক্ষ্ম সূত্রের আকারে নির্গত হইয়া মৃত্তিকাকে আঁকড়াইয়া ধরে, এবং পাদপ-শিশু ঊর্ধ্বমুখে বাড়িয়া ক্রমে নূতন নূতন পাতা ছড়াইতে আরম্ভ করে। এইরূপ মূলই গুচ্ছমূল নামে পরিচিত।

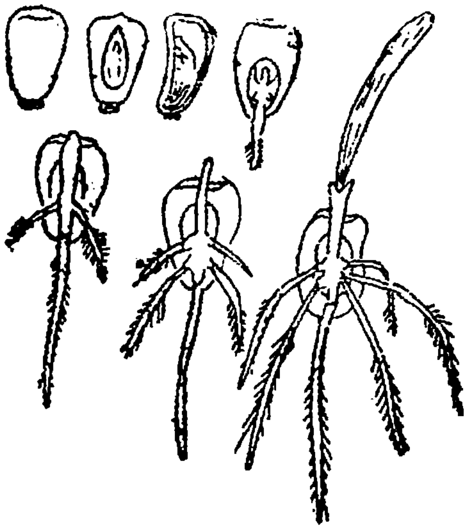

ভুট্টা শিশুর জন্মদান

মূলের পরিচয়

এই মূল লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে, উহাকে প্রধানতঃ দুই অংশে ভাগ করা যায় প্রথমটিকে মূল শিকড় বা রেডিকেল বলা হয়, উহাই ভূমির মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু পরে উহা নষ্ট হইয়া যায় এবং উহার উৎপত্তিস্থান হইতে আরও কতকগুলি শিকড় বাহির হইয়া গুচ্ছমূলের সৃষ্টি করে। একবীজদলী উদ্ভিদের মূল এই রূপেই হইয়া থাকে। মূলের প্রান্তভাগে অপেক্ষাকৃত শক্ত একটি টুপির ন্যায় আবরণ বর্তমান, উহাই মূলত্র (Root cap) নামে পরিচিত। এই মূলত্রের পরই কতকগুলি সূক্ষ্ম লোম রহিয়াছে উহাই মূলরোম (Root hair), ইহারাই মাটি হইতে রস গ্রহণ করিতে গাছকে সহায়তা করে।

একটি ভুট্টার বীজ ভিজাইয়া মাঝামাঝি কাটিলে উহার প্রান্তদেশে ভ্রূণ অবস্থায় এই রেডিকেলকে দেখা যাইবে। রেডিকেল-এর উপরিভাগে যে নিদ্রিত পাদপ-শিশুর শীর্ষদেশ দেখা যাইতেছে, উহাকে প্লুমিউল বলে। উহাই বাহিরে আসিয়া ঊর্ধ্বমুখে ধাবিত হয়, এবং অল্পকাল পরে উহারই মধ্য হইতে পাতাগুলি নির্গত হইয়া থাকে।

শৈশব অবস্থায় এই পাদপ-শিশুকে আহার যোগাইবার জন্য বীজমধ্যে যথেষ্ট খাদ্য-বস্তু শ্বেতসাররূপে আহৃত হইয়া মজুত থাকে। ঐ অংশ মানবের খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়। প্রথমাবস্থায় পাদপ-শিশু বাহির হইতে খাদ্য আহরণ করিতে পারে না

বলিয়াই, বীজের মধ্যে উহার আহার সঞ্চিত রাখিতে হয়। পরে কিন্তু শিকড়ের সাহায্যে উহারা মাটি হইতে পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত নাইট্রোজেন ও চুন জাতীয় পদার্থ এবং ফসফেট প্রভৃতি আহরণ করে।

ভুট্টা ও উহার পরিণত গাছ

পূর্বে একবীজদলী গাছের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি দ্বি-বীজদলী উদ্ভিদের মূল তাহা হইতে একটু ভিন্ন। এই শ্রেণীর উদ্ভিদের মূলের প্রধান অংশ একবীজদলী গাছের ন্যায় নষ্ট হয় না, পরন্তু প্রধান মূলরূপে বর্তমান থাকে ও উহার দেহ হইতে শাখামূলগুলি নির্গত হইয়া ক্রমে বিস্তৃত হয় এবং উহাদের প্রত্যেকের শীর্ষদেশে মূলত্র ও তাহার পাশেই মূলরোম বর্তমান। পার্শ্বে একটি গাছের মূল্যের মধ্যে এই সকল অংশ দেখান হইয়াছে।

আকৃতিভেদে মূল তিন প্রকার — যথা, মূলাকৃতি (Fusiform) মূল। ইহা দেখিতে মূলার ন্যায়, মধ্যদেশ অল্প মোটা কিন্তু প্রান্তদেশ অপেক্ষাকৃত সরু। দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল কোণাকার (Conical) বা গাজরাকৃতিবিশিষ্ট। ইহার উপরদিক মোটা ও চওড়া, কিন্তু নিম্নদেশ ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর মূল শালগমাকৃতিবিশিষ্ট (Napiform)। ইহারা দেখিতে গোলাকার ও নিম্নদেশ সরু। পর পৃষ্ঠায় এইগুলির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম প্রকৃত মূল (True root)। ইহাই বীজদণ্ডের গোড়া হইতে উৎপন্ন হয়; দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল অস্থানীয় বা অস্থানিক মূল (Adventitious root)। এইরূপ মূল কখনও কাণ্ড হইতে, যেমন বটের ঝুরিমূল, কখনও বা পাতা হইতে, যেমন পাথরকুচির পাতা হইতে নির্গত মূল — বাহির হইয়া থাকে। অস্থানিক মূলও কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা বটগাছের স্তম্ভমূল (Prop root)। ইহারা প্রথমে শাখা হইতে নির্গত হয়, পরে মাটিতে প্রবেশ করে ও ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকে। কেয়া গাছের ঠেশ মূলগুলি (Stilt root) গাছের কাণ্ড হইতে নির্গত হইয়া মাটিতে প্রবেশ করে ও গাছকে সোজা দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহায্য করে। পান প্রভৃতি গাছের আরোহী মূল (Climbing root) লতার গাঁইট হইতে নির্গত হয় ও অন্য গাছকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া উপরে আরোহণ করে। গুলঞ্চ লতা, রাস্না প্রভৃতি গাছ বায়বীয় মূলের (Aerial root) সাহায্যে আশ্রয়-বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরে ও ইহাদের সাহায্যে তাহারা বাতাস হইতে খাদ্য-বস্তু গ্রহণ করিতে পারে। স্বর্ণলতার মূল কিন্তু

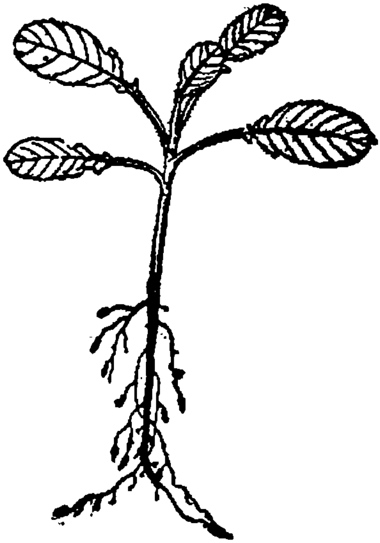

মূল, মূলত্র মূলরোম

শোষকমূল (Haustoria); ইহারা অন্য গাছ হইতে আহার্যবস্তু শোষণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত সুন্দরী প্রভৃতি গাছের শিকড় হইতেও একরূপ মূল বাহির হয়, তাহার সাহায্যে উহারা বাতাস গ্রহণ করে। এইজন্য এগুলিকে নাসিকা মূল (Breathing root) বলা হয়।

মূলের কার্য (Functions of the root)

মূলের সাহায্যে গাছ মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে — আবার ইহারই সাহায্যে মাটি হইতে পানি এবং অন্যান্য আহার্য গ্রহণ করে। কেহ বা মূলের সাহায্যে নিজ দেহ-পুষ্টির জন্য অন্য বৃক্ষ হইতে খাদ্য আহরণ করে। যেমন স্বর্ণলতা। ইহারাই পরগাছা (Parasite) বলিয়া কথিত হয়। আবার কেহ বা আশ্রয়-গাছকে জড়াইয়া ধরিয়াই আনন্দ লাভ করে। এইরূপ আশ্রয় না পাইলে উহারা ঝড়ে উড়িয়া যাইত।

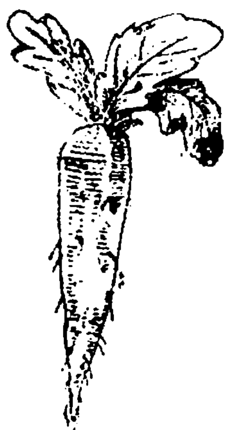

মূলা

গাজর

শালগম

বটের স্তম্ভমূল

মূল দ্বারাই গাছ মাটি হইতে তরল সার গ্রহণ করে। এই কার্যটি অতিশয় চমৎকার, কিন্তু তোমাদিগকে উহা বিশদভাবে বুঝান এখন সম্ভব নয়। এমন কতকগুলি পদার্থ আছে যাহাদের সাহায্যে জলীয় দ্রবণ হইতে লবণ জাতীয় পদার্থ উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ প্রবেশ-কার্যে যে সকল ব্যাপার সাহায্য করিয়া থাকে তাহা এখানে বিবৃত করিলে তোমরা হয়তো সব বুঝিবে না। মোটের উপর জানিয়া রাখ যে, উদ্ভিদের মূলও ঐ জাতীয় পদার্থ দ্বারা নির্মিত বলিয়া জলীয় দ্রবণ হইতে লবণ জাতীয় পদার্থ উহার মধ্যে দিয়া পানির সহিত প্রবেশ করে। এই কার্যই অস্‌মোসিস (Osmosis) নামে পরিচিত।

প্রাণীদেহে যেমন পাকাশয়, অন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্র রহিয়াছে, উদ্ভিদ-দেহে সেরূপ কিছু নাই। এই মূলের সাহায্যে যে পদার্থ উদ্ভিদ-দেহে প্রবিষ্ট হয় তাহাই পাতার সাহায্যে প্রাপ্ত অন্য পদার্থ সহযোগে উদ্ভিদ-দেহের পুষ্টি ঘটায়। হজমের বালাই নাই বলিয়া উদ্ভিদ ক্রমাগত খাদ্য গ্রহণ করে ও পুষ্টি লাভ করিতে থাকে। এইজন্যই অধিকতর সার দিলে উদ্ভিদ-দেহ সুন্দরতরভাবে গঠিত হয়। উদ্ভিদ সহজতর পদার্থ হইতে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করে, কিন্তু অন্য কোনও প্রাণীই সেরূপ করিতে পারে না। তাহারা এক পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করে মাত্র।

কতগুলি গাছ এমনও আছে, যাহারা মূলেই নিজের ভবিষ্যতের খাদ্য মজুত করিতে থাকে; যথা গাজর, শালগম, মূলা ইত্যাদি। পাতার সাহায্যেই গাছের মধ্যে শ্বেতসার (Starch) প্রস্তুত হইতেছে; অন্যান্য পদার্থও এই পাতার সাহায্যেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্বেতসার প্রস্তুত হওয়ামাত্র উহাকে প্রেরণ করা হয়, শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়া কাণ্ডের অন্তর ভাগে। এই স্থান হইতে কোনও কোনও গাছ উহাকে নিজের মূলের মধ্যে প্রেরণ করে, আবার কেহবা উহাকে ফল মধ্যে সঞ্চারিত করে। ফলের কথা পরে বলিব। মূলের কথাই এখন বলিয়া লই। লাল আলু ও শাঁক আলু তোমরা অনেকেই খাইয়াছ। এগুলি প্রকৃতপক্ষে মূলের স্ফীত অংশবিশেষ,— ইহা কন্দমূল নামে পরিচিত। সুতরাং বলিতে হয়, পাতায় প্রস্তুত খাদ্যবস্তু মূলে গিয়া এই সকল গাছে জমা হইয়া থাকে। এ পদার্থটি প্রকৃতপক্ষে শ্বেতসার। এরোরুট, তিখুর প্রভৃতিও এই জাতীয় পদার্থ। উহাদের মধ্যেও পত্র-প্রেরিত শ্বেতসারই সওগাত স্বরূপ জমা হইয়াছে। মূলা, গাজর এবং বীটও এই জাতীয় সব্জি — প্রভেদ এই যে, ইহাদিগের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পানিও শ্বেতসারের সহিত বর্তমান। গাজর এবং বীট কিন্তু খাইতে অতিশয় মিষ্ট, উহার মধ্যে চিনি রহিয়াছে যথেষ্ট। এই চিনি আসলে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ। ইহার পরিচয় তোমরা পরে পাইবে। ইক্ষু গাছই আমাদের দেশে চিনি প্রস্তুতকল্পে ব্যবহৃত হয়; এখানে কিন্তু গাছের প্রস্তুতকৃত খাদ্য-পদার্থ জমাইবার আলাদা ব্যবস্থা

আছে। এখানে কাণ্ডের মধ্যে প্রচুর পানির সহিত তাহার সুমিষ্ট শর্করা সম্ভার জমিয়া থাকে। গাছের কাণ্ড অবশ্য প্রধানতঃ উহার পাতাগুলিকে প্রচুর বাতাস ও আলোকের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া রাখে। তবে ইহার মধ্যে এই খাদ্যবস্তু সঞ্চিত করিয়া রাখাও গাছের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। গম, ধান, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষে এইরূপ খাদ্যবস্তু সঞ্চিত হয় ফলের মধ্যে।

কাণ্ড ও তাহার প্রয়োজনীয়তা

বীজ হইতে যখন উদ্ভিদ-শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন উহার একভাগ মাটির মধ্যে চলিয়া যায়, উহাই মূল নামে পরিচিত এবং উহার অন্য ভাগ মাটির উপরে উঠিয়া আসে, এই অংশই কাণ্ড। গাছের কাণ্ড সাধারণতঃ মাটির উপরে থাকিলেও — মাটির নীচে থাকে এমন অনেক কাণ্ড তোমরা দেখিয়াছ; হয়তো তাহাদিগের সকলের সঠিক পরিচয় তোমাদের জানা নাই, সে কথা পরে আলোচনা করিব। বর্তমানে মাটির উপরে যে কাণ্ড উঠিয়া আসে তাহারই একটু পরিচয় দিব।

পর্ব্ব, পর্ব্বসন্ধি ও কক্ষমুকুল

ছোট গাছটি যখন ক্রমশঃ বড় হয়, তখন একটু যত্নের সঙ্গে উহাকে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে, কাণ্ড ক্রমশঃ যতই উপরে উঠে উহার পার্শ্বদেশ হইতে ততই পাতা ছড়াইতে থাকে। যে দণ্ডটির গায়ে এই পত্র-সমাবেশ — উহাই কাণ্ড। কাণ্ডের গাত্রে এক পত্র হইতে অন্য পত্র পর্যন্ত যে অংশটি বর্তমান তাহাই পর্ব বা পাব (internode) নামে পরিচিত। ভুট্টার গাছে ও ইক্ষু গাছে পর্বগুলি বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। এই পর্বের যে স্থান হইতে পত্র নির্গত হয় উহাই পর্ব-সন্ধি (Node) বা গাঁইট নামে পরিচিত। পর্ব-সন্ধি হইতে পত্র নির্গত হইলে দেখা যায়, সেই স্থানে একটি কোণাকার পদার্থ নির্গত হইতেছে, ইহাই পার্শ্বমুকুল বা কক্ষমুকুল (axillary bud) নামে পরিচিত। গাছের অগ্রভাগেও এইরূপ মুকুল নির্গত হয় — উহা অগ্রমুকুল (terminal bud) নামে পরিচিত। ক্রমাগত এই সকল নূতন মুকুল নির্গমনের ফলেই গাছ বাড়িয়া চলে। পর্ব-সন্ধি হইতে পাতার গোড়ায় যে মুকুল দেখা যায়, সময় সময় উহাই বড় হইয়া শাখায় পরিণত হয়।

বাঁশ গাছের পর্ব-সন্ধি পর্ব অপেক্ষা মোটা, তথা হইতে নূতন শাখা বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু ভুট্টা গাছের ঐরূপ কোনও শাখা নির্গত হয় না। তাল, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি গাছেও ঐ একই অবস্থা দেখা যায়। ইহাদিগের অগ্রমুকুলই (terminal bud) ক্রমাগত নির্গত হইতে থাকে।

কাণ্ড প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে একটি ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড ও অপরটি ভূমির উপরিভাগে স্থিত সাধারণ কাণ্ড। যে সকল কাণ্ড ভূমির উপরিভাগে দাঁড়াইয়া থাকে তাহারাও সচরাচর দ্বিবিধ ঃ একটি সোজা হইয়া মাথা তুলিয়া ভূমির উপর দণ্ডায়মান; কিন্তু অপরটি মাটিতে শয়ান অবস্থায় থাকে অথবা কোনও দীর্ঘ দণ্ডকে অবলম্বন করিয়া উপরে উঠে। এই শেষোক্ত শ্রেণী লতা (creeper) নামে পরিচিত। আম, কাঁঠাল, জামের গাছ সোজা মাথা তুলিয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু সিম, পুঁই, কুমড়া, শশা প্রভৃতি গাছ কোনও অবলম্বন না পাইলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। ইহাদের কাণ্ড দুর্বল। সিমের ন্যায় কেহ বা উপরে উঠিবার সময় অবলম্বন-দণ্ডকে জড়াইয়া জড়াইয়া উপরে উঠে, কেহ বা কুমড়া বা শশার ন্যায় একরূপ সূতা সদৃশ রূপান্তরিত শাখার সাহায্যে, অবলম্বন-দণ্ডকে জড়াইয়া কাণ্ড বিস্তার করিয়া চলে। এই সূতার ন্যায় শাখাগুলি আকর্ষ (tendril) নামে পরিচিত। ইহারা পর্বসন্ধি হইতেই নির্গত হয়, কিন্তু শাখার ন্যায় গঠিত না হইয়া রূপান্তর গ্রহণ করে।

আকর্ষ ও রূপান্তরিত শাখা

কোথাও বা দেখিতে পাওয়া যায়, এই কাণ্ডগুলিই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া কখনও কাঁটায় (thorn) পরিণত হয় যেমন বৈঁচি প্রভৃতি গাছে দেখা যায়। আবার কোথাও বা কাণ্ড চ্যাপটা হইয়া পাতার ন্যায় সবুজবর্ণবিশিষ্ট হয়, যেমন ফণিমনসা বা ত্রিশিরা মনসার গাছে দেখা যায়। ইহারাই ফলক-কাণ্ড (phylloclades)-সম্পন্ন গাছ।

ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডও একরূপ নহে। উহাদিগের মধ্যেও কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শল্ক-কন্দ (turnicated Bulb) যেমন, পেঁয়াজ, অথবা লিলি ফুলের কন্দ (scaly bulb), আলুর ন্যায় স্ফীত কন্দ (tuber), মান ও ওলের ন্যায় গুঁড়ি কন্দ (corm), আদার ন্যায় মূলাকার কাণ্ড (rhizome) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূলাকার কাণ্ডের পর্বগুলি সাধারণতঃ একরূপ শল্ক-পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে ও ইহাদিগের পর্ব-সন্ধি হইতে অস্থানিক মূল বাহির হইয়া থাকে। আলুর ন্যায় কন্দের দেহ হইতেও অস্থানিক মূল নির্গত হয়। ইহাদিগের গাত্র হইতে স্থানে স্থানে যে মুকুল নির্গত হয়, তাহাই সচরাচর চোখ বলিয়া পরিচিত -- ওলের গায়েও এইরূপ চোখ দেখা যায়, তথায় এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওল সদৃশ মনে হয়। শল্ক-কন্দের নিম্নভাগ হইতেই মূল নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল কন্দমধ্যেই গাছের আহৃত খাদ্য-দ্রব্য জমা করা থাকে ও তাহাই ইহাগিদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের আহার্য যোগাইয়া যায়।

কাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা গাছের পক্ষে কম নয়। মৃত্তিকা হইতে নিজ প্রয়োজনের জন্য পানি ও খনিজ দ্রব্য আহরণ করিয়া এই কাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সূক্ষ্মনালী পথে উহা পাতায় প্রেরণ করে। তথায় বাতাস হইতে অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ ও অম্লজান গ্রহণ করে এবং তাহাকে জৈব পদার্থে রূপান্তরিত করিয়া, পুনরায় কাণ্ডে ফিরাইয়া আনিয়া, এই কাণ্ড-মধ্যে সে পাতায় প্রস্তুত খাদ্য-দ্রব্য জমা করে। কাণ্ডই পত্র ধারণ করে ও পল্লব সাহায্যে পত্ররাজিকে বিস্তৃত করিয়া প্রচুর বাতাস ও সূর্যালোকের সামনে বিস্তৃত করিয়া ধরে ও শত্রুর আক্রমণ হইতে উহাদের রক্ষা করিয়া থাকে। কাণ্ডের মধ্যে দ্বিবিধ সূক্ষ্ম নালী-পথ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের এক শ্রেণী মূলের আহৃত রস পাতায় পাঠাইয়া থাকে তাহারা জাইলেম (xylem) নামে অভিহিত; আবার অন্য শ্রেণী পাতায় প্রস্তুত দ্রব্য বৃক্ষদেহের সর্বত্র চালনা করিয়া থাকে, ইহারাই ফ্লোয়েম (floem)। সাধারণতঃ বাতাসের অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ পাতার সাহায্যে পরিবর্তিত হইলেও কোনও কোনও কাণ্ডে অবস্থিত ক্লোরোফিল কণাগুলিও এই কার্যে গাছের সহায়তা করিয়া থাকে, সে কথা পরে বলিতেছি।

মান

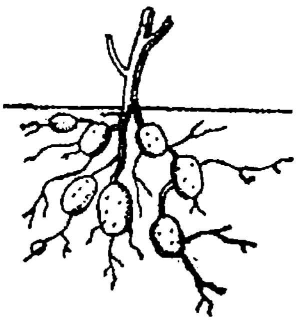
আলু

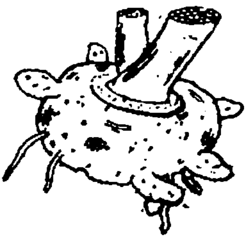
ওল

আদা

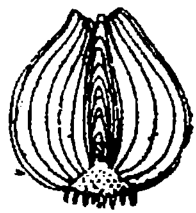
পেঁয়াজ

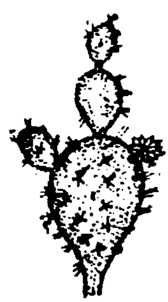
ফণিমনসা

এই সকল কার্য ব্যতীত, কাণ্ড সাহায্যে কোনও কোনও গাছের বংশ-বিস্তারও ঘটিয়া থাকে। আলু, ওল, মান, আদা প্রভৃতি গাছ কাণ্ডের অংশ হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নূতন আলুর গাছ এইরূপেই আলুর উপরের চোখ হইতে পত্র পল্লব বিস্তার করিয়া নূতন গাছ জন্মায় ও পরে তাহা হইতেই নূতন আলু উৎপন্ন হইয়া থাকে। তেমনি আবার আম, জামরুল প্রভৃতির ন্যায় গাছের কাণ্ড হইতে কলম করিয়াও নানা গাছের বংশ-বিস্তার ঘটান সম্ভব। আলু, আদা, পেঁয়াজ প্রভৃতির ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য জমান হয়।

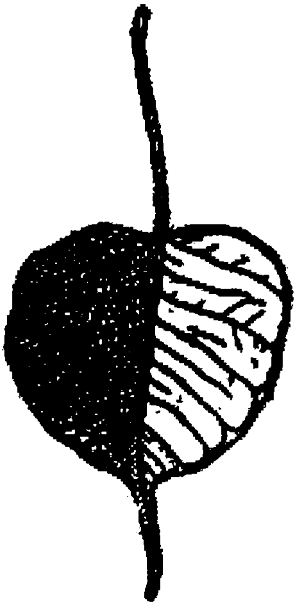

অশ্বত্থ পাতা

পাতার কার্য (function of a leaf)

গাছের সবুজের শোভা তাহার পাতার জন্য। কত রকম গাছ আমরা দেখিয়া থাকি, একটু লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারি যে, এই সব গাছের পাতা বিভিন্ন। এক মানুষকে যেমন অন্য মানুষ হইতে তাহার চেহারা দেখিয়া পৃথক করা যায়, তেমনি এক শ্রেণীর গাছকে অন্য শ্রেণীর গাছ হইতেও পাতার সাহায্যে পৃথক করা সম্ভব। পাতা এই জন্য বিভিন্নপ্রকার।

তবে মোটামুটিভাবে প্রত্যেক পাতাকে তিনটি অংশে ভাগ করা সম্ভব; যথা পাতার বেষ্টনী (leaf base), বৃন্ত (petiole) ও ফলক (blade)। পাতার যে অংশ কাণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকে তাহাই উহার বেষ্টনী বা গোড়া। ইহার প্রান্তবর্তী অপেক্ষাকৃত স্ফীত অংশকে পালভাইনাস (pulvinus) বলা হয়। বৃন্ত বা বোঁটা পাতার একটি অংশ হইলেও সব পাতাই সবৃন্তক নহে। ডানকুনি বা শিয়ালকাঁটার পাতা অবৃন্তক (sessile)। কিন্তু অশ্বত্থ, আম, জাম প্রভৃতির পাতা সবৃন্তক (petiolate)।

পাতার ফলকের আকার গাছ হিসাবে ভিন্ন। ধান গাছের পাতা দীর্ঘ বা লম্বাকৃতি (linear); কিন্তু আম অথবা জাম পাতা দেখিতে বল্লম ফলকের ন্যায়। এইজন্যই ইহারা বল্লমাকৃতি (lanceolate) ও কচুর পাতা হরতনাকৃতি (cordate), কিন্তু বটের পাতার আকার ডিম্বাকৃতি (ovate) অথচ পদ্মপত্র চক্রাকৃতি (rotund)। এইরূপে বিভিন্ন গাছের পাতার আকৃতি বিভিন্ন। পাতার প্রান্তদেশ অর্থাৎ ফলকের অগ্রভাগ

(apex) কাহারও দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। ইহারাই সূক্ষ্মাগ্র (acute) নামে অভিহিত হইতে পারে; যেমন আম, জাম, প্রভৃতির পাতা। পান, অশ্বত্থের পাতা প্রভৃতি দীর্ঘ শীর্ষবিশিষ্ট (acuminate); আবার খেজুর পাতার অগ্রভাগ সূচ সদৃশ, তাই ইহারা সূচ্যগ্র (mucionate); বিভিন্ন পাতার কিনারাও ভিন্ন ভিন্ন আকারের দেখিতে পাওয়া যায় — কাহারও কিনারা সমান, কেহ বা করাতের ন্যায় কাটা (serrate) কিনারাবিশিষ্ট, আবার কাহারও কাহারও কিনারা দেবদারুর পাতার মতো ঢেউ খেলান।

পান, আম, খেজুর, আনারস, কাঁঠাল প্রভৃতি পাতার আকৃতি যাহাই হইক না কেন, উহার মধ্যে শিরা-বিন্যাসে (venation) প্রকৃতির আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাতার মধ্যভাগ দিয়া কোথাও একটি বড় শিরা বা মধ্যশিরা (midrib) দেখা যায়, কোথাও বা একাধিক মধ্যশিরা বর্তমান। বাঁশ পাতার মধ্যশিরা একটি, কিন্তু তেজপাতায় ইহার সংখ্যা তিন। এই মধ্যশিরা হইতে উহার উভয়পার্শ্বেই অনেকগুলি শাখা-শিরা নির্গত হইয়া পাতার প্রান্ত পর্যন্ত গিয়াছে এবং এই শাখা-শিরা হইতে বহুসংখ্যক সূক্ষ্মতর উপশিরা (veinules) নির্গত হইয়া সমস্ত দেহ ছাইয়া রাখিয়াছে।

এই তো গেল পাতার আকৃতিগত পরিচয়। এখন পাতার শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিয়া উহাদের কার্যের পরিচয় দিব। পাতা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

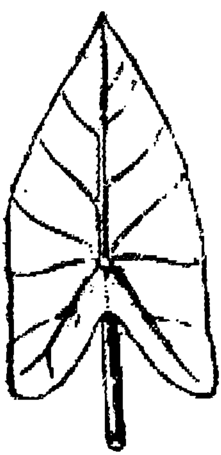

কচুপাতা

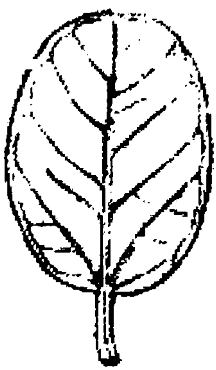

বটপাতা

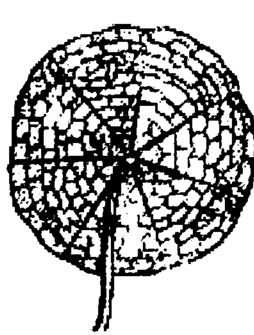

পদ্মপাতা

হইতে পারে। প্রথম মৌলিক (simple) পত্র; ইহাতে মাত্র একটি ফলক বিদ্যমান — যেমন আম, কাঁঠাল, অশ্বত্থ প্রভৃতির পাতা। দ্বিতীয় যৌগিক (compound) পত্র; ইহার মধ্যে বিভিন্নসংখ্যক ফলক বা অনুফলক বর্তমান; গোলাপ, বেল, শিমূল, মটর প্রভৃতির

পাতা যৌগিক শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদিগের মধ্যে গোলাপ পাতার পাঁচটি অথবা সাতটি ফলক, শিমূল পাতার সাতটি, কিন্তু বেল পাতার মাত্র তিনটি ফলক রহিয়াছে। এই ফলক-সজ্জা ব্যাপারেও একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে, কতকগুলি যৌগিকপত্রে

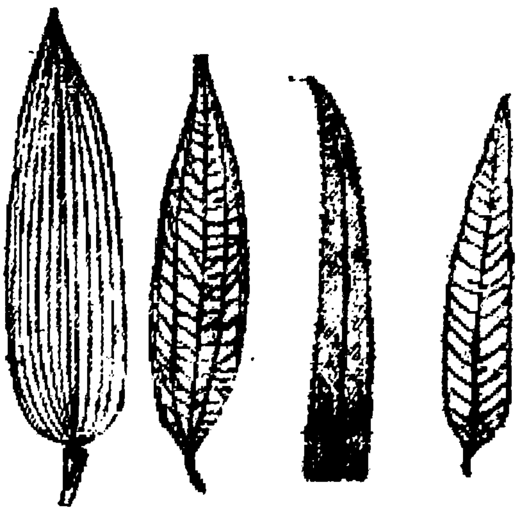

বাঁশপাতা তেজপাতা আনারস পাতা দেবদারু পাতা

অনুফলকগুলি (leaflets) একটি অক্ষরেখার (rachis) দুই দিকে পালকের ন্যায় সাজান থাকে। গোলাপের ন্যায় কোনও কোনও পাতার পুরোভাগে একটি মাত্র অনুফলক বর্তমান আবার তেঁতুলের ন্যায় যৌগিকপত্রে অনুফলকগুলি অক্ষের দুই পার্শ্বে সমান সংখ্যায় সংবদ্ধ রহিয়াছে। শিমূল প্রভৃতির পাতা যৌগিক, কিন্তু অনুফলকগুলি এখানে হাতের আঙ্গুলগুলির ন্যায় সাজান, এইজন্য ইহাদিগকে হস্তাকৃতি যৌগিক পত্র বলা হয়।

পাতার নীচের দিকে অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য ছিদ্র বর্তমান। ছিদ্রগুলি খালি চোখে দেখা না গেলেও, একটি পাতা ছিলিয়া অণুবীক্ষণ যোগে দেখিলে ইহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ইহারাই রন্ধ্র বা স্টোমা (stoma) নামে পরিচিত। স্টোমার দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র কোষ রহিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে পাতার সবুজকণা বা ক্লোরোফিল ও নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রকণা বর্তমান। সূর্যালোকের সাহায্যে এই রন্ধ্রের মুখগুলি খুলিয়া যায়, কিন্তু উহার পার্শ্বস্থিত কোষগুলি নিজ আয়তন প্রয়োজনমতো কমাইয়া রাখে, অথবা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেয়। এই রন্ধ্রপথের সাহায্যেই গাছের শ্বাসকার্য চলিয়া থাকে। পাতার এই রন্ধ্রপথ ছাড়া উদ্ভিদ-দেহের আরও অন্যান্য অংশ দ্বারাও এইরূপ শ্বাসকার্য সম্পাদিত হয়।

উদ্ভিদ শ্বাসকার্য (respiration) সম্পাদনের জন্য অনবরত বাতাস হইতে অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প গ্রহণ করে, ও নিজ দেহ হইতে অম্লজান বাষ্প পরিত্যাগ করে। এই কার্য দিবারাত্র উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন অংশ দ্বারা সম্পাদিত হয়। অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্পের কথা তোমরা পূর্বেই শুনিয়াছ। এই বাষ্পের ইহাই ধর্ম যে, পটাশ দ্রবণে উহা শোষিত হয়। একটি ফ্লাস্কে কতকগুলি ফুল রাখিলে, এই ফুলও শ্বাসকার্য চালাইতেছে বলিয়া ঐ পাত্র মধ্যে অবস্থিত অম্লজান বাষ্প ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্পে পরিণত হইতেছে। ফ্লাস্কটির মধ্যে পটাশ-দ্রবণ রাখিয়া উহাকে পারদের উপর উপুড় করিয়া রাখিলে ঐ পটাশ-দ্রবণ অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প ক্রমাগত শোষণ করিতে থাকিবে এবং যত অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ শোষিত হইবে ততই অম্লজান কমিয়া যাওয়ায় পারদও ক্রমে উপরে উঠিতে থাকিবে। এই পরীক্ষার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। এইজন্য বহুক্ষণ ধরিয়া এই পরীক্ষার-কার্য সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে।

উদ্ভিদের অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ আত্তীকরণ

প্রথমেই বলিয়াছি, উদ্ভিদের এই শ্বাসকার্য সর্বদাই চলিয়া থাকে; কিন্তু দিবাভাগে

গোলাপ গাছের যৌগিক পত্র জামের মৌলিক পাতা পাতার শিরা

যতক্ষণ সূর্যালোক আসিয়া পাতার উপর পড়িতে থাকে, ততক্ষণ এই আলোক-সহযোগে পত্র দ্বারা উদ্ভিদমাত্রই বাতাস হইতে অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প আহরণ করিয়া উহার অঙ্গার ভাগ গ্রহণ করতঃ অম্লজান পরিত্যাগ করে। উদ্ভিদ এইরূপে যে অঙ্গার গ্রহণ করে তাহাই পরিবর্তিত হইয়া শ্বেতসারে পরিণত হয়। উদ্ভিদ-দেহ হইতে যে শর্করা বা চিনি আহৃত হয় তাহা এইরূপেই প্রস্তুত হইয়াছে। চাউল, গম, আলু ইত্যাদির মধ্যে যে শ্বেতসার সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাও এইরূপে প্রস্তুত হইয়া উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন অংশে জমিতে থাকে। অঙ্গার-দ্বি-অম্লজের বিশ্লেষণের ফলে, এইরূপে উদ্ভিদের যে

অঙ্গার-গ্রহণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাই উহার আলোক-সংশ্লেষণ বা অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ আত্তীকরণ (photosynthesis or assimilation of carbon dioxide) বলিয়া পরিচিত। এই কার্য গাছের সবুজ অংশ বা ক্লোরোফিলের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। এই ব্যাপারটিও পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হইতে পারে। পানির মধ্যে যে জলজ উদ্ভিদ দেখা যায় উহা ঝাঁজিদাম নামে পরিচিত। জলপূর্ণ একটি পরীক্ষা-নলকে বীকারের ভিতর ফানেলের উপর জলমধ্যে দণ্ডায়মান রাখিয়া বীকারটি সূর্যালোকে রাখিলে ধীরে ধীরে অম্লজানের বুদ্বুদ উঠিয়া পরীক্ষা-নলের মধ্যে জমিতে থাকিবে। এই অম্লজান পানিতে দ্রবীভূত অঙ্গার-দ্বি-অম্লজের বিশ্লেষণ ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাই উদ্ভিদ হইতে বাতাসে আসিয়া যাবতীয় জীবের জন্য অম্লজান যোগায়।

প্রস্বেদন কার্য

উপরোক্ত দ্বিবিধ কার্য ব্যতীত পাতার সাহায্যে গাছ আরও একটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহা প্রস্বেদন (transpiration) কার্য বলিয়া পরিচিত। উদ্ভিদ মাটি হইতে প্রচুর পরিমাণে পানি গ্রহণ করিয়া থাকে। এই পানি সে পাতার মধ্য দিয়া পরিত্যাগ করে। ইহাই গাছের প্রস্বেদন কার্য। গাছের এইরূপ জলীয় অংশ ত্যাগ করা আমরা সর্বদা দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু পরীক্ষাযোগে ইহা প্রমাণিত হইতে পারে। যদি কোনও গাছের একটি পাতাপূর্ণ শাখা, একটি বড় মুখের শুষ্ক বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া কয়েক ঘণ্টা উহা দিবালোকের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বোতালের মধ্যে বিন্দু বিন্দু পানি জমিতে থাকিবে। এইরূপ ব্যাপার প্রস্বেদন কার্যের জন্যই পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে পরিত্যক্ত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বড় কম হয় না। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, বাঁধা কপির একটি তিন বিঘা পরিমাণ ক্ষেত হইতে চারিমাস কাল মধ্যে প্রায় ৪২,৫০০ মণ পানি এই প্রস্বেদন ফলে নির্গত হইয়া থাকে।

আলোকের প্রয়োজন

গাছের সাধারণ জীবনযাপনের জন্য সূর্যালোক নিরতিশয় প্রয়োজনীয়। পানি ও বাতাস না পাইলে গাছ যেমন বাঁচিতে পারে না, আলোকের অভাবেও উহার সেইরূপ বাঁচিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইয়া পাড়ে। আলোক অভাবে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রতিহত হয় এবং উহার দেহ ক্রমে বর্ণহীন ও শীর্ণ হইয়া উঠে। এইরূপ শীর্ণ দেহ ও বিবর্ণ রূপ লইয়া গাছ বাঁচিতে পারে না বলিয়াই, কোনওরূপ আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে গাছকে বাঁচাইতে পারা যায় না। ভুট্টা অথবা ছোলা গাছ প্রথম নির্গত হইবার পরে উহাকে একটি কাঠের বাক্স অথবা মাটির হাঁড়ি দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে দেখিবে, অল্পকাল মধ্যেই ভুট্টা এবং ছোলার সবল শিশুগাছগুলি ক্রমে বিবর্ণ, দীর্ঘ এবং শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে যদি অন্ধকারেই রাখিয়া দাও, তাহা হইলে তাহারা মরিয়া যাইবে। অন্ধকার ঘরে গাছ রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, জানালার যে স্থান হইতে আলোক অল্প পরিমাণেও ঘরে আসিতেছে, সমস্ত গাছটিই আলোকের প্রত্যাশায় সেই দিকে বাঁকিয়া চলিয়াছে। আলোর

সাহায্যেই গাছের পাতায় সবুজের শোভা প্রকটিত হয়। সবুজ বর্ণটি কি? রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে তাহার সন্ধান মিলিবে। এখন তাহার কথা বলিয়া তোমারদের বুঝানো যাইবে না। এইমাত্র এখন শিখিতে পার যে, উহাকে ক্লোরোফিল বলে এবং মৃত্তিকা হইতে মূল-সহযোগে পানির সহিত যে সকল দ্রবীভূত পদার্থ পাদপ-দেহে প্রবেশ করে, তন্মধ্যে কোনও ধাতু সাহায্যে পত্রমধ্যে এই সবুজ পদার্থটির সৃষ্টি হয়। জীব-দেহের লোহিত শোণিত এবং বৃক্ষপত্রের সবুজ পদার্থ হয়তো একই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে।

গাছের শ্বাসকার্য ও অঙ্গার-আত্তীকরণ-কার্যে একটু পার্থক্য আছে, সেটুকুও তোমাদের লক্ষ্য করা দরকার।

১। এই উভয়বিধ কার্যই প্রধানতঃ পাতা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে গাছের অন্যান্য অংশও শ্বাসকার্য সম্পাদন করিলেও পাতাতে গাছের সবুজ অংশ সাহায্যে প্রধানতঃ অঙ্গার-আত্তীকরণ-কার্যসম্পন্ন হইয়া থাকে।

২। শ্বাসকার্য দিবারাত্র সম্পন্ন হইলেও, অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ-আত্তীকরণ কার্য মাত্র দিবাভাগে সূর্যালোক সাহায্যে সম্পন্ন হইতে পারে।

৩। শ্বাসকার্যে গাছের দেহের অঙ্গার ভাগ ক্ষয় হয়, কাজে কাজেই উহার ফলে উদ্ভিদ-দেহের ওজন কমিয়া যায়। কিন্তু অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ-আত্তীকরণের ফলে উহার দেহে অঙ্গার-ভাগ বৃদ্ধি পায়, ও উহা ক্রমশঃ অধিকতর পুষ্ট হইতে থাকে, ফলে উহার ওজন বৃদ্ধি পায়।

৪। শ্বাসকার্যে গাছ অম্লজান গ্রহণ করে ও অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ পরিত্যাগ করে, ফলে উহার শক্তি ক্ষয় হয়। কিন্তু অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ-আত্তীকরণ কার্যে গাছ ঐ বাষ্পীয় পদার্থটি গ্রহণ করিয়া, অম্লজান পরিত্যাগ করিতে থাকে; ইহাতে সে নূতন শক্তি আহরণ করিয়া চলে।

ফুল ও ফল

ফুল কি? গাছে যে ফুল দেখিয়া আমরা আনন্দিত এবং মোহিত হইয়া থাকি, সেই ফুলেরই চরম পরিণতি ঘটে ফলের মধ্যে। কিরূপে ফুল উদ্গত হয় এবং উহা হইতে ফলই বা কিভাবে প্রস্তুত হয়, সে কথা এইবার বলিব। একটি ফুলের বিশেষ পরীক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু কি ফুল লইব? ভুট্টার ফুল, গমের ফুল, ডুমুর ফুল, অথবা ধানের মঞ্জরীর পরীক্ষা তত সহজ নহে; এবং তোমাদের মতো যাহারা এই রকম পাঠ সবে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের জন্য সুবিধাজনক নহে। সুতরাং একটি সহজ-প্রাপ্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পুষ্প লইয়া পরীক্ষা করিব। তোমরা কোন্ ফুল ভালবাস? গোলাপ, জবা, লিলি, ধুতুরা ফুল, বাটারকাপ, প্রিমরোজ না মন্কশুড? কত রকম ফুলই না রহিয়াছে! রূপে, গন্ধে উহারা বিভিন্ন। তবে উহাদিগের প্রত্যেককেই কয়েকটি বিশিষ্ট অংশে ভাগ করা যায় এবং এই অংশগুলি সকল প্রকার পুষ্পেই রহিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটি ফুলের মাঝামাঝি কাটিয়া, সব অংশগুলি দেখান হইল (পরের পৃষ্ঠার চিত্র)।

প্রিমরোজ

বাটারকাপ

চিত্রানুযায়ী গোলাপ অথবা পঞ্চমুখী জবার একটি ফুল পরীক্ষা করিলে উহার চারটি অংশ দেখিতে পাইবে। ফুলের নীচে সবুজ রংয়ের ঐ যে আবরণটি — উহাই পুষ্পের বহিরাবরণ নামে পরিচিত। জবা ফুলে দেখিতে পাইবে এই বহিরাবরণে কতকগুলি সবুজ রংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা রহিয়াছে। এই পাতাগুলিই আচ্ছাদন পত্র বা সেপাল (Sepal)। ইহারা মিলিয়া যে বহিরাবরণ প্রস্তুত করিয়াছে তাহাই বৃতি (calyx), বহির্বাস বা পুষ্প-বেষ্টন ইহারই মধ্যে রহিয়াছে। উহার দ্বিতীয় অংশ অন্তরাবরণ বা অন্তর্বাস। জবা, গোলাপ প্রভৃতি ফুলে দেখিতে পাইবে, এই অন্তর্বাস কতকগুলি বিভিন্ন খণ্ড দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহারাই পুষ্পদল, পাপড়ি বা পেটাল (petal)। পুষ্পের সৌন্দর্য ও গন্ধ প্রধানতঃ এই পাপড়ি হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বহির্বাস ও অন্তর্বাস ছাড়াইয়া লইলেই পুষ্প মধ্যে কতকগুলি দীর্ঘ দণ্ড এবং উহাদিগের শীর্ষদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁটুলির আকারে কতকগুলি কোষ দেখিতে পাইবে। এই দণ্ডগুলি পরাগ-কেশর, এবং কোষগুলি পরাগাধার (stamen)। এই কোষ মধ্যে অনেকগুলি রেণু বর্তমান। ইহাদিগের একটি বিশিষ্ট বর্ণ রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র কণাগুলি পুষ্প-রেণু বা পরাগ (pollen) বলিয়া পরিচিত। পরাগ-কেশর ব্যতীত আরও এক নাতিদীর্ঘ দণ্ড পুষ্পের মধ্যস্থিত বীজ-কোষ হইতে উত্থিত হইয়াছে দেখিতে পাইবে, ইহাকে গর্ভ-কেশর (style) বলে। এই চারিটিই পুষ্পের প্রধান অংশ। ইহাদিগের সাহায্যে পুষ্প ফলে পরিণত হয়।

তোমরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করিয়াছ যে, সব ফুলেই ফল হয় না। তবে অধিকাংশ ফুলেরই চরম পরিণতি ফলে। এই জন্য ফুলকে সময়ে সময়ে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যাহারা ফল দেয় না, তাহাদিগকে পুং-পুষ্প এবং যাহারা ফলোৎপাদন করে, তাহাদিগকে স্ত্রী-পুষ্প বলিয়া থাকি। কিন্তু পুষ্প মাত্রেরই পূর্বোক্ত চারিটি অংশ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। পরাগ-কেশরের শীর্ষস্থিত কোষে যেমন পরাগ বা পুষ্পরেণু আবদ্ধ থাকে, বীজ-কোষের মধ্যে সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই বীজগুলি বীজকোষের অভ্যন্তরভাগে উহার গাত্রে সংযুক্ত। পুষ্পরেণু পরাগ-কেশর হইতে নির্গত হইয়া গর্ভ-কেশরের শীর্ষদেশে পতিত হইলে এই কার্য পরাগযোগ বা

পলিনেশন (pollination) নামে পরিচিত হয়। এই পুষ্পরেণু তথায় অঙ্কুরিত হয় এবং সূক্ষ্ম নালীপথে উহার মধ্যস্থিত পদার্থ বীজকোষের মধ্যে আনীত হয়। একটি আতসী কাচের সাহায্যে তোমরা গর্ভ-কেশরের উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখিতে পাইবে, এই ছিদ্রের মধ্য দিয়াই পরাগগুলি ভিতরে প্রবেশ করে। এই পরাগের সহিত বীজ-কোষের মধ্যস্থিত বীজাণু মিশ্রিত হইলেই বীজগুলি পুষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু এই পরাগের স্পর্শ না পাইলে বীজ পুষ্ট হয় না।

উপরের কথাগুলি পড়িয়া তোমরা ভাবিতেছ যে, একই পুষ্পে যখন পরাগ এবং গর্ভ-কেশর উভয়েই রহিয়াছে, তখন প্রত্যেক পুষ্পেই ফলোদ্গম স্বাভাবিক। কিন্তু স্বভাবের নিয়ম একটু বিচিত্র। একই পুষ্পের পরাগ-কেশর এবং গর্ভ-কেশর এক সময়ে পরিপুষ্ট হয় না। হয়তো কোনও পুষ্পে পরাগগুলি প্রথমে পুষ্ট হইয়া উঠে, বীজকোষ তখনও পরাগের সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয় না। সুতরাং একই পুষ্পে এই পরাগযোগ কার্য বা pollination সংঘটিত হইতে পারে না। যখন এ পুষ্পের পরাগ পরিপুষ্ট হইয়াছে, তখন অন্য পুষ্পের বীজকোষটি পুষ্ট হওয়ায়, কোনওরূপে পরাগগুলি এ পুষ্প হইতে বাহিত হইয়া অন্য পুষ্পে যাইলে, তবেই তথায় ফল উৎপাদন করিবে; এবং এ পুষ্পের ফল-সম্ভাবনা আরও পরে, — যখন উহার বীজকোষ পুষ্ট হইবে তখন ঘটিতে পারিবে। এই পরাগবহনক্রিয়া বিচিত্র উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ

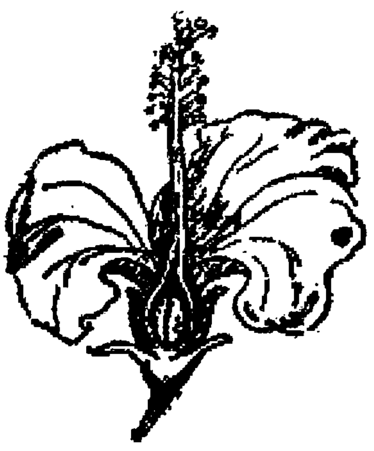

জবা

গোলাপ

কীট-পতঙ্গের সাহায্যে এই কার্যটি ঘটে। পুষ্পের বিচিত্র রূপ, মনোহর গন্ধ, অমৃতোপম মধুর লোভে নানা আকারের পতঙ্গ উহার নিকট আসিয়া বিরাট জল্‌সার সৃষ্টি করে। পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে, নানাভাবে, আকৃষ্ট হইয়া ইহারাই পরাগ-বহন কার্য সমাধা করিয়া থাকে। অবশ্য পতঙ্গগুলি এমন পরোপকারী প্রবৃত্তিসম্পন্ন নহে; তাহারা নিজেদের মধু-পানের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্যই ফুলে ফুলে ভ্রমণ করে। কিন্তু প্রকৃতিরাণী নিজ প্রয়োজনীয় কার্য তাহাদের দ্বারা তাহাদের অজ্ঞাতসারেই সম্পন্ন

করাইয়া লন। কখনও বা বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া এই পুষ্পরেণু পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া থাকে। এইভাবে পরাগ-সম্মিলন (pollination) সঙ্কর পরাগান্বয় (cross pollination) বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। অবশ্য কখনও কখনও একই পুষ্পের পুষ্পরেণু তাহারই পরাগ সহযোগে ফলোৎপাদন করিয়া থাকে এবং তখন পরাগ এবং পুষ্পরেণুর যে সম্মিলন সংঘটিত হয়, তাহাকেই স্বকীয় পরাগান্বয় (self-pollination) বলিতে পারা যায়। সূর্যমুখীর ফুলে এইরূপ সম্মিলন ঘটিয়া থাকে।

বংশ-বিস্তার (propagation)

বীজকোষে পরাগ-সম্মিলন ফলে, ক্রমে উহা ফলে পরিণত হইতে থাকে। কেশরের কার্য তখন শেষ হইয়া যায় বলিয়া উহারা ধীরে ধীরে শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে। পরাগ-কেশরের সহিত গর্ভ-কেশরও অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই শুকাইয়া যায় এবং উহারা ফল-গাত্রে একটি চিহ্নমাত্র রাখিয়া ঝরিয়া পড়ে। পত্র-মধ্যে যে নিত্য নবীন সংশ্লেষণ (synthesis) ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহার ফলে নূতন রস ফলের মধ্যে আসিয়া জমিতে থাকে। কিছুদিন পরে ফলটি পাকিয়া প্রস্তুত হয় এবং বীজও সম্পূর্ণতা লাভ করে। এইবার বৃক্ষের বংশ-বিস্তারের সূচনা হয়। কোনও কোনও গাছের ফলে মিষ্টতা বা অন্য কোনও গুণ দেখা যায় না, তাহারা অনেক সময় আকারেও ছোট হইয়া থাকে। এইগুলি পাকিবার পর গাছের ডালেই শুকাইয়া যায়। তাহার পরে বাতাসের সাহায্যে স্থান হইতে স্থানান্তরে বাহিত হইয়া নূতন গাছের সূত্রপাত করে। শিমূলের বৃহৎ ফল প্রকৃতপক্ষে কোনও পশু বা পক্ষীকে আকর্ষণ করে না। তাহার পুষ্পের ঘোর রক্তবর্ণ নাতিমিষ্ট পুষ্পদলগুলি কাক প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিয়া পরাগ বহন করাইয়া লয় সত্য, কিন্তু বীজ ছড়াইবার অন্য উপায় না থাকায় ফলটি সুপক্ক অবস্থায় ফাটিয়া যায়, এবং বীজগুলি তুলার সহিত বাহির হইয়া দূর-দূরান্তরে গিয়া পতিত হয়। কিন্তু অন্যান্য রসাল সুমিষ্ট ফলগুলি, নানা জন্তু, মানব এবং পক্ষীর খাদ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে থাকে। এবং বীজগুলি এইরূপে দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। গাছের জীবন-কথার উপসংহার এইরূপেই করা যাইতে পারে।

পুষ্পগুচ্ছ (inflorescence)

পুষ্পের কথা বলিতে গিয়া যাহাদের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। কোনও শাখাশীর্ষে একটিমাত্র ফুল ফুটিয়া গাছটিকে সৌন্দর্য দান করে, আবার কখনও কখনও দেখা যায়, একই শাখাশীর্ষে একাধিক পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে — যেমন রজনীগন্ধা, কস্তুরী বা লিলি, জিনিয়া, রঙ্গন, গাঁদা প্রভৃতি। এই সকল পুষ্পের অংশ একটি নহে, বরং পুষ্প-স্তবকটির উপরিভাগে কোথাও একই সঙ্গে বহু পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া মনোরম শোভার সৃষ্টি করে। এইরূপ পুষ্প-স্তবকের মধ্যে সূর্যমুখী এবং গাঁদাও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। ইহারাই পুষ্পগুচ্ছ (inflorescence) নামে পরিচিত। পরবর্তী অধ্যায়ে ইহাদেরই একটির বিশেষ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।

সূর্যমুখীর জীবন-কথা

যে কোনও পাদপের পত্র, পুষ্প, কাণ্ড প্রভৃতি অংশকে কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা করিলে, উহাদিগের মধ্যে অণুবীক্ষণ সাহায্যে সেল এবং প্রটোপ্লাজম প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এখানে পাদপের সূক্ষ্মতম অংশের পরিচয় না দিয়া প্রথমে স্থূলভাবে একটি বিশেষ ফুলগাছের কথা আলোচনা করিব। সূর্যমুখী বড় চমৎকার সুন্দর একটি ফুল। ইহা গাছে বহুদিন ধরিয়া ফুটিয়া থাকে। প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে ফুলটি পূর্ব দিকে ফিরিয়া থাকে, সূর্য যত ঊর্ধ্বে উঠে, ফুলটিও ততই আকাশমুখী হইতে থাকে। পরে সূর্য অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িলেই, উহা ক্রমে পশ্চিমমুখী হইয়া পরে মাটির দিকে মাথা নত করে। এইভাবে সূর্যের গতিপথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ফুলটি দিনাতিপাত করে বলিয়া ইহার নাম সূর্যমুখী হইয়াছে।

সূর্যমুখীর বীজ (seed of the sun-flower)

সুন্দর উজ্জ্বল পীতবর্ণের এই ফুলটি, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ফুটিয়া বাগানের শোভা বর্ধন করে। উহার বীজ কিন্তু আরও পূর্বে মাটিতে বসাইতে হইবে। মাটিতে বসাইবার পূর্বে সূর্যমুখীর একটি বীজ লইয়া পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত মতো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়িবে। বীজটি দেখিতে কতকটা ত্রিকোণাকার; প্রকৃতপক্ষে এই বীজকে সূর্যমুখীর ফল বলিলেই ভাল হয়। বীজটি ফুলের মধ্যে উহার কোণাকার নিম্নভাগের সহিত সংযুক্ত থাকে। একটি বীজ পানিতে ভিজাইয়া বেশ সুতীক্ষ্ণ ছুরীর দ্বারা মাঝামাঝি কাটিলে যে রূপ বাহির হইবে — তাহা নিম্নের চিত্রে দেখান হইল।

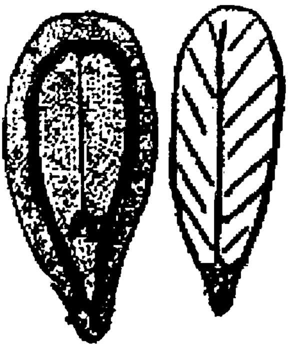

সূর্যমুখীর বীজ ও উহার কর্তিতরূপ

বীজটিকে কতকগুলি বিভিন্ন অংশে ভাগ করা সম্ভবপর। উহার অভ্যন্তরে শাঁসপূর্ণ যে অংশ রহিয়াছে — তাহারই বহির্দেশ ব্যাপিয়া একটি পাতলা আবরণ বর্তমান, ইহাই বীজাবরণ বা টেস্‌টা (testa) নামে পরিচিত। উহারই বহির্দেশে অপেক্ষাকৃত স্থূল আর একটি আবরণ রহিয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে ফলের শুষ্ক শাঁস এবং ইহাই পেরিকার্প

(pericarp) বা ছাল নামে অভিহিত। অভ্যন্তরভাগে শাঁসালো অংশ দেখিলে বুঝিতে পারিবে, উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; ইহাদের প্রত্যেকটি বীজদল নামে পরিচিত। এই বীজদলের মধ্যভাগে পাদপের ভ্রূণ বা শিশু-পাদপ ঘুমন্ত রহিয়াছে। ইহার সূচালো নিম্নাগ্রে রহিয়াছে শিকড়ের প্রাথমিক অংশ এবং উহারই উপরিভাগে ভবিষ্যৎ কাণ্ডটি প্রায় শাঁসের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে।

সূর্যমুখীর শিশু-পাদপের জন্মগ্রহণ

বীজটি ভিজা মাটিতে বসাইয়া দিলে অল্পকাল মধ্যেই উহার অগ্রভাগ হইতে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র একটি শিকড় নির্গত হইবে। এইটি প্রাথমিক শিকড় নামে অভিহিত। উহা প্রথমে মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় স্থান নির্ণয় করিয়া লয়, এবং পরে যখন ঐ বীজাবরণটি ফাটিয়া যায়, তখন উহার মধ্য হইতে একটি ধনুকের ন্যায় বক্র ক্ষুদ্র কাণ্ড দেখা যায়। আরও কিছুকাল গত হইলে ক্রমে কাণ্ডটি সোজা হইয়া উঠে এবং বীজাবরণ ফাটিয়া উহার মধ্য হইতে বীজদল হরিতের আভা লইয়া নির্গত হয়।

এইরূপে বীজ হইতে দুইটি বীজদল নির্গত হয় বলিয়া ইহারা দ্বি-বীজদলী নামে পরিচিত। বীজদলের মধ্যভাগে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কণিকা-সদৃশ পদার্থ বর্তমান; উহাই ক্রমে পত্র এবং কাণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে; এই অংশটি ভ্রূণ-মুকুল নামে অভিহিত হয়। নবজাত শিশু-পাদপের বাঁকান কাণ্ডটিকে আমরা ভ্রূণদণ্ড বা হাইপোকটিল নাম দিয়া থাকি।

এইরূপে শিশু-পাদপটি জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমেই বর্ধিত হইবে। এই ক্রমবর্ধনের সময় ইহার বিভিন্ন অংশ ইহাকে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই সময় পানি যেমন-ইহার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়, আলো-বাতাসও সেইরূপ দরকার। মাটির নিম্ন হইতে শিকড়, জলীয় পদার্থ শোষণ করিয়া উহার উপরিভাগে পাঠায়। এই পানির সহিত কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থও উহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ, চুন, ফস্‌ফরাস ও লৌহজাতীয় পদার্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পদার্থগুলি জলীয় দ্রবণে শিকড় সাহায্যে শিশু-বৃক্ষের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া উহার দেহ গঠনে সহায়তা করে।

সূর্যমুখী শিশুর জন্মগ্রহণ

তোমরা পূর্বেই শিখিয়াছ যে, আলো এবং বাতাসও গাছের পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়। আলোকের সাহায্যে গাছের পাতায় হরিতের শোভা দেখা দেয় এবং পাতার সাহায্যেই গাছ বায়ুস্থ অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ (carbon di-oxide) বাষ্প গ্রহণ করে

এবং উহা হইতেই নিজ দেহ-গঠনের নিমিত্ত শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি করিতে থাকে। এই মূল্যবান পদার্থ প্রস্তুত হইলে উহাকে কখনও কাণ্ড মধ্যে, কখনও বা মূলের অভ্যন্তরে জমান যায়। এইরূপে সূর্যমুখী গাছেরও ক্রমবর্ধন হইয়া থাকে। তাহার পর সময় আসিলে দেখা যায়, উহার কাণ্ড হইতে যে সকল শাখা নির্গত হইয়াছে, তাহার অগ্রভাগে পুষ্পের সূচনা হইয়াছে — ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁড়ির আকারের সূর্যমুখীর প্রধান কাণ্ডের শীর্ষদেশেও ক্ষুদ্র পুষ্পকুঁড়ির আবির্ভাব ঘটে। কিছুদিন গত হইলে কুঁড়ি হইতে সুন্দর পীত বর্ণের পুষ্পটি প্রস্ফুটিত হইয়া স্বীয় শোভায় বাগানকে আলোকিত করে এবং উহার বিচিত্র বর্ণসম্ভার দিয়া নানাবিধ কীটপতঙ্গকে নিজ অপরূপ রূপ দেখাইয়া যেমন মোহিত করে, তাহাদের পাদস্পর্শে নিজেও তেমনি ধন্য হইয়া যায়।

সূর্যমুখীর ফুল

সূর্যমুখীর ফুল বলিতে আমরা যে উজ্জ্বল পীতবর্ণের চক্রাকারের পদার্থটি গাছের কোনও একটি ডালের প্রান্তে দেখিতে পাই, প্রকৃতপক্ষে উহা একটি ফুল নহে, বরং কতকগুলি ফুলের একত্র সমাবেশে এই বৃহৎ ফুলটি রচিত। এইরূপ পুষ্প বহুপুষ্পী ছত্র (Inflorescence) নামে পরিচিত। তোমরা রজনীগন্ধা, লিলি প্রভৃতি ফুল দেখিয়া থাকিবে; উহাদের একটি মাত্র ডালে অনেকগুলি ফুল ফুটিয়া থাকে। সূর্যমুখীও সেই জাতীয় ফুল। তবে প্রভেদ এই যে, রজনীগন্ধার ডালের বিভিন্ন স্থান হইতে এক একটি ফুল বিভিন্ন সময়ে ফুটিয়া থাকে; কিন্তু সূর্যমুখীর ফুল, একটি ডালের শীর্ষে, একটি ছত্রের উপর প্রায় একই সঙ্গে প্রস্ফুটিত হয়। কোনও একটি ফুল তুলিয়া পরীক্ষা করিলেই এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। প্রত্যেকটি পুষ্পেরই কতকগুলি বিশিষ্ট অংশ রহিয়াছে। এই অংশগুলির কথা আর একটি ফুলের বিবৃতি দ্বারা পূর্বে বুঝাইয়াছি। এই পুষ্প মধ্যেই বীজকোষ এবং পরাগকেশরগুলি স্থাপিত। পুষ্প-রেণু পূর্বোল্লিখিত পতঙ্গ সাহায্যে, কখনও বা নিজেদের পরস্পর সম্মিলনে একত্র হইয়া ফলের সূত্রপাত করে। সূর্যমুখী ফুল বহুদিন ধরিয়াই গাছের ডালের শোভা বর্ধন করিয়া থাকে এবং এই সময়-মধ্যে ধীরে ধীরে পুষ্প-রেণু বীজাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া উহার ফল এবং বীজটি উৎপাদন করে। এই বীজ উৎপাদন করিবার জন্যই

সূর্যমুখী ফুল

পুষ্পের সৃষ্টি; নতুবা সূর্যমুখীর বংশ-বিস্তার ঘটে না। ফুল ও সন্নিহিত বীজটি সম্পূর্ণরূপে পুষ্ট হইলেই ক্রমে ফুলটি শুকাইয়া আসে। এই সময় ফুলগুলির নীচেকার চক্রাকার ফলাধারটি দেখিতে পাওয়া যাইবে। একই ফলাধারে ফুলের হিসাবে বহু সংখ্যক বীজ জন্মলাভ করে।

সূর্যমুখীর ফুলগুলি যে মনোমুগ্ধকর পীতবর্ণের শোভা দেখাইয়া থাকে, মানুষের মন তাহাতে যথেষ্ট মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয় বলিয়া, এই পুষ্প-স্তবক বা পাপড়িগুলি হইতে ঐ উজ্জ্বল বর্ণ-সম্ভারটি আহরণ করিবার উপায় মানব উদ্ভাবন করিয়াছে, এবং উহা এখন মানুষের ব্যবহারে লাগিয়া থাকে। ফুলটির মধ্যে যে বীজ উৎপন্ন হয়, তাহাও কম প্রয়োজনীয় নহে। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই বীজ হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়, তাহা খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হইতে পারে; এই তৈল, গুণে জলপাই, যাইতুন বা অলিভ তৈল অথবা বাদাম তৈলের সহিত এক পর্যায়ভুক্ত।

ধান

এইবার বাঙ্গালীর বহু আদরের ধন ধানের কথা তোমাদিগকে একটু শুনাইতে চেষ্টা করিব। বাঙ্গালীর ইহা প্রধান খাদ্য, সুতরাং আদরের ধন নিশ্চয়ই। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান শাসাইয়াছে যে, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যে ক্রমেই নষ্ট হইতেছে, সে কেবল ধান হইতে প্রাপ্ত চাউলের অপব্যবহারের ফলে। চাউলের ব্যবহার-প্রণালীর কথা বলিবার জন্য এই প্রবন্ধের সূচনা নহে; সে কথা তোমরা পরে শিখিবে; পরন্তু, উহার জীবনকথার আলোচনাকল্পেই ইহার অবতারণা।

ধানের প্রকারভেদ

বপনের ঋতুভেদে ধান দুই প্রকার। প্রথম আশু বা আউস, এবং অন্যটি আমন বা হৈমন্তিক। আউস ধান গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বপন করা হয় এবং ভাদ্র মাসের মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে; আমন ধান রোপণ করা হয় বর্ষার মধ্যে, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে উহা পরিপক্ব হয়। আমন ধান আবার দেশভেদে নানা প্রকার। কোনও ধান হইতে সুগন্ধযুক্ত ক্ষুদ্রতর (সরু) চাউল নির্গত হয়, আবার কোনও ধানে বেশ বড় বড় আকারের (মোটা) চাউল পাওয়া যায়। ধান যে প্রকারের হউক না কেন, উহার জন্ম, বৃদ্ধি এবং ফলনের ইতিহাস প্রায় একই প্রকার।

ধান, ফুল ও তাহার অভ্যন্তর

ধান একবীজদলী গাছের অন্তর্ভুক্ত। উহার বীজ পরীক্ষা করিলে প্রথমে কিঞ্চিৎ কঠিন একটি বহিরাবয়ব দেখিতে পাওয়া যাইবে। ধান কিছুক্ষণ ভিজাইয়া উহার উপরের আবরণ সরাইয়া লইলে, মধ্যভাগ হইতে চাউল নির্গত হয় ও তাহার উপরিভাগে আর একটি পাতলা আবরণ পাওয়া যায়, এইটিই প্রকৃত বীজাবরণ। উপরের আবরণটি শুষ্ক ফলের বহির্ভাগ মাত্র; ধান ভানিবার সময় ইহা তুষ আকারে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। বীজাবরণের মধ্যে যে বীজ দেখা যায় উহার দুইটি অংশ উপরিভাগের বৃহত্তর অংশ শ্বেতসার পদার্থে পরিপূর্ণ এবং নিম্নভাগে উহার প্রান্তদেশে অল্প বাঁকান যে অংশটি বর্তমান, উহার মধ্যে ভবিষ্যৎ ধান গাছের ভ্রূণ-শিশু নিদ্রিত রহিয়াছে।

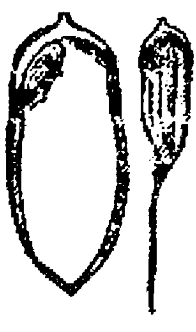

ধান ও উহার কর্তিতরূপ

পানিতে ভিজাইলে এই সুপ্ত-শিশু জাগ্রত হইতেই হাত-পা ছড়াইয়া সে বাহিরে আসিতে চাহে। পানিতে না ভিজিলে কোনও বীজেই অঙ্কুর হয় না। প্রথমে নির্গত হয় তাহার পাদদেশ, মূলের আকারে। তবে উহাতে শিকড় থাকে না। পূর্বে এক-বীজদলী গাছের জন্ম সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি, তাহা ইহার সম্বন্ধে খাটিয়া যায়। কিন্তু এখানে ঐ মূল হইতে গুচ্ছ আকারে বহু সংখ্যক সূত্র-সদৃশ ক্ষুদ্র মূল নির্গত হইয়া থাকে। এই মূলগুলির সাহায্যেই ক্ষুদ্র পাদপ-শিশুটি মৃত্তিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজ দেহ-বৃদ্ধির জন্য আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। একটি জিনিস এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বীজ হইতে শিশু-গাছের জন্মের জন্য বাতাসের অম্লজান ও সূর্যের উত্তাপ বিশেষ প্রয়োজন। অম্লজান ও উত্তাপের অভাবে শিশু গাছ জন্মাইতে পারে না।

মানব-শিশু শৈশবাবস্থায় অত্যন্ত অসহায়। মাতা দয়া-পরবশ হইয়া স্তন্য দান করেন বলিয়াই সে বাঁচিয়া যায়। শৈশবকালে প্রত্যেক প্রাণী সম্বন্ধে সেই একই কথা খাটে। শিশু-পাদপ অতি শৈশবকালে আহার-অন্বেষণে অপারগ বলিয়া বৃক্ষ মাতা তাহার ভবিষ্যৎ শিশুর জন্য এই বীজাবরণের মধ্যে শ্বেতসার জমাইয়া রাখে। লোভী মানব এই শিশুর খাদ্যই অপহরণ করিয়া নিজ সেবায় নিয়োজিত করে। আবার এদিকে মানবের তাহা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ও নাই; সুতরাং সে কথার এখন আর উল্লেখ করিব না। এই যে শ্বেতসারের সঞ্চিত ভাণ্ডার, ইহারই সাহায্যে প্রাথমিক অবস্থায় গাছের শিশু-জীবন গঠিত হইতে থাকে। অবশ্য এই গঠনকার্যের জন্য পানি নিরতিশয় প্রয়োজন। পানির অভাবে এই কার্য ঘটে না, সে কথা এখন না বলিলেও তোমরা জানিয়াছ। গাছ ঈষৎ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে মাটি হইতে আহার্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে।

ধানের শিশু-পাদপের আবির্ভাব

মৃত্তিকায় তাহার জন্য কি খাদ্য রহিয়াছে? তোমরা সকলেই শুনিয়াছ, জমিতে সার না দিলে ধান ভাল হয় না। এই সারই গাছের খাদ্য। উহার মধ্যে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান; সেইগুলি পানিতে দ্রবীভূত হইয়া মূলের সাহায্যে বৃক্ষদেহে প্রবেশ করে। গাছের জীবনী-শক্তির ব্যবহার হয় এইখানে। এই জীবিত কণাগুলির সাহায্য না পাইলে গাছের শিকড় তাহার খাদ্যবস্তু মাটি হইতে টানিতে পারে না। এই খাদ্য গ্রহণের কার্যটিও বড় চমৎকার কিন্তু উহার সম্পূর্ণ বিবরণ এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে না। আরও বেশী পড়িলে সেসব কথা জানিতে পারিবে। তবে মূলের সাহায্যেই যে গাছের মধ্যে এই খাদ্য-বস্তু গমন করে তাহার পরীক্ষা করা কঠিন নহে।

গাছের খাদ্য

কতগুলি গাছ মূল-সমেত মাটি ভিজাইয়া উঠাইয়া আন এবং উহাদিগের একটিকে একখানি শুষ্ক পাথরের উপর রাখিয়া দাও; এবং অন্যগুলি কয়েকটি চোলান পানিপূর্ণ বোতলের মধ্যে রাখ। এই বোতলগুলির একটিতে গাছের খাদ্য-পদার্থ ক্যালসিয়াম এবং পটাশিয়াম নাইট্রেট, অল্প একটু ফস্‌ফেট এবং লৌহের ক্লোরাইড দাও, কিন্তু অন্য কয়টির মধ্যে ইহাদিগের কোনও কোনওটি দিও না। দেখিবে খোলা পাত্রের গাছটি প্রথম দিনেই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই শুকাইয়া যাইবে। পঞ্চম পাত্রের গাছ সতেজভাবে বাড়িয়া চলিবে। কিন্তু প্রথম পাত্রে কেবল মাত্র পানিতে, গাছটি বাঁচিয়া থাকিলেও তেমন বাড়িবে না। দ্বিতীয় পাত্রে চুনের অভাব, তৃতীয়ে নাইট্রেট এবং চতুর্থে লৌহের অভাবে গাছটির বৃদ্ধি প্রতিহত হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হয় যে, এই সকল পদার্থই পাদপ-দেহের পূর্ণ পরিণতির জন্য বিশেষ দরকার।

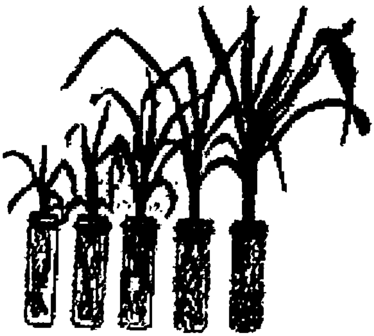

ধানগাছের শিশুগুলি অল্প একটু বাড়িলেই উহাদিগকে উঠাইয়া পানিপূর্ণ অন্য জমিতে রোপণ করা হয়। এই নূতন জমিতে উহাদিগকে পরস্পর হইতে অল্প দূরে বসাইতে হয়; কারণ, কাছাকাছি থাকিলে উহাদিগের বাড়িয়া উঠিতে অসুবিধা ঘটে এবং ফলনও ভাল হয় না।

ধান গাছের পূর্ণ পরিণতি

শিকড়ের সাহায্যে যেমন পানি ও নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণ পাদপ-দেহে গমন করে, তেমনি পত্র-সহযোগে নূতন দেহ নির্মাণের বস্তু গঠিত হইতে থাকে। গাছের জন্য পানি যেরূপ প্রয়োজন, বাতাসও তেমনই দরকার; সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই বাতাস হইতে ধানের গাছগুলি যে বাষ্পীয় রসদ সংগ্রহ করে, তাহাই পরিবর্তিত হইয়া গাছের কাণ্ড এবং পত্র নির্মাণে সাহায্য করে। এবং কিছুকাল পরে এই পদার্থই পত্রমধ্যে রূপান্তরিত হইয়া, নব কিশলয়রূপে ধান গাছের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হয় — শরৎ ঋতুর শেষ ভাগে, কার্তিকের এক মনোরম মুহূর্তে দিবাভাগের প্রখর সূর্যতাপ এবং নৈশ আকাশের স্নিগ্ধ মধুর শৈত্য আনিয়া যে বারিবিন্দু শিশিরের রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, মনে হয় যেন তাহারই সহায়তা এই ধান্য-কিশলয়ের পরিপুষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন। ধানের ফুল একই বৃক্ষে বহুসংখ্যক প্রস্ফুটিত হয়। ইহারা পূর্ববর্ণিত বহু-পুষ্পী গুচ্ছ (inflorescence) নামে পরিচিত।

ধান্য-পুষ্পে বৃন্ত নাই, উহার মধ্যে দুইটি ছোট ও দুইটি অপেক্ষাকৃত বড় পৌষ্পিক পত্র রহিয়াছে। ইহারই মধ্যে বিভিন্ন পুষ্পগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূর্ণ কিশলয়রূপে প্রস্ফুটিত হয়। প্রত্যেকটি পুষ্পের পরাগকেশরের সংখ্যা সাধারণতঃ ছয়টি দেখা যায়। উহাতে পাপড়ি বা দল নাই, তাহার পরিবর্তে দুইটি লডিকিউল (Lodicule) রহিয়াছে। গর্ভকেশর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখাযুক্ত পালকসদৃশ দীর্ঘ দণ্ড স্বরূপ। ইহাই গর্ভমুণ্ড নামে অভিহিত ও কেশরপূর্ণ ডিম্বাশয় বা বীজকোষ হইতে নির্গত হইয়া ইহারা দুই পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়ে। এই ক্ষেত্রে পরাগান্বয়-ক্রিয়া বায়ু দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহার ফলে পরাগের নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া ইহাতে উহার পরিমাণও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন, 'এমন ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে?' কিন্তু কবিকল্পনায় জড় জগতের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিবৃত্ত হয়তো ধরা পড়ে নাই যে, এই ঢেউ-খেলান ক্ষেত্রের মধ্যে বায়ুসঞ্চালিত ধানের গাছগুলি পরস্পরের পুষ্প হইতে পরাগ ছড়াইয়া অন্যের বীজকোষকে সমৃদ্ধ এবং ফলবান করিয়া তোলে। ইহাই সঙ্কর পরাগান্বয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ধানগাছগুলির ফলবতী হইবার জন্য এই শারদ দিনের নির্মল সময় নির্বাচন করিয়াছে এবং এই বাতাসের জন্যই। বাতাস না বহিলে ধান ফলিবার আশা সুদূরপরাহত।

ধানের ফুল ও ফুলের একাংশ

ডিম্বকোষে পরাগের স্পর্শ ঘটিতেই ধানের ফল প্রস্তুত হইতে শুরু হইয়া যায়। তখন পাতার সাহায্যে দ্রুতগতিতে শ্বেতসার প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া গাছের শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া আসিয়া এই ফলমধ্যে সঞ্চিত হয়। যতই দিন যায়, ফল ততই সমৃদ্ধ হইতে থাকে এবং মাসাধিক কালের মধ্যেই তরল দুগ্ধের ন্যায় রস, ঘনীভূত ও শক্ত হইলে, উহা সম্পূর্ণ ফলরূপে পরিণত হইয়া উঠে। এই সময় গাছের জীবনের উদ্দেশ্যও শেষ হইয়া যায়। পরে ক্রমে পাতার সবুজ বর্ণ নষ্ট হইতে থাকে, এবং তরুণের চিহ্ন হরিতের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে, বার্ধক্যের অগ্রদূত স্বরূপ পীতের আভা আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ধান পাকিতেই গাছ শুকাইতে আরম্ভ করে। এই সকল গাছকে বার্ষিক ফসল বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহারা ফল দান করিয়াই মরিয়া যায়।

ধানের চাষ

আমাদের দেশ ধানের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল, সুতরাং এখানে ধান চাষের উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাপানীরা ধান চাষে কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করে, ইহাদের দুই একটির উল্লেখ করা বোধ হয় দরকার। তাহারা ধানের চারাগুলিকে

পরস্পর হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবধানে এবং সোজা সারি দিয়া রোপণ করে, ফলে আগাছা ইত্যাদিকে সহজে নিড়ান সম্ভব হয়। তাহার উপর জমিতে সার দিবার ব্যবস্থা তাহাদের একটু ভিন্নরূপ। তাহারা জমি তৈয়ার করিবার সময়, এক সঙ্গে সমস্ত সার না দিয়া, গাছ যেমন বাড়িতে থাকে তেমনি কিছু পরিমাণ আধুনিক সার দিয়া ধানের ফলনের প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। এদেশে জমিতে একবারে জমি তৈয়ার করিবার সময় সমস্ত সার দেওয়া হয়, এই প্রথা তেমন উপাদেয় নহে। গোড়াতেই অধিক সার দিলে গাছগুলি বেশ বড় হয় বটে কিন্তু ফলন ভাল হয় না, গাছও বাতাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চাষের উন্নতির জন্য এই দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

ষেটি ধান

এইখানে আরও এক প্রকার ধানের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহাকে বিহার অঞ্চলে ষেটি ধান বলে। ইহার জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি প্রয়োজন। নিম্নভূমিতে অধিক পানিতে এ ধান জন্মায় না। প্রায় দুই মাস বা ষাট দিনে এ ধান পুষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় ইহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। আষাঢ়ের প্রথম দিকে রোপণ করিয়া ইহাকে ভাদ্রের মাঝামাঝি কাটিয়া লওয়া হয়। এ ধানের বিশেষত্ব এই যে, উহার ফুল অন্যান্য ধানের ন্যায় পাতার বাহিরে আসে না, লোক চক্ষুর অন্তরালে পাতার আবরণের মধ্যে থাকিয়া সম্ভবতঃ স্বকীয় পরাগান্বয়ের ফলে একই ফুল হইতে উহার ফল উৎপন্ন হয়। বর্ষার দিনে উহার ফুল প্রস্তুত হয় বলিয়াই বুঝি ইহার জন্য আলাদা ব্যবস্থা হইয়াছে; অন্যথায় ফুলগুলি বৃষ্টিধারায় উহাদের পরাগরাজি হারাইয়া ফেলিত। ধান পাকিলেও পাতার আবরণেরই উহা থাকিয়া যায় তবে কখনও কখনও এই সময় উহাকে আবরণের বাহিরেও দেখা যায়।

গম বা গোধূম পাকিস্তানের নানাস্থানে প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উহার চাষ শীতকালে বর্ষার শেষে করা হয়। উহার জীবন-কথা অনেকাংশে ধানের সহিত একরূপ হইলেও উহা কতকটা ভিন্ন।

মটর

মটর বীজ

এক-বীজদলী ধানগাছের পরেই একটি দ্বি-বীজদলী গাছের বিশদ বিবরণ দিব। সূর্যমুখীও দ্বি-বীজদলীর শ্রেণীভুক্ত। এইবার কিন্তু মটরের কথা বলিব, ইহাও দ্বি-বীজদলী। মটরদানা কতকগুলি লইয়া পানিতে ভিজাইয়া দাও, এবং বেশ ভালভাবে ভিজিলে একটি দানা লইয়া পরীক্ষা কর। দেখিবে ইহার বহিরাবরণের এক পার্শ্বে একটি নাতিদীর্ঘ কাল দাগ রহিয়াছে। এই স্থানেই মটর দানাটি শুঁটির সহিত সংযুক্ত ছিল। ভিজা দানাটির গায়ে অল্প চাপ পড়িতেই এই কাল দাগটির এক পার্শ্ব দিয়া অল্প একটু পানি নির্গত হইয়া আসিবে। এই স্থানে ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র রহিয়াছে এই এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া পানি আবরণ ভেদ করতঃ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। একটি ভিজা ছোলার দানা পরীক্ষা করিলেও একই জিনিস দেখিতে পাইবে। এই ছিদ্রটি মাইক্রোপাইল (micropile) নামে অভিহিত; উহার নিকটে টেস্টা (testa) বা বীজাবরণের উপর নাতিদীর্ঘ, সঙ্কীর্ণ যে দাগটি বর্তমান, তাহাকে হাইলাম (hilum) বলে। বীজাবরণটি ছাড়াইয়া ফেলিলে উহার মধ্যে দেখিবে, সুপুষ্ট দুইটি বীজদল এবং হাইলামের অন্য পার্শ্বে, অন্তর্বর্তী স্থানে পাদপের সুষুপ্ত ভ্রূণ-শিশুটি উহাদিগকে সংযুক্ত করিয়াছে। এই বীজদল দুইটি, সূর্যমুখীর তুলনায় অধিকতর পুষ্ট এবং স্থূল; ইহারই মধ্যে কিন্তু পাদপের অল্পকালের খাদ্য সঞ্চিত রহিয়াছে। এই খাদ্য কেবলমাত্র শ্বেতসার-পূর্ণ নহে, বরং উহার সহিত আমিষজাতীয় পদার্থও রহিয়াছে। বীজদলের মধ্যস্থানে যে ভ্রূণ-মুকুলটি বিদ্যমান, পরে উহাই মটর চারার কাণ্ডে পরিণত হইবে। একটু সাবধানে পরীক্ষা করিলে উহার অগ্রভাগে অতি ক্ষুদ্র পত্রের সঞ্চার হইয়াছে দেখিতে পাইবে।

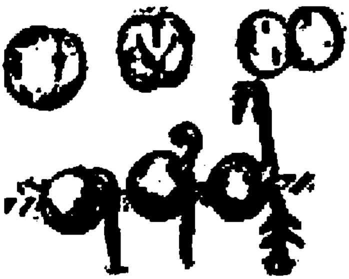

উপরে ছোলার বীজ
নীচে মটর চারার জন্ম

মটরের শিশু-পাদপ

মটর দানা ভিজা মাটিতে বসাইয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, দুই তিন দিনের মধ্যেই উহার অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। সূর্যমুখীর সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ইহার ভ্রূণদণ্ড বা হাইপোকোটিল সূর্যমুখী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর; ইহার মূল নির্গত হইয়া মাটির

মধ্যে গমন করিবে, এই প্লুমিউল ঊর্ধ্বমুখে উত্থিত হইয়া পাতা মেলিতে থাকিবে বীজদল মাটির মধ্যে থাকিয়া শিশু-পাদপটির খাদ্য সরবরাহ করে। ক্রমে মূল দ্বারা মাটি হইতে খাদ্য আহরণ করিবার শক্তি জন্মিলে কয়দিনের মধ্যেই বীজদলের মধ্যস্থিত আহার্য-বস্তু নিঃশেষ হইয়া যায়। যে-সকল গাছের খাদ্য-সরবরাহ ইহার অনুরূপ প্রথায় হইতে থাকে, তাহাদিগকে হাইপোজিয়াল বা মৃদ্বাসী নাম দেওয়া হয়। ছোলার গাছও এই এক প্রথায় বাহির হইয়া থাকে। সুবৃহৎ আম্রগাছের শিশুও এই একইভাবে তাহার বাল্যজীবনে পালিত হয়। এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, মটরের জন্য চুন-প্রধান বেলে মাটির জমিই পরম উপাদেয়। গোবরের সার ইহার জন্য তেমন উপকারী নহে।

মটর গাছের একাংশ, ফুল, শুঁটি ও ফুলের দ্বিখণ্ডিত অংশ

ইহার ভ্রূণ-মুকুলের অগ্রভাগ হইতে নবপত্রের সূচনা হয়। পত্র নির্গত হইবার পর পুনরায় ঐ মধ্যস্থিত কাণ্ডের অঙ্কুর ক্রমে আরও বাড়িতে থাকে এবং ক্রমশঃ পাতা মেলিয়া চলে। মটর গাছের পাতা যৌগিক (compound leaf); ইহা কাণ্ডের যে স্থান হইতে নির্গত হয়, তথায় পত্রসদৃশ্য যে সবুজ ফলকটি আবির্ভূত হয়, তাহা ইহার উপ-পত্র নামে পরিচিত হইতে পারে। মটরের গাছ কিন্তু বৃহৎ আকার গ্রহণ করে না, বরং উহা প্রায় লতার আকারে বাড়িয়া চলে; এই যৌগিকপত্রের অগ্রভাগের ফলক একরূপ সূক্ষ্ম সূত্রে পরিণত হয়; ইহাই আকর্ষ (tendril) নামে পরিচিত, ইহারই সাহায্যে লতাগুলি কোনও শক্ত পদার্থকে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সর্বশেষে এইরূপ সঙ্গমস্থান

হইতে নব কিশলয় নির্গত হইয়া, পরে পুষ্পে পরিণত হয়। পুষ্প হইতে যে ফলের সৃষ্টি হয়, তাহাই মটর শুঁটি। দীর্ঘ শুঁটি পুষ্পের নিম্নভাগ হইতে বর্ধিত হইতে থাকে, এবং তখন এই কোষের অগ্রভাগের ফুল ক্রমে শুকাইয়া পড়িয়া যায়। শুঁটির মধ্যে বিভিন্ন-সংখ্যক মটর বীজ পুষ্ট হইতে থাকে।

মটরের শিকড়ে একটি বিশেষত্ব রহিয়াছে। এই শিকড় শিম্ব জাতীয় বলিয়া পরিচিত। শিকড়ের সূক্ষ্ম সূত্রাগ্রে একরূপ জীবাণু প্রবেশ করিয়া বর্ধিত হয় ও তথায় গ্রন্থির আকার দান করে। এই জীবাণু বাতাসের নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া তাহাকে অন্য পদার্থে পরিণত করে; ইহা তখন যৌগিক নাইট্রোজেনরূপে জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং মটর জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় বাতাসের নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন সারে রূপান্তরিত করিবার ক্ষমতা রাখে।

ধান ও মটরের তুলনামূলক পরিচয়

এখন তোমরা এক-বীজদলী ও দ্বি-বীজদলী উদ্ভিদের কতকটা পরিচয় পাইয়াছ। এইবার উহাদিগের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা দরকার মনে হইল।

১। এক-বীজদলী গাছ — ধান ও গম ইহারা ঘাস জাতীয় গাছ এবং দ্বি-বীজদলী গাছের উদাহরণ শিম বা মটর।

২। দ্বি-বীজদলী গাছ — মটরের প্রধান শিকড়ে রহিয়াছে। ধানের কিন্তু প্রধান শিকড় নাই। তাহার পরিবর্তে উহার গুচ্ছ-মূল বর্তমান।

৩। মটরের কাণ্ড দুর্বল গাঁটগুলি তেমন স্পষ্ট নয়; কিন্তু ধানের কাণ্ড সবল, ঋজু ও স্পষ্ট গাঁটবিশিষ্ট।

৪। মটরের পাতা যৌগিক — উহার গোড়ায় দুইটি উপ-পত্র বর্তমান, যৌগিক পত্রের প্রান্তবর্তী অনুফলক পরিবর্তিত হইয়া আকর্ষে পরিণত হয়; কিন্তু ধান গাছের পাতা যৌগিক নহে — উহার আকর্ষও নাই। পাতার মধ্যে মটর গাছে জাল শিরাবিন্যাস বর্তমান, কিন্তু ধান গাছের শিরাগুলি সমান্তরাল।

৫। এই দ্বিবিধ উদ্ভিদের পুষ্পও একটু ভিন্ন। মটরের ফুল সবৃন্তক কিন্তু ধানের ফুলে বোঁটা নাই। মটরের ফুলে পাঁচটি বৃত্তাংশ ও পাপড়ি রহিয়াছে এবং চারিটি পৌষ্পিক পত্র উহার ফুলকে ঘিরিয়া থাকে।

৬। মটরের পুংকেশর দশটি। উহার মধ্যে নয়টির সূত্র সম্মিলিত ও একটি সূত্র পৃথক রহিয়াছে। কিন্তু ধানের ফুলের পুংকেশর ছয়টি মাত্র।

৭। ফুলের মধ্যে মটরে একটি, কিন্তু ধানের দুইটি গর্ভমুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়।

৮। মটরের একটি ফলে মটরশুঁটি মাঝামাঝি ফাটিয়া থাকে। উহার বীজের সংখ্যাও একাধিক, কিন্তু ধানের ফল কখনও ফাটে না এবং উহাতে একটি মাত্র বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই চাউল।

৯। এই দুই গাছই প্রতিবৎসর জন্মগ্রহণ করে, ফল দেয় ও পরে মরিয়া যায়।

১০। ধান কয়েক রকমেরই দেখা যায়। ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বা বর্ষার পূর্বে এবং কাহাকেও বা বর্ষার মধ্যে রোপণ করিতে হয় এবং উহারা কার্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে পাকে। মটর কিন্তু অধিক পানিতে জন্মায় না বলিয়া উহাকে বর্ষা-শেষে বপন করিতে হয় (কার্তিক মাস), এবং উহা চৈত্রমাসে পাকে।

দ্বিতীয় পর্ব

জীব-জীবন

"বিশ্বপ্রতি, স্পর্শে তোমার
সৃষ্টি হ'ল জীবন যত;
কৃতজ্ঞ সব হৃদয়গুলি
প্রশংসাতে পরিপ্লুত।"

—ঋগ্বেদ

জীবনের আবির্ভাব

জীবনের সমস্যা অতি পুরাতন। জীবন বলিতে সঠিক আমরা কি বুঝি? যাহা অদৃশ্য কোনও শক্তির বলে চঞ্চল, অর্থাৎ যাহাকে আমরা গতিশীল দেখিয়া থাকি, তাহাই কি জীবিত পদার্থ। মাঝে মাঝে ভূ-পৃষ্ঠ আন্দোলিত হয় উহারই অন্তর্নিহিত কোনও শক্তির ফলে। এই আন্দোলন কি জীবনের পরিচায়ক? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর এই মাটি, পাথর, পানি, বায়ু সবই জীবনী-শক্তিসম্পন্ন। ইহাদিগের চঞ্চল গতি আমরা প্রায়ই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু ইহাদিগকে আমরা আজিও জীবিত পদর্থের মধ্যে গণ্য করি নাই। আমরা বলি, যাহারা ইচ্ছামতো ভ্রমণ করিতে পারে, তাহারাই জীবিত। এই গতির সহিত জীবিত জনের আরও কতকগুলি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা ঃ— (১) জীবিত পদার্থ আহার করে। (২) শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। আহার ও শ্বাস-কার্যের ফলে জীবিত জন বাহির হইতে নানা পদার্থ লইয়া নিজ দেহ পুষ্ট করে এবং নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদার্থ উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করে। (৩) ইহারা উত্তেজনায় প্রতিবাদ করে এবং (৪) নিজ বংশ-বিস্তার কল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া, পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতগুলি বৈশিষ্ট্য যাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই আমরা জীবিত নামে অভিহিত করিতে পারি। অন্যথায় তাহা জড় শ্রেণীভুক্ত হইবে।

জীবনের আদর্শ যদি ইহাই হয়, তবে পাথর, মাটি, পানি বা বায়ু জীব-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু সব্জি-জগৎ সম্বন্ধে সেই একই কথা বলিতে পারা যায় না। বিভিন্ন

গাছের জীবন-কথার যেরূপ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, এই সব্জি-জগতের প্রতিটি অধিবাসীই জীবশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। একটা জিনিস ইহাদিগের সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা গতিশীল নহে, অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করা ইহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইহাদিগের দেহ-পুষ্টির সময় উহার অগ্রগতি দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহারা আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। নাই বা তাহা সম্ভবপর হইল। পঙ্গু মানব গিরি লঙ্ঘন করিতে না পারিলেও, যাবৎ তাহার দেহের অন্যান্য যন্ত্র তাহাদিগের নিয়ন্ত্রিত কার্য করিয়া চলিয়াছে, তাবৎ সে জীবিতের শ্রেণীভুক্ত হইবে। গাছ সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। গাছ তাহার জন্মস্থানে রহিয়াই আলো-বাতাস-মৃত্তিকার সহায়তায় নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া চলিয়াছে। ধানের শিশু চারাটি যতদিন তাহার জলীয় খাদ্য হইতে বঞ্চিত না হয় ততদিন সে বাড়িয়াই চলে। দেহের পুষ্টি সম্পূর্ণ হইলে ফুলের আবির্ভাব ঘটে তাহার শীর্ষদেশে। আরও কিছুদিন গত হইলে সে ফুলে ফলে পরিণত হয়; এইরূপে তাহার বীজরূপী বংশধরকে সে পরিপুষ্ট করে। জীবনের এই চরম উদ্দেশ্য সফল হইলেই সে জরা-জীর্ণ দেহকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত করিয়া চির-বিশ্রাম লয়। মটরের চারা সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। যতদিন যৌবনের আবেগ তাহার শিরা-উপশিরায় চঞ্চল গতিতে প্রবাহিত হয়, ততদিন সে নিত্য নতুন শাখা-প্রশাখা মেলিয়া, নব কিশলয়ে সজ্জিত হইয়া থাকে। কত ফুলই না তাহার হরিৎ দেহে বিচিত্র ভূষণ পরাইয়া দেয়। তাহার পর তাহার পাতাগুলির মধ্যে দীর্ঘ শুঁটিগুলির দোদুল্যমান রূপ মানবমনকেও মুগ্ধ করে। কিন্তু মানব এই অবস্থাতেও তাহাকে নির্মমভাবে ছিঁড়িয়া আনে, রসনার পরিতৃপ্তির জন্য।

তাহা হইলে গাছ সত্য সত্যই জীব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবুও যেন কিরূপ সন্দেহ হয় — মন যে সম্পূর্ণরূপে সায় দেয় না! গাছ কি উত্তেজনার কোনও প্রতিবাদ করে, আঘাত দিলে সে কি ব্যথা পায়? তোমরা খেয়ালের বসে গাছের ডাল কাটিয়াছ, পাতা ছিঁড়িয়াছ, ফুল তুলিয়াছ; কিন্তু মূক ঐ পাদপটির অন্তরের ব্যথা তো উপলব্ধি কর নাই। এ আঘাত গাছের প্রাণেও তেমনি বাজে, যেমন অন্য কোনও প্রাণীর বেলায় ঘটিয়া থাকে। লজ্জাবতীর ক্ষুদ্র পাতাটি স্পর্শ পাইলেই সঙ্কুচিত হয়। এখানে গাছের উত্তেজনায় প্রতিবাদ প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্য গাছের ডাল কাটিলে আহত স্থান হইতে রসও ক্ষরিত হয়। ইহা প্রায় প্রাণীদেহের কাটা ঘা হইতে রক্তনির্গমনের সমতুল্য। ভারতবর্ষের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্বর্গীয় স্যর জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ-দেহেও, প্রাণীর ন্যায় প্রাণশক্তি চিরচঞ্চল রহিয়াছে। তোমরা বড় হইয়া সে সব কথা শিখিবে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য (adaptation)

পাদপ-জীবনের আলোচনা করিতে গিয়া আরও একটি কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। ইহাদিগের আশ্চর্য ক্ষমতা রহিয়াছে যে, ইহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত

সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে; এবং বহির্দেশের প্রভাবের ফলে উহাদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি যে. আলোকের তারতম্যে গাছের কলেবর ও পত্ররাজির স্বাভাবিক বৃদ্ধি পরিবর্তিত হইতে থাকে। তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণের ফলে বৃক্ষ-জীবনে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। যখন এই বাহিরের প্রভাবের সহিত গাছগুলি সামঞ্জস্য রাখিতে না পারে তখনই উহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অল্প আলোকিত স্থানে কোনও গাছ বাড়িতে থাকিলে দেখা যায়, উহার পাতাগুলির রং এবং আকার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। পাতাগুলি যেমন দৈর্ঘ্যে বড় হয়, তাহার কাণ্ডও তেমনি স্বাভাবিক আকার অপেক্ষাও দীর্ঘতর হইয়া থাকে। মনে হয় অধিকতর আলো পাইবার জন্যই এই চঞ্চল প্রচেষ্টা। এইরূপ একটি গাছকে হঠাৎ তীব্র আলোকের মধ্যে রাখিলে তাহার মরিয়া যাইবার সম্ভাবনাই অধিক, তবে অল্প অল্প করিয়া আলোক বাড়াইতে থাকিলে ক্রমে নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া উহা বাঁচিয়া যাইবে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, গাছ প্রকৃতই প্রাণবান। আমরা এইবার জীব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিব জীবনের এইরূপ ব্যাখ্যা প্রাণীবর্গের উপর কিরূপ খাটিতে পারে। প্রাণী বলিতে আমরা ক্ষুদ্র জীবাণুগুলিকেও এই শ্রেণীভুক্ত করিতে চাই। পূর্বে তোমাদিগকে পাদপ-কণা এবং প্রাণীকণার কথা বলিয়াছি। এই প্রাণী-কণাই জীবাণু নামে অভিহিত। এইরূপ ক্ষুদ্র জীব বহুসংখ্যক বর্তমান। ইহাদিগের দেহ কোষাবরণ দ্বারা আবৃত, এবং ঐ আবরণ-মধ্যে কেন্দ্রকণার (nucleus) চতুষ্পার্শ্বে রহিয়াছে লালা সদৃশ প্রটোপ্লাজম। ইহারা নিজ দেহ পরিপুষ্টির জন্য বাহির হইতে খাদ্য গ্রহণ করে। তবে এই খাদ্য এমন অবস্থায় দেওয়া দরকার, যাহা গ্রহণ করা ইহাদিগের জন্য সহজসাধ্য হইতে পারে। এইরূপে ইহারা ক্রমে সংখ্যায় বাড়িতে থাকে। সুতরাং বলিতে হয় যে, এই ক্ষুদ্র জীবকণাগুলিও প্রাণীর প্রধান গুণের অধিকারী। সুতরাং প্রাণী জগতের সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের একটি অধিবাসীর উল্লেখ করিয়া, প্রাণশক্তির বিশিষ্ট পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

প্রাণীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে প্রটোজোয়া, পরিফেরা প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণী অন্তর্ভুক্ত। পূর্বোক্ত প্রাণীকণা এই প্রটোজোয়ার অন্তর্গত। আমাদিগের পরিচিত স্পঞ্জ পরিফেরা-শ্রেণীর একরূপ সামুদ্রিক জীবের দেহ-কঙ্কাল মাত্র; ইহারা অমেরুদণ্ডী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাণী মেরুদণ্ডী নামে পরিচিত। এইস্থানে অমেরুদণ্ডী কেঁচো ও মেরুদণ্ডী প্রাণী মাছের কথা আলোচনা করিতেছি। পরে আরও কতকগুলি প্রাণীর কথা বলিব।

উদ্ভিদের কথা তোমরা পূর্বেই শিখিয়াছ। উদ্ভিদ-জীবনের আলোচনা করিতে গিয়া তাহাদিগকেও আমরা জীবের অন্তর্গত করিয়াছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই দ্বিবিধ জীবের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, সেইগুলির কথাও এখানে উল্লেখ করিলাম।

জীব ও জড়ের পার্থক্য

১। জীব ও জড়ের মধ্যে সমূহ পার্থক্য রহিয়াছে; জড় কখনও খাদ্য গ্রহণ করে না বা তাদের দেহের বৃদ্ধি কখনও দেখা যায় না, অথচ উদ্ভিদ বা প্রাণী উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করে ও তাহার সাহায্যে স্ব স্ব দেহ পুষ্ট করিয়া থাকে।

২। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই নিজ নিজ বংশ-বিস্তার করিতে সক্ষম; যদিও উহাদের বংশ-বিস্তারের উপায় বিভিন্ন। জড় পদার্থ কখনও ঐরূপ করিতে পারে না।

৩। পূর্বেই তোমরা শিখিয়াছ যে, উদ্ভিদ বা প্রাণী উভয়েই কোনও উত্তেজনা পাইলে তাহাতে সাড়া দিয়া থাকে। ঐরূপ প্রতিক্রিয়া অবশ্য এই দ্বিবিধ বস্তু হইতে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশিত হয়। জড় কখনও এইরূপ সাড়া দিতে পারে না।

৪। ইচ্ছামতো চলাফেরা করা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য। উদ্ভিদ এইরূপ শক্তির বিকাশ ব্যাপকভাবে না দেখাইলেও কোনও কোনও উদ্ভিদ ঐরূপ ইচ্ছামতো নড়াচড়া করিতে পারে।

৫। শ্বাসকার্য সম্পন্ন করা জীবের প্রধান লক্ষণ। উদ্ভিদও ঐরূপ কার্য করিতে সমর্থ; কিন্তু জড়ের সে ক্ষমতা নাই। উভয়ের দেহে শ্বাস যন্ত্রের আকার ও ক্রিয়া বিভিন্ন।

৬। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই প্রাণ-সম্পন্ন বলিয়া ইহার জন্ম-মৃত্যু আইনের অধীন। জড় পদার্থের মৃত্যু ঘটে না, উহাদের জন্মগ্রহণও আমরা দেখিতে পাই না।

৭। অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প অধিক মাত্রায় প্রাণীদেহের হানিকারক। উদ্ভিদ উহা হইতেই অঙ্গার ভাগ গ্রহণ করিয়া নিজ দেহের পুষ্টি ঘটায়। এইরূপ উদ্ভিদ প্রাণী জীবনকে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং বায়ু মার্গে অঙ্গার-দ্বি-অম্লজের আধিক্য ঘটিতে দেয় না। জীবদেহের পুষ্টির জন্য তাহাকে উদ্ভিদের উপর অথবা অন্য প্রাণীর মাংসের উপর নির্ভর করিতে হয়।

কেঁচো

(Earthworm)

তোমরা বর্ষার দিনে মাটির উপর একরূপ দীর্ঘদেহী কীটকে বিচরণ করিতে দেখিয়া থাকিবে। সাধারণতঃ ইহাকে আমরা কেঁচো বলিয়া থাকি। ইহারা কাহাকেও কামরায় না, কিন্তু ইহাদের কদাকার বক্রগতি আমার মনে ঘৃণার উদ্রেক করে। তাই আমরা উহার প্রতি চাহিয়া দেখি না। কিন্তু ইহারা আমাদের বন্ধুর কাজ করিয়া থাকে। মাটি খুঁড়িয়া তুলিয়া, বাগানের সব জায়গাটুকু সে গাছপালার জন্য উত্তমরূপে উপযুক্ত করিয়া

[redacted]

তোলে। দেখিতে তেমন সুন্দর নয়, মনকে বড় আকর্ষণ করে না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার দেহের গঠন, এবং জীবন-কথা যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হইবে মনে হয়। গতিশীল দীর্ঘদেহী এই কীট ঐ একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অবশ্য শ্রেণীর আলোচনা এখানে করিতে চাহি না, মাত্র কেঁচোর কথাই বলিব। মাছ ধরিবার সময় হয়তো তোমাদের কেহ, এই কদাকার কীটকে হাতে ধরিয়া দেখিয়াছ; আঙ্গুলের মধ্যে তাহার কিল্‌বিল্‌ গতি মোটেই আনন্দ দেয় না, বরং ঘৃণার উদ্রেক করে। তবে ধৈর্য থাকিলে উহার দেহের পরীক্ষা করিতে পারিবে।

দীর্ঘ নল-সদৃশ ইহার দেহটির পুরোভাগ অপেক্ষা পশ্চাদ্‌ভাগ ক্ষীণতর মনে হয়। সমস্ত দেহটি কতকগুলি গোলাকার খণ্ডের সমষ্টি মাত্র। এই খণ্ডগুলির সর্বপ্রথমটি সম্মুখের দিকে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি ও অপেক্ষাকৃত স্থূল। ইহার নিম্নভাগে রহিয়াছে উহার মুখ-গহ্বর। প্রত্যেকটির তলদেশে রহিয়াছে, অতি ক্ষুদ্র দুইটি কাঁটা সদৃশ লোম। এগুলি এমনভাবে বসান যে, সম্মুখে চলিবার সময় উহারা ইহার দ্বারা মোটেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না, পরন্তু এই লোমগুলির জন্যই উহাদিগের মসৃণ দেহ পশ্চাতে উল্টাইয়া পড়ে না। প্রত্যেকটি খণ্ডের নিম্নভাগে দুইটি করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্রও রহিয়াছে; তাহার সাহায্যে উহারা দেহের মধ্য হইতে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নিষ্কাশিত করিতে পারে। পঞ্চদশসংখ্যক দেহখণ্ডের নিম্নে আরও দুইটি বৃহত্তর ছিদ্র বর্তমান। ইহারাই পুং-জননেন্দ্রিয়ের কাজ করে। দ্বাত্রিংশ হইতে সপ্তত্রিংশ সংখ্যক দেহখণ্ডগুলি অন্যদের অপেক্ষা বৃহত্তর, কিন্তু উপরিভাগ দেখিয়া ইহাদিগকে পৃথক করিবার কোনও উপায় নাই। এই অংশ ক্লিটেলাম (clitallum) নামে পরিচিত। পরিশেষে ইহার দীর্ঘ দেহের শেষভাগে গুহ্যদ্বার বা পায়ু অবস্থিত রহিয়াছে।

মুখ-গহ্বর দিয়া ইহারা পচা পাতা প্রভৃতি পদার্থ গ্রহণ করে। এইগুলি খাদ্য-নালীর মধ্য দিয়া যেখানে নীত হয় তাহা থলি বিশেষ। তথা হইতে এই খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে প্রবেশ করে এবং পরে অন্ত্রের মধ্য দিয়া গুহ্যদ্বার বা পায়ু পথে নির্গত হইয়া যায়। ইহার পাচক-যন্ত্র এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি নলের ন্যায় বর্তমান রহিয়াছে, ইহাই পৌষ্টিক নালী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই নলের বহির্ভাগে এবং দেহাবরণীর অভ্যন্তরে উহার রক্ত চলাচলের শিরা বর্তমান। উহার শিরার মধ্য দিয়া লোহিত শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে। তবে এই রক্তকে সঞ্চালিত করিবার জন্য

কেঁচো দেহের অভ্যন্তর

হৃদয়ের ন্যায় কোনও বিশেষ যন্ত্র ইহার নাই। উহার দেহের ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ সংখ্যক বৃত্তখণ্ড বা সেগমেন্টের অভ্যন্তরভাগের রক্তবাহী শিরাগুলি অপেক্ষাকৃত স্ফীত এবং ইহারাই গতির অনুরূপ গতি-সাহায্যে এই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন করে বলিয়া ইহাদিগকেই উহার হৃদয় বলা হইয়া থাকে। তৃতীয় সেগমেন্টের নিম্নে গলনালীর উপরিভাগে কতকগুলি স্নায়ুসূত্র একত্র হইয়া স্ফীত আকারে বর্তমান। ইহাকেই মস্তকের স্নায়ুসূত্র বলা যাইতে পারে। ইহারই শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন সেগমেন্টে বর্তমান থাকিয়া, স্নায়ুর ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে।

কেঁচো উভ-লিঙ্গ (hermaphrodite) প্রাণী অর্থাৎ ইহাদিগের সন্তানোৎপাদনের জন্য পৃথক পুরুষ অথবা স্ত্রী নাই। ইহাদিগের প্রত্যেকের দেহে সন্তানোৎপাদনের দুইটি কেন্দ্রই বর্তমান। আমরা পুষ্পের মধ্যেও এইরূপ দেখিয়াছি। পুষ্পের ন্যায় এখানেও সঙ্কর সম্মিলনেই সন্তানোৎপাদন কার্য সংঘটিত হয়; এই সম্মিলনের ফলে যে ডিম্ব প্রস্তুত হয়, তাহাই ক্রিমিকোষে আবদ্ধ হইয়া মৃত্তিকায় রক্ষিত হইলে পরে উহার মধ্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমিগুলি নির্গত হইয়া ক্রমে বাড়িতে থাকে।

এই কেঁচোর মধ্যে আমরা প্রাণী জীবনের সকল বিশেষত্বই লক্ষ্য করিতেছি। সুতরাং ইহারা যে প্রাণী শ্রেণীভুক্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? পানির মধ্যে যে বিভিন্ন মৎস্য ছুটিয়া বেড়ায় তাহারাও অন্য শ্রেণীভুক্ত প্রাণী। উহাদের জীবনেও এই সকল বিশেষত্ব সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

মৎস্য

মৎস্য মেরুদণ্ডী জীব। ইহাদিগের শরীরের গঠন এবং অভ্যাসবিশেষে কতকগুলি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। এখানে মৎস্যের বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। উহাদিগের জীবধর্ম সম্বন্ধেই কিছু বলিতে চাই।

রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস প্রভৃতি মাছ এক পর্যায়ভুক্ত। ইহাদিগের শরীর এমনভাবে গঠিত যে, পানির মধ্যে চলাচল করিতে ইহাদিগের কোনও অসুবিধা হয় না। রুই, কাতলা, কৈ প্রভৃতির দেহের উপরিভাগ মসৃণ আঁশযুক্ত। ইহা এত পিচ্ছিল যে,

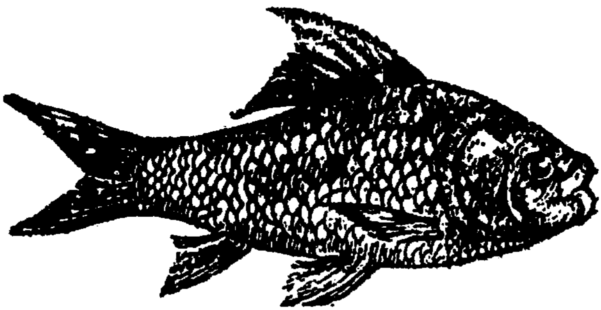

কাতলা

উহাদিগকে সহজে ধরিয়া রাখা যায় না। কোনও কোনও মাছের দেহ মসৃণ পর্দায় আবৃত — যেমন, সিঙ্গি, মাগুর, আড় প্রভৃতি। সম্মুখে মস্তক অপেক্ষা দেহের মধ্যভাগ অধিকতর স্থূল, এবং লেজের অগ্রভাগে ডানা (fins) রহিয়াছে। এই ডানাগুলি কাঁটা ও পাতলা পর্দার সাহায্যে এমনভাবে প্রস্তুত যে, তাহারা ইচ্ছানুযায়ী উহাকে সঙ্কুচিত বা বিস্তারিত করিতে পারে। ইহারই সাহায্যে পানির মধ্যে উহারা নিজ গতি নিয়ন্ত্রিত করে। লেজের অগ্রভাগে যে ডানা রহিয়াছে, উহারই সাহায্যে তাহারা নিজ গমন-পথ এবং গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া লয়। মাছ সমস্ত লেজটি ৪ সংখ্যার আকারে নাড়িয়া থাকে এবং এই সঞ্চালন-ক্রিয়ার ফলে দেহ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলে। জীবের এই প্রধান গুণটি, উহার মধ্যে এইভাবে পরিস্ফুটিত হয়। উহা আহার গ্রহণ করে। এই আহার্য পদার্থ মস্তকের পুরোভাগে অবস্থিত মুখ-গহ্বরের মধ্য দিয়া উদরে প্রবিষ্ট হয়, এবং তথা হইতে ক্রমে অন্ত্রমধ্যে আসিয়া পড়ে। এইরূপ গমনকালে খাদ্যদ্রব্য পাচিত হইয়া তাহার পুষ্টি সাধন করে।

একটি মাছের দেহের অন্তর্ভাগ নিম্নের ছবিতে দেখান হইয়াছে। উহার মধ্যে ফুল্‌কার নীচে যে স্থান অপেক্ষাকৃত স্থূল, এই অংশই ইহার হৃদ্‌পিণ্ডের কাজ করে। দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে অপরিষ্কৃত রক্ত উহার মধ্যে আসিয়া জমিলে, এই হৃদ্‌পিণ্ডের সঙ্কোচন ফলে ঐ রক্ত নির্গত হইয়া কান্‌কোর নীচে যে ফুল্‌কাগুলি রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ফুল্‌কাই মাছের ফুস্‌ফুসের কার্য করে। ইহার মধ্যে দূষিত রক্ত আসিয়া পানিতে দ্রবীভূত অম্লজান সহযোগে নূতন রক্তের লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এই নিমিত্ত ফুল্‌কার রং উজ্জ্বল লোহিত। রক্তধারা এখান হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় দেহের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তখন আর হৃদ্‌পিণ্ডের সহায়তার প্রয়োজন হয় না। ইহার রক্তবাহী চক্র অন্য জন্তুর ন্যায় নহে।

আমাদের দেশে না থাকিলেও, এক প্রকার মাছ দেখিতে পাওয়া যায় যাহার দেহ-মধ্যে মানব দেহের ন্যায় ফুস্‌ফুসও রহিয়াছে। মাছের সমস্ত দেহমধ্যে স্নায়ু-জালও

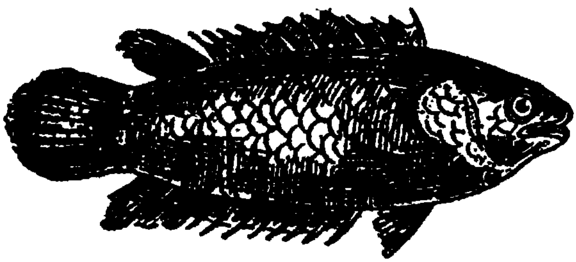

কৈ মাছ

মাগুর মাছ

ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং তাহার সাহায্যে দেহের সর্বস্থানে প্রয়োজনমতো সংবাদ-প্রেরণ কার্য চলিতে থাকে। মস্তকের অভ্যন্তর ভাগে, অস্থি বা আবরণের মধ্যে উহার মস্তিষ্ক বর্তমান এবং কান্‌কোর দুই পার্শ্বে শ্রবণেন্দ্রিয়ও রহিয়াছে। মস্তকের পুরোভাগে দুই চক্ষু ও কান, স্নায়ুসূত্রের সাহায্যে মস্তিকের সহিত সংযুক্ত। উহাদের দেহের মধ্য স্থানে একটি বায়ুপূর্ণ থলিয়া বর্তমান। ইহার মধ্যস্থিত বায়ু মাছকে পানির মধ্যে ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে; কিন্তু ইহার দ্বারা মৎস্য-দেহের নিশ্বাস কার্য চলে না। ইহাই চলিত কথায় মাছের পটকা বলিয়া পরিচিত।

মাছের বংশ-বিস্তার

মাছ বংশ-বিস্তার করে উহার ডিমের সাহায্যে। তোমরা অনেকেই মাছের ডিম খাইয়াছ। এক একটি ডিমের ছড়ায় হাজার হাজার ডিম পাওয়া যায়। ইলিশ মাছের ডিমের সংখ্যা অগণিত। এই সকল ডিম কালে মৎস্যে পরিণত হয়। ডিমের এই সংখ্যাধিক্য বশতঃ

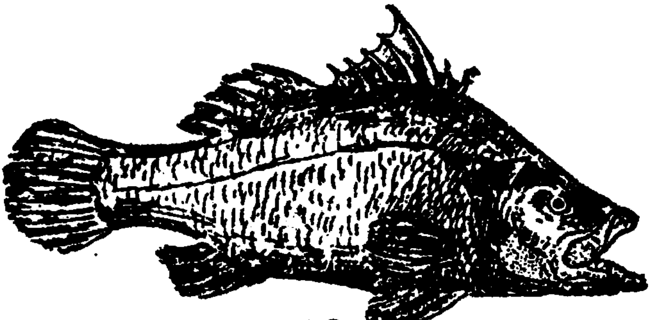

ভেটকী

প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মাছ ধরা পড়িলেও ইহার বংশ লোপ পায় না। সব মাছের ডিম একই অবস্থায় পরিণতি লাভ করে না। কোনও কোনও মৎস্য পুষ্করিণীর স্থির পানিতে ডিম পাড়িয়া সন্তান উৎপাদন করে। আবার কেহ কেহ স্রোতের পানিতে ডিম ছাড়ে এবং তাহা হইতে মৎস্য-শিশু জন্মলাভ করিয়া থাকে। ইউরোপের সামন মৎস্য

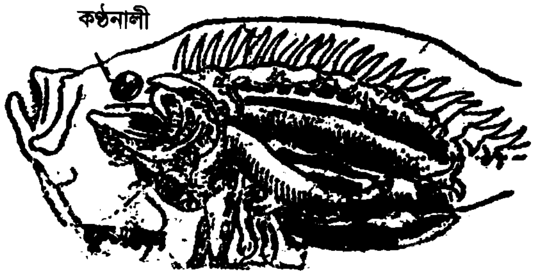

আমাদের দেশের ইলিশ মাছের ন্যায় সমুদ্র হইতে আসিয়া নদীর পানিতে ডিম ছাড়ে। আমাদের দেশেও রুই, কাতলা প্রভৃতি নদীর স্রোতেই ডিম ছাড়িয়া দেয়; এবং ঐ ডিম শিশু-মৎস্যে পরিণত হইলে, উহাকে ধরিয়া পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দিলে কিছুদিন পরে সুবৃহৎ মৎস্য পাওয়া যায়।

অধিকাংশ মৎস্যই চিরকাল পানির মধ্যে বাস করে। কিন্তু কৈ মাছ পানি হইতে উঠিয়া ডাঙ্গায়ও কিছুকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। উহাদের ফুল্‌কার পাশে একটি থলিতে, কিয়ৎ পরিমাণ বায়ু উহারা সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং পরে তাহারই সাহায্যে কিছুকাল শ্বাসকার্য চালাইয়া লয়। মাটির উপর দিয়া চলিবার সময় ইহারা কানকোর সাহায্য লইয়া থাকে। বাজারের টুকরি হইতে কিরূপ চমৎকার উপায়ে কৈ মাছ মাটির উপর দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হয়তো তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবে। এই কৈ-এর ন্যায় শিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মাছও পানির উপর হইতে বাতাস গ্রহণ করিয়া শ্বাসকার্য চালাইয়া থাকে, এইজন্য উহাদিগের দেহমধ্যে ফুল্‌কার পার্শ্বেই একটি বিশিষ্ট যন্ত্র রহিয়াছে। ফলে, এই মাছগুলিকে পানি হইতে বাহিরে আসিয়াও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়।

মাছ আমাদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। নানামাছের নানারকম আস্বাদ। ইহারা নানাবিধ পচা দ্রব্য এমন কি পুরীষও আহার করিয়া থাকে। কেহ কেহ মশার লার্ভাগুলিকে ভক্ষণ করিয়া আমাদিগকে মশার উপদ্রব হইতে রক্ষা করে। আবার কড্, হ্যালিবট প্রভৃতির যকৃৎ-নিঃসৃত তৈল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত, শিরীষ ও প্রচুর পরিমাণে তৈল বড় বড় সামুদ্রিক মাছের দেহ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভেজিটেবল ঘি নামেও রূপান্তরিত মাছের তৈল বাজারে বিক্রি হয়।

মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী জীবের তুলনামূলক পরিচয়

অমেরুদণ্ডী কেঁচো ও মেরুদণ্ডী মাছের বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে।

১। মেরুদণ্ডী জীবের শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড রহিয়াছে। উহাদিগের স্নায়বিক তন্ত্রগুলি পিঠের দিকেই বিদ্যমান থাকে, অথচ অমেরুদণ্ডী জীবের শিরদাঁড়ার অভাব-বশতঃই উহার স্নায়ুতন্ত্র পেটের দিকে থাকে।

২। অমেরুদণ্ডী জীবের চক্ষু মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন।

৩। হৃদয়ের অবস্থান সম্বন্ধে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অমেরুদণ্ডী জীবের মধ্যে যাহাদের হৃদয় রহিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের অবস্থান পিঠের দিকে, কিন্তু মেরুদণ্ডী জীবের হৃদয় ঠিক উহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ পেটের দিকেই থাকে।

৪। গলনালীর ফ্যারিংসের ছিদ্র অমেরুদণ্ডীর গলায় দেখা যায় না, কিন্তু মেরুদণ্ডী মাছের গলায় এইরূপ ছিদ্র দুই দিকেই থাকে।

সহনশীলতা

(Adaptation)

একটি চলিত কথা আছে — 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়' — কথাটি মানব দেহের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, সাধারণভাবে জীব-দেহের উপরেও ইহার তেমনি প্রয়োগ হইতে পারে। জীবমাত্রেরই ইহা আশ্চর্য ক্ষমতা যে, সে পারিপার্শ্বিকতার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয়, কারণ এই সামঞ্জস্য না থাকিলে উহার মৃত্যু অনিবার্য। গাছপালা সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি জীব-জন্তু শ্রেণীর জন্যও সেই একই কথাই খাটে। জলজ উদ্ভিদকে যেমন শুষ্ক মাটিতে বসাইয়া বাঁচান যায় না, তেমনি নভশ্চর পাখীগুলিকে ধরিয়া পানির মধ্যে রাখিলে তাহারাও বাঁচিতে পারে না। অথচ দেখা যায় যে, একটি উদ্ভিদ-শিশুর উপর এককালে অতিমাত্রায় চাপ পড়িলে, উহার ডাল-পালা বা কাণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু এই চাপের মাত্রা অল্প অল্প করিয়া বাড়াইলে ক্রমে উদ্ভিদের কাণ্ডটিকে ইচ্ছানুযায়ী বাঁকাইয়া লইতে পারা যাইবে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, অধিক পরিমাণে আফিম খাইলে মানুষ মারা পড়ে, অথচ অল্পমাত্রায় এই দ্রব্যটি গ্রহণ করিয়া মানুষ কিছুদিন পরে যথেষ্ট পরিমাণে উহা খাইতে পারে। ইহাতে মনে হয় যে, প্রাণীমাত্রেই তাহার পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে বরাবরই তৎপর। এই সমতা কিন্তু দুই রকমে রক্ষা করা যায়। প্রথমতঃ জীবমাত্রই উত্তরাধিকাসূত্রে এইগুণ লাভ করিয়া থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ ধীরে ধীরে এই শক্তি নিজেই তাহারা আহরণ করিয়া লয়।

উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়গুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমরা শীতের দিনে দেহকে নানারূপ জামাকাপড় দিয়া আবৃত করিয়া শীতের প্রকোপ হইতে নিজেকে রক্ষা করি। আবার গরমের দিনে জামাকাপড় গায়ে রাখাই কঠিন হইয়া পড়ে। মানব বুদ্ধিমান জীব, সে নানাভাবে এইরূপে নিজেকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু গরু, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুদের অনাবৃত দেহকে শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিতে হইলে স্বাভাবিক উপায়ে তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এই সকল গৃহপালিত পশুর দেহের লোম উহাদিগকে উত্তাপের তারতম্য হইতে রক্ষা করে। দেখা যায়, ঘোড়ার গায়ের লোমগুলি শীতের প্রারম্ভে দীর্ঘতম ও অধিকতর ঘন হইয়া থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মের আগমনের সহিত এই লোমগুলি দেহ হইতে পতিত হইয়া যায়। শীতের সময় দেহে আবরণের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু গ্রীষ্মের সময় আর উহার প্রয়োজন থাকে না বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

ভারবাহী পশুর স্কন্ধদেশের চামড়ার উপর ক্রমে একটি কঠিন আবরণ গঠিত হয়। কারণ ভারবহন কার্যবশতঃ স্কন্ধদেশের কোমল আবরণটি ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া তথায় কঠিন আবরণ না জন্মাইলে ক্ষত উৎপাদিত হইতে পারিত।

বিষাক্ত নানা ঔষধ, সময় সময় মানব দেহের উপকার-কল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরিমাণ অধিক হইলে দেহ ইহাকে সহ্য করিতে পারে না বলিয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু একই দ্রব্য অল্প পরিমাণে দিয়া ক্রমে দেহকে সহনশীল করিয়া লওয়া হয়, এবং তখন অধিক মাত্রায় ঐ সকল বিষাক্ত ঔষধ গ্রহণ করিতে দেহ সক্ষম হইয়া থাকে। এমনও দেখা যায় যে, অভ্যাসবশে একজন যে পরিমাণ বিষ পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে, সেই পরিমাণ বিষ অন্য লোকের পক্ষে প্রাণঘাতী হইয়া থাকে।

আরও দেখা যায় যে, কোনও পাখীকে খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখিলেই তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়। এই জন্যই বৃহত্তর খাঁচার মধ্যে পায়রা রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে; তাহারা ডিম প্রসব করে এবং তাহা হইতে ছানাও উৎপন্ন হয়; কিন্তু ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া পায়রার বংশ-বিস্তারের বাধা দেওয়া হয়।

ক্ষতস্থানের আরোগ্য ক্রিয়াও প্রকৃতপক্ষে একরূপ অবস্থান্তরিত পরিবর্তন মাত্র। তোমরা টিকটিকির কথা শুনিয়াছ কি? উহাদিগের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা কোনওরূপে লেজ হারাইলে সেই স্থানে নূতন লেজ গজাইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিকতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার প্রচেষ্টাই এই পরিবর্তনের মূল কারণ।

আমিষ জাতীয় দ্রব্য প্রাণীদেহের বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য। এই জাতীয় পদার্থ জীব দেহ হইতে বিষের আকারেও নির্গত হয়। সাপের বিষও এই জাতীয় পদার্থ, কুঁচের মধ্যেও এই আমিষ জাতীয় বিষ বর্তমান; ইহাদিগের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহারা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার ফলে তথায় একটি প্রতিরোধক পদার্থ (anti-body) প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ বিষের পরিমাণ অধিক হইলে এই পদার্থের শক্তি ব্যাহত হয়, এবং তখন জীব বিপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অল্পমাত্রায় এইসকল বিষ দেহে যে প্রতিষেধক প্রস্তুত করে, তাহার সহায়তায় পরে এই সকল বিষের অধিকতর পরিমাণের শক্তিকে রোধ করিবার ক্ষমতা লাভ করে। এই জন্য সাপের বিষ দ্বারা অশ্বের ন্যায় প্রাণীর দেহের রক্তকে বিষাক্ত করিয়া নূতন সর্পবিষ-প্রতিষেধক সিরাম প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই সিরাম মানব-রক্তে সঞ্চালিত করিয়া সাপের বিষ হইতে মানুষকে রক্ষা করা হইতেছে। এই প্রতিষেধক পদার্থগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সমতা রক্ষা করিবার জন্য দেহের আকুল প্রচেষ্টার ফলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অনেক জীবকে বাঁচিতে হইলে তাহার চতুষ্পার্শ্বের পদার্থের সহিত এমনভাবে মিশিয়া থাকিতে হয়, যেন তাহাকে শত্রুরা ধরিতে না পারে; এইজন্য দেখা যায়, স্বভাবতঃ স্বল্প-শক্তিসম্পন্ন সামুদ্রিক জীব আশপাশের গাছপালার সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া থাকে যে, শত্রু দ্বারা সহজে আবিষ্কৃত হয় না। নিজ খাদ্য আহরণ করিবার সময় তাহাদের শিকারগুলিও সহজে উহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া উহারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই পরিবর্তন সংসাধিত হয় বংশানুক্রমে অর্থাৎ নিজেকে পাশের বস্তুগুলির সহিত মিলাইয়া রাখিবার এই শক্তি উত্তরাধিকার সূত্রেই উহারা পাইয়া থাকে।

পতঙ্গ

(Insect)

শ্রেণী-বিভাগ (classification)

জীব-জগতের যাবতীয় অধিবাসীকে আমরা কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। কত শত প্রাণীই আমরা ভূ-পৃষ্ঠে দেখিতে পাই। ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে না পারিলে উহাদিগের সম্বন্ধে অধিক আর কিছু জানিবার পথে নানাবিধ অসুবিধা উপস্থিত হইতে পারে। প্রাণীবিদ এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর দেহের গঠন-প্রণালী, উহাদিগের অভ্যাস প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া উহাদিগকে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে আমরা গোড়াতেই দুইটি প্রধান শ্রেণীর উল্লেখ করিতে পারি — প্রথম অমেরুদণ্ডী বা মেরুদণ্ডহীন এবং দ্বিতীয় মেরুদণ্ডী সম্প্রদায়।

নানাবিধ প্রাণীর পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ইহাদিগের অনেকগুলির পৃষ্ঠদেশে নিম্নভাগ হইতে কটিদেশ পর্যন্ত কতকগুলি অস্থিখণ্ড দীর্ঘ একটি মালার আকারে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। কতকগুলি জন্তুর দেহে এই অস্থিমধ্যে কয়েকটি বক্ষ-পঞ্জরের অস্থিখণ্ডগুলির সহিত সংযুক্ত। এই দীর্ঘ দণ্ড সদৃশ অস্থিমালাই মেরুদণ্ড নামে অভিহিত। যাহাদের দেহে এইরূপ অস্থিময় দণ্ড বিদ্যমান, তাহারাই মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং যাহাদিগের দেহে এইরূপ অস্থির সমাবেশ দৃষ্ট হয় না, তাহারাই মেরুদণ্ডহীন জীব। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে মাছ, ব্যাং, সাপ, পায়রা, মুরগী, গরু, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই অন্তর্ভুক্ত। কেঁচো, মৌমাছি, পিপীলিকা, মাকড়সা, মশা প্রভৃতি কিন্তু অন্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মনে হয়, এই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সকলগুলিই একরূপে জীবনযাপন করে না। ইহাদিগকে জীবনযাপনের বিভিন্ন ব্যবস্থা অনুসারে পুনরায় অনেকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন জলচর, মৎস্য, সরীসৃপ, চতুষ্পদ, পক্ষী প্রভৃতি। মেরুদণ্ডহীন প্রাণীগুলিও ঐরূপে নানাভাগে বিভক্ত। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে, আমরা কতকগুলির জীবন-কথা এখানে আলোচনা করিয়া তোমাদিগকে ইহাদিগের বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

যে সকল মেরুদণ্ডহীন প্রাণী গ্রন্থিযুক্ত পদবিশিষ্ট তাহাদিগকে আর্থ্রোপড্‌স (arthropods) বা সন্ধিপদী বলা হইয়া থাকে। মাছি, মৌমাছি, প্রজাপতি, পিপীলিকা, মশা — ইহারা সকলে এই শ্রেণীভুক্ত। চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি জলজ জীবও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তবে পূর্ববর্ণিত প্রাণীগুলি পতঙ্গ বা insecta নামীয় উপশ্রেণীর অন্তর্গত, এবং শেষোক্ত প্রাণীগুলি ক্রাস্‌টেশিয়া (crustacea) উপশ্রেণীভুক্ত। আবার ইহারই মধ্যে বহু-পদী (centipede) উপশ্রেণী এবং এরাক্‌নিদ (arachnid) উপশ্রেণীও বর্তমান।

পতঙ্গ-দেহের বিবরণ (Description of Insect body)

আমরা এখানে বিশেষভাবে এই পতঙ্গ উপশ্রেণীর কথাই বর্ণনা করিব। মাছি, মৌমাছি প্রভৃতি যদিও জন্ম হইতে দেহের পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত ঠিক একইভাবে অগ্রসর হয় না, তাহা হইলেও উহাদিগের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় দেহের গঠনে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে; প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যগুলি একে একে পরে বলিব, কিন্তু দেহের গঠনের কথা প্রারম্ভে বলিলেই যেন সুবিধা হয়।

মাছি (The House fly)

পর পৃষ্ঠায় একটি মাছির ছবি দেওয়া হইয়াছে; উহারই পার্শ্বে ও পর পৃষ্ঠায় অন্য কতকগুলি পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের ছবি দেওয়া হইল। এই ছবিগুলি পরীক্ষায় দেখিতে পাইবে, ইহাদিগের গঠনপ্রণালী প্রায় একরূপ। প্রত্যেকের দেহকেই তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; প্রথম মস্তক, দ্বিতীয় বক্ষ-গহ্বর (thorax) তৃতীয় উদর (abdomen)।

মাছি

মৌমাছি

মাছি, মৌমাছি, প্রজাপতি পিপীলিকা, মাকড়সা ইহাদিগের মস্তকের সম্মুখে দুইটি দীর্ঘ শুঁড় রহিয়াছে। ইহা স্পর্শনেন্দ্রিয় (antannae) নামে পরিচিত। এইগুলি উহার মুখ-গহ্বরের বহির্দেশে সংযুক্ত। মাছির মুখের উভয় পার্শ্বে দুইটি চক্ষু বর্তমান। এই চক্ষু দুইটির মধ্যে, অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য লেন্স (lens) রহিয়াছে, ফলে ইহারা একই পদার্থের বহু সংখ্যক চিত্র দেখিয়া থাকে। ইহাই উহার কম্পাউন্ড নেত্র বা (compound eye) পুঞ্জাক্ষি। এই দুটি পুঞ্জাক্ষি ব্যতীত আরও তিনটি চক্ষু ইহাদিগের মধ্যবর্তী স্থানে বর্তমান রহিয়াছে। মক্ষিকার মস্তকে স্পর্শনেন্দ্রিয় দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এগুলি কখনও মসৃণ এবং কোনও কোনও পতঙ্গের মুখে ইহাদিগকে লোমশ দেখিতে পাওয়া যায়।

পতঙ্গের মস্তক

পতঙ্গমাত্রেরই মুখটি আকারে ক্ষুদ্র এবং তিন জোড়া চোয়ালবিশিষ্ট অধরোষ্ঠের চলাচল কতকটা কাঁচির ন্যায়। ইহাদিগকে কাহারও মুখ এমনভাবে প্রস্তুত যে, তদ্দারা কেবল

চোষণ কার্য চলিতে পারে এবং কাহারও মুখ চিবাইয়া খাওয়ার উপযুক্ত। মৌমাছি ফুলের মধ্য হইতে মধু আহরণ করে; সুতরাং ইহার মুখে মধুপান করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগের মুখের সহিত একটি দীর্ঘ অথচ সূক্ষ্ম নলের ব্যবস্থা

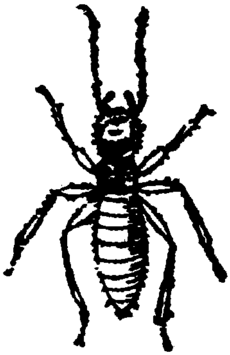

পিপীলিকা

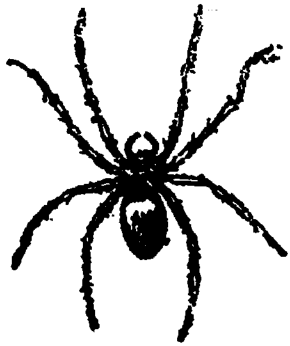

মাকড়শা

রহিয়াছে; উহাকে ফুলেল মধুভাণ্ডে প্রবেশ করাইয়া ইহারা তরল মিষ্ট সারকে টানিয়া লয়। এই নলটি প্রবোসিস্ (proboscis) নামে পরিচিত। সাধারণ মাছির মুখে যে প্রবোসিস্ বর্তমান, তাহাকে উহারা অব্যবহারকালে ইচ্ছামতো গুটাইয়া রাখে। পতঙ্গের মধ্যে অনেকেই পাতা প্রভৃতি খাইয়া জীবনধারণ করে; কিন্তু অনেক পতঙ্গ ক্ষুদ্রতর অন্য কীট ও পতঙ্গকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। মাছির মুখ তরল দ্রব্য চুষিবার উপযুক্ত কিন্তু মশা বা ডাঁশ উদ্ভিদ অথবা প্রাণী দেহ হইতে রস বা রক্ত শোষণ করে বলিয়া উহাদের মুখে ছিদ্র করিবার সূচ সদৃশ নল রহিয়াছে। মশার মুখে নলের মধ্য দিয়া অন্য দ্রব্যও মানব দেহে প্রবেশ করে বলিয়া কোনও কোনও মশার কামড়ে জ্বালা করে। মৌমাছি প্রভৃতি যে হুল ফোটায় তাহা মুখে থাকে না, উহার লেজে থাকে।

পতঙ্গের বক্ষগহ্বর (Thorax)

পতঙ্গ-দেহের দ্বিতীয় অংশে, বক্ষঃস্থলের সহিত উহাদিগের পাখা এবং পদগুলি সন্নিবেশিত রহিয়াছে; পদগুলি সংখ্যায় ছয়টি, কিন্তু পাখার সংখ্যা চারটি মাত্র। মাছির দেহে আমরা বেশ বড় দুইটি পাখা দেখিতে পাই। এই পাখাগুলির মূলে আরও দুইটি ক্ষুদ্র পাখাও রহিয়াছে, আবার কোনও কোনও পতঙ্গ-দেহে পাখা একেবারেই নাই। বৃহত্তর জন্তু-দেহে বক্ষঃস্থলের মধ্যেই শ্বাসযন্ত্র আবদ্ধ থাকে; পতঙ্গ-দেহে কিন্তু সেরূপ কোনও যন্ত্র নাই। ইহার শ্বাসকার্য, সমস্তই দেহ মধ্যে অবস্থিত কতকগুলি সূক্ষ্ম নলের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে, এই নলগুলি শ্বাসনালী (trachea) নামে পরিচিত।

ইহার সহিত উহার দেহের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত শ্বাসরন্ধ্র (stigmata) নামে পরিচিত ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি যুক্ত রহিয়াছে।

পতঙ্গ-দেহের পাখার উপরও এই নলগুলি একটি জালের আকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। দেহমধ্যে হৃদ্‌পিণ্ড যন্ত্রটি অপেক্ষাকৃত সরল, একটি নাতিদীর্ঘ বেলন সদৃশ নল। ইহার মধ্য হইতে বর্ণহীন রক্তস্রোত নির্গত হইয়া দেহমধ্যে প্রবাহিত হয়, কিন্তু এই রক্তকে বহন করিবার জন্য কোনও বিশিষ্ট শিরা বা উপশিরা ইহাদিগের দেহের মধ্যে নাই।

মৌমাছির স্নায়ুমণ্ডলী

পতঙ্গের উদর (abdomen of an insect)

কতকগুলি অর্ধবৃত্তাকৃতি খণ্ড (segment) মিলিয়া ইহাদিগের উদরদেশ নির্মিত। এগুলির সংখ্যা প্রায়ই নয়টি দেখা যায়। ইহারই শেষ প্রান্তে ইহাদিগের কাহারও কাহারও হুল বর্তমান, এবং উহাদিগের স্নায়ুসূত্রগুলি দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত আটটি স্নায়ুমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া দেহময় ছড়াইয়া রহিয়াছে। উপরের চিত্রটিতে মৌমাছির দেহের স্নায়ুসূত্রগুলি দেখান হইয়াছে।

প্রজাপতি (Butterfly)

পতঙ্গদেহের বিবরণ অবগত হইলেই উহার সম্বন্ধে সকল তথ্য জানা যায় না। পূর্বের বর্ণনামতো প্রায় প্রত্যেক পতঙ্গের দেহের গঠন জানা যাইবে। কিন্তু এই বিবরণ পরিণতবয়স্ক পতঙ্গ সম্বন্ধে খাটে। মানব-শিশু অথবা ছাগশিশু জন্মগ্রহণ করিতেই তাহাকে মাতাপিতার প্রতিকৃতির অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য তাহাদিগের চেহারা সম্পূর্ণরূপে মিলিবে না; কিন্তু তবুও দেহের যাবতীয় গঠন-প্রণালী একরূপ মনে হয়। এমন কি, ডিম হইতে যখন একটি মুরগীর ছানা নির্গত হয়, তখন তাহার দেহ একরূপ নূতন লোমে আবৃত থাকিলেও উহাকে মুরগীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

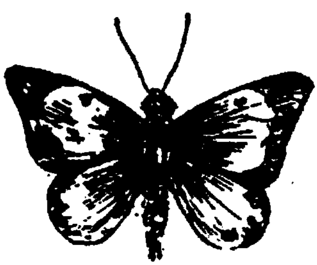

প্রজাপতি

ক্রমপরিবর্তন (Metamorphosis)

কিন্তু পতঙ্গ-শিশু সম্বন্ধে এই একই কথা খাটে না। পতঙ্গ জীবনের শেষ পরিণতি সন্তানোৎপাদন কার্য, কতকগুলি ডিম প্রসব করিয়াই শেষ হইয়া যায়। ইহার ডিম, দেওয়া শেষ হইলেই পতঙ্গ-মাতার পার্থিব জীবনও প্রায় শেষ হইয়া যায়। এই ডিম হইতে প্রথম যে শিশু-পতঙ্গ নির্গত হয়, তাহাকে দেখিলে পতঙ্গশিশু বলিয়া মোটেই ধারণা করা যায় না। কিন্তু দেহের ক্রমপরিবর্তনের ফলে, অবশেষে উহাই পতঙ্গের আকার প্রাপ্ত হয়। সর্বপ্রথম তোমাদিগকে প্রজাপতির ক্রমপরিবর্তন বা রূপান্তরের কথা বলিব। প্রজাপতি নানা বর্ণের এবং নানা শ্রেণীর। আমরা এখানে রেশমের গুটি-পোকার আলোচনাই বিশেষভাবে করিব। রেশমের মথ শিরোনামের পরের অনুচ্ছেদে ইহার রূপান্তরের বিভিন্ন স্তর দেখা হইয়াছে।

রেশমের মথ

তোমরা হয়তো জান একরূপ বিশিষ্ট গাছের পাতা খাওয়াইয়া রেশমের পোকাগুলিকে বড় করা হয়। এই গাছগুলি তুঁত গাছ নামে পরিচিত। প্রজাপতি-মাতা এককালে সংখ্যায় প্রায় ৩০০ হলদে রং-এর গোলাকার ডিম প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ডিম হইতে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমহীন নাতিদীর্ঘ দেহ-বিশিষ্ট কীটের জন্ম হয়। এই কীটই শূককীট বা লার্ভা (larva) নামে অভিহিত। ইহাদিগকে পলু-পোকাও বলে।

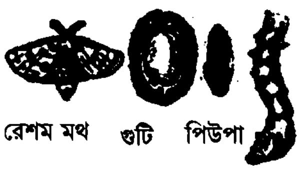

রেশমের গুটিপোকার ক্রমপরিবর্তন

এই কীটেরা জন্ম হইতেই প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিতে থাকে এবং অল্পকালের মধ্যেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। এই সময়ে অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিবার কারণ এই যে, ইহার অল্প কিছুদিন পরেই উহারা আর খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্যই অনাগত দিনের সংস্থান কিছু সংগ্রহ করিতে না পারিলে চলিবে কেমন করিয়া? শূককীট অবস্থা হইতে ক্রমে ইহারা দ্বিতীয় অবস্থায় আগমন করে। এই সময় সুপুষ্ট কীটগুলি নিজ দেহের চতুর্দিকে একরূপ সূতার ন্যায় দেহ্-নির্গত পদার্থ জড়াইয়া অপেক্ষাকৃত ঘোরতর বর্ণের পুত্তলি বা পিউপায় (chrysallis or pupa) পরিণত হয়। এই পিউপা নিজ দেহের চতুর্দিকে যে সূত্রজাল বিস্তার করে, ক্রমে তাহারই মধ্যে সে নিজেও অবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই সময় উহাকে গুটির আকারে দেখা যায়। এই গুটিটির চতুর্দিকই বদ্ধ। ইহার মধ্যে অবস্থানকালে পতঙ্গটির দেহে পক্ষ উদ্ভিন্ন হয় এবং সে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়া তাহার শৈশবে আহৃত খাদ্য দ্বারাই পুষ্টি লাভ করে ও দেহের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাহার পর দিনের আলোর জন্য তাহার কি বিরাট আগ্রহই অন্তরে জাগে। ফলে সে তাহার চতুর্দিকের রেশমের আবরণের অল্প অংশ কাটিয়া ফেলে এবং একদিন এই কাটা মুখের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পরই তাহার মাতৃত্বের প্রবল আগ্রহের বশে নূতন সৃষ্টির চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, ডিম প্রসব করে এবং জীবনের কর্তব্য সমাধা করিয়া কোন সুদূর অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় কে জানে?

এই গুটির চতুর্দিকে যে আবরণ তাহারা প্রস্তুত করে, মানবের হাতে তাহাই রেশমরূপে তাহার দেহের সৌন্দর্য-বর্ধনে নিয়োজিত হয়। রেশম-মথ গুটি কাটিয়া বাহিরে আসিলে এই কাটা গুটিতে আর দীর্ঘ রেশম-সূত্র পাওয়া যায় না; এই নিমিত্ত কীটগুলি যখন গুটি পূর্ণভাবে প্রস্তুত করিয়া ফেলে, তখন উহাদিগকে ঐ গুটিসমেত উত্তপ্ত পানি অথবা উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পে (steam) রাখিয়া মারিয়া ফেলা হয়। অবশ্য সবগুলিকে এইরূপে না মারিয়া, পুনরায় ডিম পাড়িবার জন্য আংশিকভাবে উহাদিগকে রাখিয়া, প্রজাপতিরূপে বাহিরে আসিতে দেওয়া হয়। প্রজাপতি দেহের ক্রমপরিবর্তন এই প্রকারে ঘটিয়া থাকে। কীটাবস্থায় উহার দেহের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দুইটি গণ্ড (gland) হইতে একরূপ পীত বর্ণের লালা নিঃসৃত হয়; উহাই পরে রেশম সূত্রে পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই গণ্ড হইতে যে পথে লালাটি নির্গত হয়, তাহাকে স্পিনারেট (spinneret) বলে। প্রত্যেকটি রেশম-কীট গড়ে প্রায় ১২০০ গজ দীর্ঘ রেশমের সূত্র প্রস্তুত করে।

রেশম-কীট তুঁত গাছের পাতা ভক্ষণ করিয়া পুষ্টি লাভ করে। এই জন্যই যে সকল দেশে তুঁতগাছ অধিক জন্মায়, রেশমের চাষও সেই সকল দেশে অধিক হইয়া থাকে। চীন দেশে বহুকাল পূর্বেও রেশমের চাষ হইত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলায় এবং বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় এখন অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বর্তমানে একরূপ রাসায়নিক পদার্থ হইতেও এক প্রকার রেশম সদৃশ সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহা কিন্তু কীটজাত রেশম নহে; ইহাই কৃত্রিম রেশম নামে পরিচিত। ভবিষ্যতে তোমরা ইহার বিশিষ্ট পরিচয় পাইতে পারিবে। কৃত্রিম রেশম ও প্রকৃত স্বাভাবিক রেশম দেখিতে অনেকটা এক রকম হইলেও স্বাভাবিক রেশম পোড়াইলে তাহা পোড়া পালকের গন্ধ ছাড়ে কিন্তু কৃত্রিম রেশম ঐরূপ গন্ধ দেয় না। আরও একরূপ রেশম সদৃশ সূত্র কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হয় তাহাকে নাইলন বলে।

মৌমাছি

বাল্যকালে পঠিত — 'মৌমাছি, মৌমাছি, কোথা যাও নাচি নাচি, দাঁড়াও না একবার ভাই' — কবিতাটি হয়তো তোমাদের মনে আছে। মৌমাছি তোমাদের সুপরিচিত। কত গল্প, কত কবিতা এই ছোট পতঙ্গটির সম্বন্ধে তোমরা ইতঃপূর্বে পড়িয়াছ। তাহার উপকার করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে নানা কথাই তোমরা শিখিয়াছ। আজ সে সব কথা তোমাদিগকে বলিব না। আমি এখানে তাহাদের ঘরের কথা ও বংশের বিবরণ কিয়ৎ পরিমাণে দিবার চেষ্টা করিব। গুণ গুণ করিয়া মৌমাছির দল ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিয়া তাহার বিরাট ছয়-কোণা ঘরে পূর্ণ চাক বা বাসাটিতে গিয়া উপস্থিত হয়, আবার উড়িয়া চলে। এই সকল ব্যাপার এমনি দেখা যায়; তার জন্য গবেষণা বা চিন্তার দরকার হয় না। আমরা উহার চাকের সংবাদটা প্রথম লইব।

মৌচাক (bee-hive)

এখানে অনেকগুলি মৌমাছি একত্রে বাস করে। মানুষ একসঙ্গে এতগুলি বাস করিতে পারে না, তাহারা নানারূপ বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করে। অথচ এই ক্ষুদ্র পতঙ্গগুলি একত্রে বাস করিয়া বেশ সহজভাবে জীবন যাপন করে মনে হয়। মানুষ বুদ্ধিমান জীব, তাহার শক্তিও সীমাবদ্ধ নহে; আজ যে সামান্য প্রজা, কাল সে নিজ ক্ষমতায় সিংহাসনও অধিকার করিতে পারে। প্রকৃতি মানব-সৃষ্টির সময় এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং যে অধিক পরিমাণে শক্তি আহরণ করে, সেই তাহার পার্শ্ববর্তী দুর্বল প্রতিবেশীকে পরাভূত করিয়া রাখে।

মৌমাছির শ্রেণীবিভাগ (classification of bees)

কিন্তু মৌমাছির বেলায় দেখা যায় যে, স্বাভাবিক উপায়েই ইহারা কতকগুলি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম রাণী মৌমাছি, ইহার কাজ বংশবৃদ্ধি করা মাত্র, অর্থাৎ ডিম পাড়িলেই তাহা হইতে সন্তান উৎপাদন কার্য ব্যতীত আর কোনও কাজ এই রাণী মৌমাছি করে না। পুরুষ মৌমাছি বা ড্রোন (drone), রাণী মৌমাছি অপেক্ষাও আকারে বড়, ইহারা কোনও কাজ করে না, কেবলমাত্র রাণী মৌমাছির সঙ্গ প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় এবং একবার এইরূপ সঙ্গম লাভ করিলেই রাণী মৌমাছির ডিম উর্বরতা লাভ করে। কিন্তু এই সম্মিলনের পর ড্রোনটি প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাধারণতঃ ড্রোনগুলিকে খাদ্য দান করিলেও যখন খাদ্যবস্তু কমিয়া আসে এবং ফুল হইতে খাদ্য-আহরণ কষ্টসাপেক্ষ হয়, তখন ফৌজ-মৌমাছিরা সকলে মিলিয়া এই পুরুষ মৌমাছিকে মারিয়া ফেলে। তোমরা জান, মৌমাছির দেহে হুল ফুটাইবার

যন্ত্র আছে; তাহার দ্বারাই উহারা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু পুরুষ মৌমাছির আত্মরক্ষার এই সরঞ্জাম নাই। এইজন্যই যুদ্ধে বরাবরই তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। মৌমাছিদের তৃতীয় দলই সাধারণ ফৌজ-মৌমাছি। ইহারা কর্মী মৌমাছি নামেও পরিচিত। তাহাদিগকেই তোমরা চতুর্দিকে উড়িয়া বেড়াইতে দেখ। প্রত্যেকটি মৌচাকে একটি রাণী মৌমাছি এবং একটি পুরুষ মৌমাছি থাকে। অপরগুলি সবই এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী ফৌজ। এই কর্মী ফৌজগুলি প্রকৃতপক্ষে অপরিণত স্ত্রী মৌমাছি। ইহারা ডিম প্রসব করিতে পারে না, কেবলমাত্র খাটিয়া খাটিয়া তাহাদের পতঙ্গ-জীবন শেষ করে। কর্মী ফৌজগুলির একদল পুষ্প হইতে মধুর রস (nectar) আহরণ করিয়া তাহাকে মধুতে পরিণত করে; দ্বিতীয় দল প্রসূত ডিমগুলিকে লালন-পালন করে; এবং অন্যদল উহাদের চাকের ছয়-কোণা ঐ ঘরগুলি প্রস্তুত করে। কেহ মোম তৈয়ার করিতেছে, এবং কেহ বা সান্ত্রীর কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে।

মৌমাছি পরিবারের দৈনন্দিন জীবন এইরূপে কাটিয়া যায়। রাণী মৌমাছি যে ডিমগুলি প্রসব করে, তাহার মধ্যে কয়েকটি থাকে অধিকতর পুষ্ট, এবং এইগুলিকে অতি যত্ন সহকারে পালন করা হয়; ইহা হইতেই রাজকন্যাদের জন্ম হইয়া থাকে। রাজকন্যারা পরিণত বয়স প্রাপ্ত হইলেই, নিজ কাজ শেষ করিয়া, রাণী মৌমাছি এক মৌচাক হইতে অন্যত্র গমন করে, এবং নবজাত এই রাজকন্যাদের একজন মৌচাকের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে, ও অপর রাজকন্যাদের মারিয়া ফেলা হয়। এইভাবেই মৌমাছি-জীবনের একতা রক্ষা হইয়াছে।

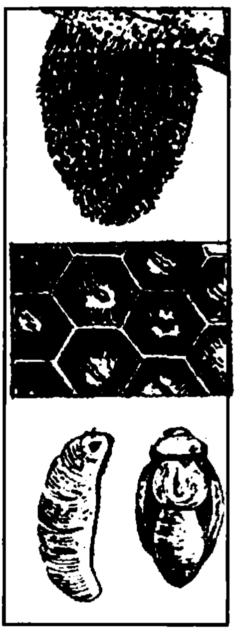
উপরে মৌচাক-নিম্নে মৌমাছির অপরিণত শিশু

মৌমাছির ক্রমপরিবর্তন (metamorphosis of the bee)

মৌমাছির দেহও ক্রমপরিবর্তনের ফলে গঠিত হয়; ক্ষুদ্র একটি ডিম মৌচাকের ছয়-কোণবিশিষ্ট একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে।

মৌমাছি শিশুর লালন-পালন কালে উহাদিগকে কর্মী-মৌমাছিরা নিজ মুখের রস খাওয়াইতে থাকে। দুইতিন দিন পরে তাহাদিগের অনেকে নিজেরাই মধু ও পুষ্প-পরাগ আহার করিতে পারে। যাহারা কর্মী মৌমাছির মুখ-মধুর দ্বারা পালিত হয় তাহারাই পরে রাণী মৌমাছিতে পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিক সংখ্যক মৌমাছি পিউপা অবস্থায় পরিণত হইতেই তাহাদিগকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া কর্মী মৌমাছি ঐ ঘর মোম দ্বারা বন্ধ করিয়া দেয়। উহার অভ্যন্তরে মধু-মিশ্রিত পুষ্প-রেণু আহার করিয়াই

পিউপাগুলি বাড়িতে থাকে। প্রায় দ্বাদশ দিন পরে মৌমাছি-শিশু আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। ইহার দেহের পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি। মাত্র দুই-একটি কথা বলিলেই উহার বিশেষত্বগুলি বলা হইবে। উহার বক্ষদেশে দুইটি ডানা সংযুক্ত। এই ডানা দুইটির সহিত আরও দুইটি ডানা দুই পার্শ্বে যুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ মোটের উপর উহার ডানার সংখ্যা চারিটি। ইহার দেহের অভ্যন্তরে একরূপ বিষাক্ত পদার্থ রহিয়াছে। উহা একটি কাঁটাযুক্ত নল সাহায্যে তাহার শত্রু-দেহে পরিচালনা করিতে পারে। এই কাঁটাযুক্ত নলটিই হুল, উহাদিগের উদরের শেষপ্রান্তে উহা অবস্থিত।

প্রবোসিসের সাহায্যে পুষ্প হইতে মধুরস টানিয়া উহারা নিজ দেহ-মধ্যস্থিত মধুভাণ্ড পূর্ণ করে এবং তথায় এই মিষ্ট রস প্রকৃত মধুতে পরিণত হয়। এই মধু পরে উহারা মোম-নির্মিত উহাদিগের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ঢালিয়া দেয়। মৌমাছির চাক ভাঙ্গিয়া এই মধুই মানুষ আহরণ করে।

পিপীলিকা

পিপীলিকা একটি সঞ্চয়ী জীব। ইহারা সারা বৎসর খাটিয়া খাদ্যবস্তু আহরণ করে এবং খাদ্যাবশিষ্ট সংগ্রহ করিয়া, নিজ মৃত্তিকা নিম্নস্থ গৃহে রাখিয়া দেয়। ইহারাও একত্র দলভুক্ত হইয়া বাস করে, এবং জীবনযাপনের জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন, সেই সকল কার্য নিজেদের মধ্যে বিভিন্নভাগে ভাগ করিয়া লয়। কর্মী শ্রেণীভুক্ত পিপীলিকার দল খাদ্য আহরণ প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকে। নিম্নে তিন শ্রেণীর পিপীলিকার চিত্র প্রদত্ত হইল। আকারে ইহারাও অন্য পতঙ্গের অনুরূপ।

পিপীলিকার ক্রমপরিণতি (metamorphosis of an ant)

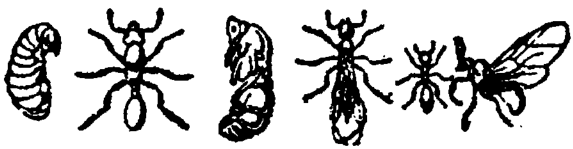

লার্ভা   পক্ষহীনা স্ত্রী   পুপা   পূর্ণাঙ্গী স্ত্রী কর্মী   পুরুষ
বিভিন্ন শ্রেণীর পিপীলিকা

পিপীলিকা ক্রমপরিবর্তনের ফলে পুষ্টিলাভ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ডিমগুলি প্রথমে শূককীটে পরিণত হয় এবং পরে পুত্তলিতে রূপান্তরিত হইতে থাকে। এবং অবশেষে উহা হইতেই পূর্ণ পিপীলিকা নির্গত হয়। ইহাদিগের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রী-পিপীলিকার ডানা উৎপন্ন হইতে থাকে, কিন্তু কর্মী শ্রেণী ডানা-বিহীন। ডানা উৎপন্ন হইলে, পুরুষ এবং স্ত্রী-পিপীলিকা দল বাঁধিয়া ভূগর্ভস্থ আবাসস্থল হইতে নির্গত হয় এবং পুরুষ ও স্ত্রীর সম্মিলন ঘটে। এইবার যখন স্ত্রী-পিপীলিকা ডিমভারে ভারাক্রান্ত, সেই সময় উহাদিগের ডানা দুইটি পড়িয়া যায় এবং ডিম পাড়িবার জন্য উহারা নূতন স্থানের সন্ধানে নিযুক্ত হয়।

ইহাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় সাতিশয় তীক্ষ্ণ শক্তিসম্পন্ন। পিপীলিকাদিগের ঘ্রাণশক্তিও তীব্র। এই দেহযন্ত্রগুলি ইহাদিগের মস্তকের পুরোভাগে অবস্থিত। স্পর্শনলের সাহায্যে ইহারা আঘ্রাণের কার্য সম্পাদন করিতে পারে এবং মুখে দুই পার্শ্বে যে স্নায়ু-সূত্রের গ্রন্থিগুলি অবস্থিত, তাহার সাহায্যে ইহারা আস্বাদ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। মোটের উপর পতঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে পিপীলিকার স্বাভাবিক বুদ্ধি বেশ ভালরূপে পরিপুষ্ট বলিয়া

মনে হয়। ইহাদিগের দৈহিক শক্তিও অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি। একটি শক্তিশালী অশ্ব নিজদেহের ওজনের ৭ গুণ ভার বহন করিতে পারে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, পিপীলিকারা নিজ দেহের ১৪ হইতে ২৬ গুণ ভারী পদার্থ অনায়াসে বহিয়া লইয়া যায়।

পিপীলিকা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি চমৎকার কথা বলিতে পারা যায়। সাধারণতঃ ইহারা একই দলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ইত্যাদি না করিলেও, সময় সময় অন্য দলের সহিত যুদ্ধ বাধায় ও বিজিত দলের সঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী এমন কি ডিমগুলি পর্যন্ত লুটিয়া লইয়া যায়। ডিম ও বাচ্চাগুলিকে কিন্তু যত্নসহকারে পালন করিয়া পরে নিজ দলের কর্মী শ্রেণীতে উহাদিগকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইহারা বর্ষার পূর্বে কৃষিকার্যের অনুকরণে কখনও একরূপ বেঙের ছাতার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছের বীজ মাটিতে ছড়াইয়া রাখে; গাছ হইলে প্রাণ ভরিয়া তাহা আহার করে। আবার কেহ কেহ, মধু পান করিতে পারে এইরূপ অন্য পতঙ্গকে নিজ দলে রাখিয়া, ইহাদিগের দেহ হইতে মধু পান করিয়া থাকে। এ সকল অতিশয় আশ্চর্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও সবই সত্য।

পিপীলিকা ও মৌমাছির তুলনা করিলে আমরা কয়েকটি বিষয় এইরূপ লক্ষ্য করিয়া থাকি।

১। বিভিন্ন শ্রেণীর পিপীলিকা ও মৌমাছির আকার দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, রাণী-পিপীলিকা সর্বাপেক্ষা বড় ও পুরুষ সর্বাপেক্ষা ছোট, কিন্তু মৌমাছির বেলায় পুরুষ-মৌমাছি সর্বাপেক্ষা বড় ও কর্মীদের সর্বাপেক্ষা ছোট দেখা যায়।

২। পিপীলিকার পুরুষ ও স্ত্রীর দুই জোড়া করিয়া ডানা আছে, শ্রমিকের তাহা নাই, কিন্তু সর্বশ্রেণীর মৌমাছির ডানা বিদ্যমান।

৩। পিপীলিকা ও মৌমাছির মুখের গড়ন বিভিন্ন।

৪। পিপীলিকাদিগের অধিকাংশের দেহেই হুল নাই, কিন্তু শ্রমিক মৌমাছিদের লম্বা হুল রহিয়াছে, রাণীর হুল অপেক্ষাকৃত ছোট, পুরুষ মৌমাছির কিন্তু একেবারেই হুল নাই।

৫। পিপীলিকার দুইটি চোখ, মৌমাছির কিন্তু পাঁচটি চোখ, দুইটি বড় ও তিনটি ছোট।

মশা

মাছি আর মশার ন্যায় বড় শত্রু মানবের আছে কি না সন্দেহ। ইহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মানবের শত্রুতা সাধন করে। মাছি উড়িয়া গিয়া ময়লার স্তূপে বসে, আর সেখান হইতে যত রাজ্যের আবর্জনা, শত রোগের ভীষণ জীবাণুগুলি, নিজের ঐ ছয়খানি পায়ে মাখিয়া মানুষের আহার্য পানীয় প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থকে, কেবল অপবিত্র করে না, তাহাদিগকে বিষাক্তও করিয়া তোলে। মশা রক্তপায়ী জীব, — মানবদেহের কোমল চর্মের মধ্য দিয়া তাহার মুখস্থিত আহার্যবাহী নল প্রবেশ করাইয়া রক্ত টানিয়া লয়। এই দংশনের ফলে রক্ত তো যায়ই, উপরন্তু উহার মুখ হইতে বিষ-বস্তু আসিয়া সুস্থ দেহে রোগের সঞ্চার করে।

দেহের গঠন-ভেদে মশাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে এনোফিলিস, ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত শোষণকালে, উহার দেহ হইতে ম্যালেরিয়ার যে বীজাণু গ্রহণ করে, তাহাই পরে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। এই পরম সত্য বহুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে, কলিকাতার মেডিকেল কলেজে কার্য করিবার সময় স্যর রোনাল্ড রস প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং পরবর্তী যুগে এই মহা সত্যের আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীগণ রোগ নিবারণ করিয়া শত শত লোকের প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ নোবেল ফাউন্ডেশন সোসাইটি, এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার দ্বারা স্যর রসকে সম্মানিত করেন। স্টেগোমিয়া মশক, এইরূপ পীত জ্বরের জীবাণু বহন করিতে পারে; উহাদের অন্য শ্রেণী, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগের জীবাণু বহন করিয়া বেড়ায়। এই ভীষণ জীবগুলির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার।

মশার দেহ

মশাও পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত। উহার দেহের গঠন, পূর্ববর্ণিত অন্যান্য পতঙ্গেরই যে অনুরূপ, তাহা পূর্বেই দেখিয়াছ। তবে উহাদের পক্ষ-সংখ্যা দুইটি; এই জন্য উহারা দ্বিপত্রী বা ডিপটেরা (diptera) বলিয়া পরিচিত। আর একজোড়া পক্ষের স্থানে যে দুইটি যন্ত্র উহার পক্ষদেশের মূলে অবস্থিত তাহাদিগকে হলটেয়ার্‌স (halteres) বলে। মুখের গঠন সর্বপ্রকার মশার একরূপ নহে। পুরুষ-মশা রক্তপায়ী নহে, উহারা গাছপালার রস আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করে। সুতরাং উহাদিগের মুখে রক্ত শোষণ করিবার কোনও ব্যবস্থা নাই। স্ত্রী-মশাই বিপদের প্রধান কারণ, ইহারাই মানবের রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মস্তকের পুরোভাগে, চক্ষু দুইটির সম্মুখে, স্পর্শ-নলের সঙ্গে আরও ৭টি প্রায় সমদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট প্রবোসিস্‌ নল অবস্থিত। তাহাদের মধ্যে ছয়টি নল চামড়ার মধ্যে কিছু দূরে গমন করিয়া রক্ত টানিতে থাকে, সপ্তমটি বাহিরেই থাকে, এবং রক্ত শোষণকালে ইহাকে ধনুকের ন্যায় বাঁকান দেখা যায়।

মনে হয়, ইহার বক্ষঃস্থল তিনটি বৃত্তখণ্ডের সহযোগে নির্মিত। ইহাদিগের প্রত্যেক খণ্ডের সহিত দুইটি করিয়া পা সংযুক্ত এবং উহাদিগের উপরিভাগের ডানা দুইটি জোড়া রহিয়াছে। বক্ষঃস্থলের পুরোভাগে এবং দেহের মধ্যে কতকগুলি লালা-নিঃসারক গণ্ড রহিয়াছে। ইহারই মধ্যে একরূপ তৈল জাতীয় পদার্থ থাকে। মশা যে স্থানে দংশন করে, তথায় এই লালা গিয়া প্রবিষ্ট হয়। কোনও কোনও মশার লালায় একরূপ বিষাক্ত পদার্থ থাকে; যখন চামড়ার নীচে এই পদার্থের স্পর্শ ঘটে, তখন অতিশয় জ্বালা অনুভূত হয়। অবশ্য সব জাতীয় মশার দেহে এই পদার্থটি থাকে না; কিউলেক্স (culex) জাতীয় মশারই ইহা বিশেষত্ব।

মশার ক্রমপরিবর্তন (metamorphosis of the mosquito)

মশার দেহ ক্রমপরিবর্তনের ফলেই গঠিত হয়। স্ত্রী-মশার উদরের শেষ প্রান্তে থাকিয়া ডিম্বগুলি পুষ্ট হইতেই তাহারা পানির উপর এই ডিম্ব ছাড়িয়া দিয়া আসে। অবশ্য তাহারা দেখিয়া শুনিয়া স্থির পানি, যেমন পুষ্করিণী বা ডোবার পানিতেই এই ডিম

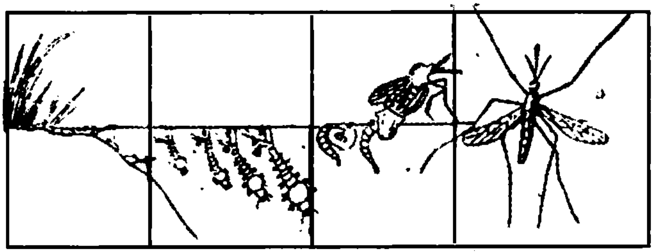

মশার ক্রমপরিবর্তন

ছাড়িয়া থাকে। মনে হয়, একটু ময়লা হইলেই যেন পানি এই ডিমের পক্ষে অধিকতর উপাদেয় হয়। এই ডিম হইতে ধীরে ধীরে একরূপ শূক-কীট বা লার্ভা নির্গত হয়। লার্ভাগুলি পানি হইতে আহার্য গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে; বিশেষতঃ পানিমধ্যে পচা পাতা প্রভৃতি থাকিলে তো কথাই নাই। পানিতে অবস্থানকালে কখনও কখনও ইহারা পানির নীচে চলিয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই পানির উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে এবং পানির মধ্য হইতে উপরে উঠিয়া বাতাস লইয়া বাঁচে। এইসময় উহাদিগকে দেখিলে জলচর কীট বলিয়াই মনে হইবে। ইহারাই যে মশার বংশধর তাহা তখন নির্ণয় করা কঠিন। মশার শূক-কীটের যে বড় ছবি উপরে দেওয়া গেল, তাহা দেখিলেই আমাদের কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবে। আমাদের দেশের উত্তাপ ডিমগুলির ক্রমবর্ধনে যথেষ্ট সাহায্য করে। ডিম হইতে শূক-কীট জন্মিয়া বড় হইতে মাত্র পাঁচ ছয় দিন সময় লাগে। এইবার ক্রমপরিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে উহারা আসিয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে পুত্তলিতে পরিণত হয়। তাহার দেহের এই আবরণটি আরও দুই কি তিন দিন থাকে এবং পরে তাহার মধ্য হইতে ইমাগো (imago) বা সম্পূর্ণ মশা নির্গত হয়।

মশার ধ্বংস

পূর্বে বলিয়ছি, মশা মানবের একটি প্রধান শত্রু। এই শত্রু ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবন করার ফলেই ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া লোকে জগতের একটি আশ্চর্য কীর্তি সুবৃহৎ পানামা খাল কাটিতে পারিয়াছিল। মশার হস্ত হইতে, মশারির সাহায্যে কতকটা পরিত্রাণ পাইলেও, তাহা তত নিরাপদ নহে। এইজন্য উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলাই সমীচীন। এই কার্যের জন্য কখনও কখনও রাত্রে দ্রব্য বিশেষের ধোঁয়া, আমরা ব্যবহার করি, কিন্তু তাহাতে মশা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় কিনা সন্দেহ। কেরোসিন সাহায্যেই ইহারা মরিয়া যায়। বিশেষতঃ পানিতে যখন ইহারা অপরিণত অবস্থায় ছুটিয়া বেড়ায়, সেই সময় উহার উপর কেরোসিন ছড়াইলে তাহারা মরিয়া যায়। অধুনা অন্যান্য দ্রব্যও এই কার্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে ডিডিটি-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পদার্থটি করোসিন তৈলে গুলিয়া চতুর্দিকে ছড়ান হয়। উহার সহিত মশার স্পর্শ ঘটিলেই মশাটি নিশ্চিত মরিয়া যায়।

মাকড়সা

মেরুদণ্ডহীন জীবের মধ্যে মাকড়সা আর একটি। ইহার পরিচয় তোমাদের নিকট নূতন নহে। তবে তোমরা বোধ হয় সকলে জান না যে, ইহার স্বজাতি আর একদল মাকড়সা পানিতে বাস করে। এই জলচর মাকড়সা নিজ দেহনিঃসৃত একরূপ আঠাল পদার্থ সহযোগে পানির মধ্যে নিজ বাসের জন্য ঘর প্রস্তুত করে। এই ঘরগুলির প্রবেশদ্বার নিম্নদিকে। প্রথমে এই ঘর পানিতে ভরিয়া থাকিলেও, উহারা পানির উপর আসিয়া নিজ লোমশ পায়ের সাহায্যে উপর হইতে বায়ু লইয়া যায় ও নিজ ঘর হইতে পানি সরাইয়া বায়ু দ্বারা উহা পূর্ণ করে। এই বায়ু তাহারা নিজ শ্বাসকার্যে নিয়োজিত করে। পানির মধ্যে উহারা মাছের দেহের রস, পানির উপর হইতে কীট-পতঙ্গ লইয়া গিয়া আহার করে।

মাটির উপরে যাহারা চলিয়া বেড়ায়, জাল তৈয়ার করে, অব্যবহৃত কামরার প্রত্যেক কোণেই বাসা বাঁধে, সেই সকল মাকড়সাও ঠিক এক শ্রেণীর জীব নহে। ইহাদিগকেও কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দলের বিশেষ পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে। উহাদিগের সাধারণ গঠন-প্রণালী এবং অভ্যাসের কথা বলিয়াই মাকড়সার কাহিনী শেষ করিব।

মাকড়সা মেরুদণ্ডহীন প্রাণী, কিন্তু পূর্ববর্ণিত পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত নহে। এই শ্রেণীকে প্রাণীবিদ আর্থপোডা (arthopoda) শ্রেণীর মধ্যে এরাকনিদ শাখাভুক্ত করিয়াছেন। কাঁকড়াবিছা প্রভৃতিও ইহারই আর একটি শাখা-শ্রেণীর অন্তর্গত। মাকড়সার ছবিটি দেখিলে পতঙ্গের সহিত ইহার পার্থক্য নজরে পড়িবে। ইহার দেহটি দুই অংশে বিভক্ত; যে অংশে মস্তক ও বক্ষঃস্থল রহিয়াছে তাহার নাম সিফালোথোরাক্স (cephalothorax) এবং অন্য অংশটি উদর প্রদেশ নামে অভিহিত। সিফালোথোরাক্স-এর পুরোভাগে ইহার চারিজোড়া সরল চক্ষু সংস্থাপিত; উহার মধ্যে মাছির ন্যায় বহুসংখ্যক লেন্স নাই, সাধারণ চক্ষু বলিয়াই ইহা পরিচিত। মুখ-গহ্বরের সম্মুখে পতঙ্গের ন্যায় antannae না থাকিলেও, যে দুইটি লোমশ নল বিদ্যমান তাহার দ্বারা সে শত্রুদেহে বিষ সঞ্চালন করিতে পারে। এই দুইটি চেলিসেরা (chelicera) নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যেভাগ ফাঁপা এবং মস্তকের মধ্যে পুরোভাগে অবস্থিত বিষ-ভাণ্ডের সহিত ইহারা সংযুক্ত। সিফালোথোরাক্স-এর সহিত মাকড়সার আটটি পা সংযুক্ত, এই

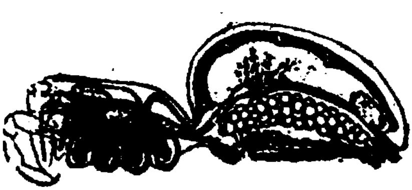

মাকড়সার দেহের অভ্যন্তর

আটটি পায়ের জন্যই ইহারা অষ্টপদী। এই পাদদেশের শেষ প্রান্ত হইতে উদর দেশ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার উদর অপেক্ষাকৃত নরম। উদরের শেষ প্রান্তে গুহ্যদ্বার অবস্থিত, কিন্তু উহার পুরোভাগের নীচের দিকে অন্য একটি দ্বার রহিয়াছে, যাহার মধ্য দিয়া ডিম প্রসূত হয়। ইহার শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য সম্পাদিত হয় কতকগুলি পুস্তকাকার ফুসফুসীয় কোষ (pulmonary sacs) সাহায্যে। ইহাকে ফুসফুস-বই নাম দেওয়া যাইতে পারে। এইগুলি দেহনিম্নে সিফালোথোরাক্স্-এর শেষ প্রান্তে উদরভাগেই বিদ্যমান। এই পুস্তকাকার ফুসফুসের পাতার মাঝে মাঝে রক্ত যাইয়া অম্লজান সহযোগে শোধিত হয়। গুহ্যদ্বারের পার্শ্বে তিনটি এরাকনিদা বর্তমান, ইহার মধ্য হইতে একরূপ তরলপদার্থ নির্গত হয়, যাহা বায়ুর সহিত সংস্পর্শ ঘটিলেই শক্ত হইয়া রেশমের আকার ধারণ করে। এই পদার্থ দ্বারাই মাকড়সা নিজ বাসের জন্য এবং খাদ্য আহরণের ফাঁদ স্বরূপ জাল পাতিয়া থাকে। দেহের অভ্যন্তরে রক্তবাহী নলগুলি বর্তমান। ঠিক উদর-ত্বকের নিম্ন দিয়াই বৃহত্তম রক্তবাহী নলটি অবস্থিত; ইহারই স্ফীত অংশ হৃদ্যন্ত্রের কার্য করিয়া থাকে। পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে মাকড়সার দেহমধ্যস্থ বিভিন্ন যন্ত্রের অবস্থান দেখান হইয়াছে। মাকড়সাকে মাথা হইতে উদরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মাঝামাঝি কাটিলে যে রূপ দেখা যায় তাহাই চিত্রে দেখান হইল।

মাকড়সা কিন্তু পতঙ্গের ন্যায় ক্রমপরিবর্তনের ফলে পরিণত দেহ প্রাপ্ত হয় না। স্ত্রী-মাকড়সা যে ডিম প্রসব করে, তাহার মধ্যেই মাকড়সা-শিশু ধীরে ধীরে বাড়িয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলেই বাহির হইয়া আসে। ডিমগুলি স্ত্রী-মাকড়সা দেহের নিম্নভাগে একটি থলির ন্যায় আবরণের মধ্যে রাখিয়া অনবরত রক্ষা করে। সম্পূর্ণ দেহ-গঠনের পর শিশু-মাকড়সা যখন প্রথম বাহিরে আসে, তখন তাহাকে অপরিণত ছাগশিশু বা গরুর বাছুরের মতোই মাতার অনুরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট মনে হয়। ক্রমে উহারা পুষ্ট হইয়া পরিণত দেহ পাইয়া থাকে।

মাকড়সা ও পতঙ্গের দেহের মধ্যে সাদৃশ্য অতি অল্পই আছে; পার্থক্যই অধিক। যেমন ধর ঃ

১। পতঙ্গ দেহ—মাথা, বুক ও পেট এই তিনটি অংশে বিভক্ত; কিন্তু মাকড়সার দেহ, মাথা ও পেটের সমন্বয়ে প্রস্তুত।
২। পতঙ্গ শ্রেণীর অধিকাংশেরই ডানা আছে, কিন্তু মাকড়সার তাহা নাই।
৩। মাকড়সার চক্ষু সরল কিন্তু সংখ্যায় আটটি, পতঙ্গ কিন্তু পুঞ্জাক্ষ-বিশিষ্ট।
৪। পতঙ্গ-মুখে শুঙ্গ ও এন্‌টানি থাকিলেও মাকড়সার মুখে তাহা নাই।
৫। পতঙ্গ-দেহে হুল ফুটাইবার ব্যবস্থা আছে, মাকড়সার সেইরূপ হুল নাই বটে, তবে বিষের আধার উহার দেহে বর্তমান রহিয়াছে।
৬। পতঙ্গ শ্বাসকার্য সম্পাদন করে বায়ু-নালীর সাহায্যে, মাকড়সার সে স্থানে ফুসফুস-বই রহিয়াছে।
৭। শ্রেণীবিভাগ ব্যাপারেও ইহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন, মাকড়সার পুরুষ ও স্ত্রী এই দুইটি শ্রেণী, কিন্তু অধিকাংশ পতঙ্গেরই পুরুষ ও স্ত্রী ব্যতীত কর্মী শ্রেণীও রহিয়াছে।
৮। পতঙ্গ-দেহ সাধারণতঃ ক্রমপরিবর্তন-ফলে গঠিত হয়, কিন্তু মাকড়সা-শিশু ডিম হইতেই জন্ম লাভ করে।

ব্যাঙ্‌-এর কথা

এতদিন তোমরা কতকগুলি মেরুদণ্ডহীন জীব সম্বন্ধেই কিছু জ্ঞান লাভ করিলে। মেরুদণ্ডী জন্তুদের মধ্যেও নানাবিধ প্রাণী বর্তমান। ইহাদের কেহ বা পানিতে বাস করে, কেহ বা স্থলে বাস করিয়া থাকে; কেহ বা পদহীন আবার অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণী পদবিশিষ্ট। পাখীরা মেরুদণ্ডী শ্রেণীভুক্ত। উহাদিগের পায়ের সংখ্যা দুইটি, এবং দুইটি পাখা অন্য দুইটি পায়ের স্থানে বিদ্যমান। বাদুড় মেরুদণ্ডী প্রাণী, কিন্তু ইহারা পাখীর শ্রেণীভুক্ত নহে। পশু-পক্ষী সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা তোমরা পরে জানিবে। ইতঃপূর্বে একপ্রকার মেরুদণ্ডী জীব — মাছের কথা তোমাদের বলিয়াছি; এখানে মাছ অপেক্ষা উন্নততর আর একটি জীবের পরিচয় দিব। এই শ্রেণী উভচর বা এম্‌ফিবিয়া (amphibia) নামে পরিচিত। ব্যাঙ্‌ ইহাদিগের অন্তর্গত। ইহারই বিশিষ্ট পরিচয় এখানে দিবার চেষ্টা করিব।

ব্যাঙ্‌ একপ্রকার নহে; দেহের বহির্ভাগের রূপবিশেষে ইহাদিগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। আমাদের দেশে, জলে স্থলে কয়েক রকম ব্যাঙ্‌ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কোলা ব্যাঙ্‌, সোনা ব্যাঙ্‌, সবুজ গেছো ব্যাঙ্‌, কটকটে ব্যাঙ্‌ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের মধ্যে সোনা ব্যাঙ্‌ ও সবুজ ব্যাঙ্‌-এর সংখ্যা

কোলা ব্যাঙ্‌ কটকটে ব্যাঙ্‌

অত্যন্ত অল্প, কারণ শৈশবাবস্থায় উহাদিগের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়। জমি চাষ দিবার সময় ইহারা জলপূর্ণ জমির মধ্যে বর্ষাকালে ডিম পাড়িয়া থাকে। এই দুই জাতীয় ব্যাঙ্‌ ধরিয়া এখনও পল্লীগ্রামের ছেলে-মেয়েরা ব্যাঙ্‌-এর বিবাহ দেয়। পশ্চিমে কিন্তু সুসভ্য মানুষ ব্যাঙ্‌-এর মাংসের আস্বাদ পাইয়াছে এবং এই দুই রকম ব্যাঙ্‌ সে দেশে মানুষের সেবার জন্যও ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় বর্তমানে মাছের ন্যায় ব্যাঙ্‌-এরও চাষ হইয়া

থাকে। কিন্তু কটকটে ব্যাঙ্-এর পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি ছোট ছোট থলির ন্যায় দানা রহিয়াছে; উহাদের মধ্যে একরূপ বিষাক্ত রস সঞ্চিত থাকে, সেজন্য উহারা আর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না।

নিম্নে ও পূর্ব পৃষ্ঠায় ব্যাঙ্-এর যে ছবি দেওয়া হইল, তাহা হইতেই উহার বহির্ভাগের রূপ সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিতে পারিবে। ইহারা চারিপদ-বিশিষ্ট জন্তুর ন্যায়। পার্থক্য এই যে, ইহার পুরোভাগের পদ দুইটি পরস্পর-জোড়া চারি অঙ্গুলী-বিশিষ্ট। কিন্তু নিম্নভাগের দুইটি পদে পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলী রহিয়াছে, তন্মধ্যে পঞ্চম অঙ্গুলী অতিশয় ক্ষুদ্র। এই অঙ্গুলীগুলিও পরস্পরের সহিত হাঁসের পায়ের ন্যায় পাতলা ত্বকের সাহায্যে জোড়া। পায়ের এইরূপ গঠনের ফলেই উহারা পানিতে সাঁতার কাটিতে সমর্থ। উহার সম্মুখে রহিয়াছে মুখ-গহ্বর এবং পশ্চাদ্প্রান্তে গুহ্যদ্বার অবস্থিত। পরিণতবয়স্ক ব্যাঙ্-এর দেহে লেজ দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার মুখ আকর্ণ বিস্তৃত, উপরের চোয়ালে কতকগুলি তীক্ষ্ণ দন্ত বিদ্যমান, কিন্তু নিম্ন চোয়ালে দাঁত নাই। মস্তকের সম্মুখভাগে দুইটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ চক্ষু একটু যেন উঁচু রহিয়াছে; ইহাদিগের মধ্যস্থানে ওষ্ঠপ্রান্তের উপরে নাসিকার ছিদ্র বর্তমান এবং চক্ষুদ্বয়ের পশ্চাতে দুইটি চক্ষু-আবরণীও আছে; ইহাই পশ্চাতে কর্ণরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। কর্ণরন্ধ্র পাতলা পরদা দ্বারা আবৃত থাকে; উহার মধ্যে রহিয়াছে কর্ণপটহ। মাছের মস্তকে এই কর্ণপটহ দেখিতে পাওয়া যায় না। দেহের আবরণ বিভিন্ন শ্রেণীর ভেকের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের; কাহারও বা ধূসর এবং কাহারও রং ধূসর মিশ্রিত সোনালী এবং কেহবা ধূসরের সহিত সবুজ বর্ণবিশিষ্ট।

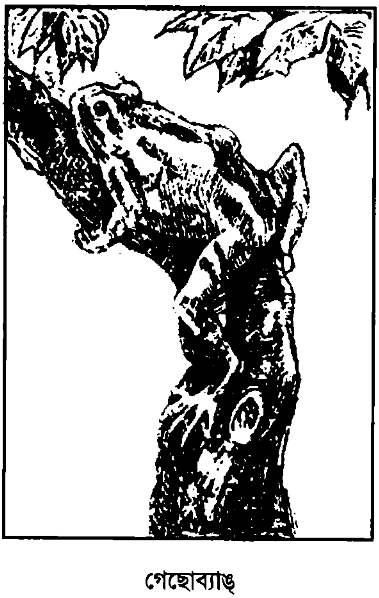

গেছোব্যাঙ্

ইহাদের দেহের আভ্যন্তরীণ চিত্র অনেকটা মানব দেহের ন্যায়। ভেকের কঙ্কাল প্রায় নরকঙ্কালের মতো। পর পৃষ্ঠার চিত্র হইতে ইহা বুঝিতে পারিবে। তবে প্রভেদ এই যে, মানব দেহের ন্যায় ইহার মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি বাঁকিয়া বক্ষঃস্থলের বিভিন্ন যন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য পঞ্জরের আকার গ্রহণ করে নাই। ইহার দেহনিম্নে পেলভিক অস্থি মানব শরীরের অনুরূপ নহে। মস্তকের খুলিও ঠিক একরূপ নহে, এবং অস্থি-সঙ্গমগুলিও বিভিন্ন প্রকারের।

উহার মাথার খুলির অভ্যন্তরে মস্তিকের বিভিন্ন অংশ বর্তমান। ইহাই স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রভূমি। এই স্থান হইতেই ব্যাঙ্-এর শরীরের বিভিন্ন কার্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে, সে কথা তোমরা বড় হইলে জানিতে পারিবে। রক্ত চলাচলের জন্য রক্তবাহী চক্র ইহার দেহের মধ্যেও বর্তমান রহিয়াছে, এবং হৃদ্‌যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। অপরিষ্কার শিরা-প্রবাহী (venous) রক্ত, হৃদ্‌পিণ্ড সাহায্যে ফুস্‌ফুসের মধ্যে গিয়া অক্সিজেন সংযোগে নূতন হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে। ইহারা ফুস্‌ফুসের দ্বারাই বাতাস গ্রহণ করে, অর্থাৎ ভেকের পরিণত অবস্থায় নিশ্বাসকার্য ফুস্‌ফুস সাহায্যে সম্পাদিত হয়।

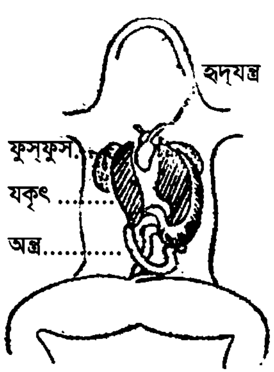

ব্যাঙ্-এর দেহের অভ্যন্তর

ব্যাঙ্ খাদ্য গ্রহণ করে স্বীয় জিহ্বার সাহায্যে। জিহ্বা বাড়াইয়া উহারা তৎপরতার সহিত স্বীয় খাদ্যবস্তু ধরিয়া মুখে পুরিয়া ফেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা কীট-পতঙ্গ খাইয়া জীবন ধারণ করে। উহার উপরের চোয়ালে যে দাঁত রহিয়াছে, তাহারই সাহায্যে এই পতঙ্গ প্রভৃতিকে ধরিয়া রাখিতে পারে, এবং এইরূপে ধৃত কীট মুখ হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। নিম্ন চোয়ালে দাঁত না থাকায় ইহারা চর্বণ কার্য করিতে পারে না; ব্যাঙ্-এর জিহ্বা দীর্ঘ, নমনীয় ও আঁঠাল, এবং উহার মুখের সম্মুখভাগের সহিত সংযুক্ত। খাদ্যবস্তু কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে উপস্থিত হয় এবং ক্রমে অন্ত্রমধ্যে আসিয়া পৌঁছে। ইহার শরীরে যকৃৎ এবং পিত্তকোষও (gall bladder) বিদ্যমান, পিত্তপ্রবাহিকার (bile duct) চতুষ্পার্শ্বে পাচক গ্রন্থিগুলি (pancreas) অবস্থিত।

ব্যাঙ্-এর ক্রমপরিবর্তন (metamorphosis of a frog)

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্-এর গঠনপ্রণালী প্রায় একরূপই। ব্যাঙ্ কিন্তু ডিম হইতে উৎপন্ন হয়, এবং ইহার জন্ম-কাহিনী অতিশয় বিস্ময়কর। ক্রমপরিবর্তনের ফলেই ডিম হইতে ইহার দেহের পূর্ণ পরিণতি হইয়া থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে ইহারা ডোবা ও পুকুরের স্থির পানিতে ডিম ছাড়িয়া থাকে। ব্যাঙ্-এর ডিমগুলি পানিতে ভাসিয়া বেড়ায় এবং প্রায় পুকুরের কিনারায়, ঘাস-পাতার মধ্যে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে এই ডিমগুলি গোলাকার লালা-সদৃশ মনে হয়, এবং উহার মধ্যভাগে একটি কাল রং-এর দানা থাকে (পর পৃষ্ঠার চিত্রের উপরিভাগে দেখ)। এই দানাটিই ক্রমে বাড়িয়া বেঙ্গাচির জন্ম দেয় (ঐ চিত্রের নিম্নদেশে দেখ) ক্রমে উহার মস্তকের দুই পার্শ্বে ফুল্‌কার ন্যায় শ্বাসযন্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উহারা মাছের ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ

করিয়া চলে। পরে ক্রমে লেজের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি পদের আবির্ভাব হয়। এবং কিছু দিন পরে সম্মুখের পা দুইটি গঠিত হইতে থাকে। এই সময় উহাদিগের দেহের অভ্যন্তরে ফুস্‌ফুসও নির্মিত হয়। কিছুকাল পর্যন্ত উহারা ফুল্‌কা এবং ফুস্‌ফুস উভয় যন্ত্রের সাহায্যেই শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে; তারপরই উপরের আবরণ ত্বকটি পরিত্যাগ করে। এই সময় ফল্‌কাও নষ্ট হইয়া যায় এবং উহারা তখন ফুস্‌ফুস সাহায্যেই শ্বাস গ্রহণ করে। এই অবস্থার পূর্ব পর্যন্ত পানির মধ্যে সব্জি পদার্থ খাইয়া ইহারা বাড়িতেছিল। এইবার খাদ্য-পদার্থও পরিবর্তিত হয়, এবং এখন আমিষ আহারই উহারা অধিকতর পছন্দ করে। এই সময় পর্যন্ত উহাদিগের একটি ক্ষুদ্র লেজ থাকে। কিন্তু ক্রমে পশ্চাতের পদদ্বয় যতই পুষ্ট হইতে থাকে, লেজও ততই ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। ইহারা নানারূপ পতঙ্গ কীট প্রভৃতি আহার করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

ব্যাঙ্-এর বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার শরীর মাছের তুলনায় অনেক

ব্যাঙ্-এর দেহের ক্রমপরিণতি

উন্নত ধরনের। মানব শরীরের সহিত ইহার দেহের অনেক সাদৃশ্য আছে। অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু ইহা অপেক্ষা আরও উন্নত ধরনে গঠিত, এবং মানব দেহেই এই উন্নতির চরম পরিণতি ঘটিয়াছে।

ব্যাঙ্ ও মাছের দেহের তুলনায় নিম্নের বিষয়গুলি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

১। মাছের দেহে পাখনা রহিয়াছে, কিন্তু ব্যাঙাচি বা ব্যাঙের দেহে ঐরূপ পাখনা নাই।

২। মাছ ও ব্যাঙাচির চোখে পাতা নাই, কিন্তু ব্যাঙের চোখে পাতা রহিয়াছে।

৩। ব্যাঙ ও ব্যাঙাচির নাকের সহিত মুখও সংযুক্ত কিন্তু মাছের দেহে এইরূপ সংযোগ নাই।

৪। মাছের দেহ আঁইশ-যুক্ত, ব্যাঙ্ বা ব্যাঙাচির দেহ ঐরূপ নহে। মাছ বা ব্যাঙাচির কানের অস্তিত্ব বাহির হইতে বুঝা যায় না, কিন্তু ব্যাঙ্-এর কান ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে ও তাহা বুঝিতে পারা যায়।

৫। মাছ ও ব্যাঙাচি সাধারণতঃ পানিতে বাস করে তবে ব্যাঙ্ উভচর। জল ও স্থল উভয় স্থানেই ইহাদিগকে বিচরণ করিতে দেখা যায়।

৬। মাছের হৃদয় দুইটি প্রকোষ্ঠ সম্বলিত, ব্যাঙাচির হৃদ্‌যন্ত্র প্রথমে সেইরূপ থাকিলেও, পরে উহা তিনটি প্রকোষ্ঠ-সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৭। মাছ সাধারণতঃ ফুল্‌কার সাহায্যেই নিঃশ্বাস কার্য চালায়। ব্যাঙাচির প্রথম অবস্থায় ঐরূপ ব্যবস্থাই থাকে, তবে কিছুদিন পরে ফুল্‌কা ও ফুস্‌ফুস দুইটি যন্ত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। পরিণত ব্যাঙের কিন্তু ফুল্‌কা থাকে না, কেবলমাত্র ফুস্‌ফুসই থাকে।

৮। মাছ এনোফিলিস্ মশার অপরিণত শিশুগুলিকে খাইয়া মানুষের উপকার করে, ব্যাঙাচিও গলিত মৃতদেহের অংশ খাইয়া পানি পরিষ্কার করে। ব্যাঙ্ কিন্তু নানাবিধ ক্ষুদ্র কীট খাইয়া বহু শস্য রক্ষা করে।

৯। মাছ মানুষের খাদ্য, মাছের তেলও উপকারী পদার্থ, উহার আঁশ ও কাঁটা বা অস্থিও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। ব্যাঙ্ সাধারণতঃ ঐরূপ কাজে লাগে না, তবে কোনও কোনও দেশের লোক ব্যাঙ্-এর মাংস খায় ও উহার চামড়া দ্বারা ছোট জুতা ও মানিব্যাগ ইত্যাদি তৈয়ারী করে।

প্রাণী এবং উদ্ভিদের পরস্পর সম্বন্ধ

(Interdependence of plants and animals)

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, উদ্ভিদও প্রাণ-সম্পন্ন; সুতরাং উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে একটি নিকট সম্বন্ধ বর্তমান। উদ্ভিদ নড়িয়া চলিতে পারে না, কিন্তু তবু তাহাকে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিতে হয়। মাটির মধ্যস্থিত পানি ও অন্যান্য বস্তু, অথবা বাতাসে বিদ্যমান অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প, অধিকাংশ উদ্ভিদের ইহাই প্রধান খাদ্য। কিন্তু এমনও দেখা গিয়াছে যে, উদ্ভিদও হিংস্র হইতে পারে, ইহাদিগের কেহ কেহ আমিষ পদার্থ পাইলে তাহাও ভক্ষণ করিয়া থাকে। যেমন কোনও শ্রেণীর বৃক্ষ, পত্র সাহায্যেও নানাবিধ কীট-পতঙ্গ ধরিয়া আহার করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে ঝাঁজিদাম নামীয় একরূপ জলজ-উদ্ভিদ, লাল ভেরেণ্ডা, ড্রসেরা প্রভৃতি স্থলজ উদ্ভিদের কথা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অধিকাংশ উদ্ভিদ নিজে বংশ-বিস্তারের জন্য পতঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। পতঙ্গগুলি হয় পুষ্পের সৌন্দর্যে, গন্ধে অথবা উহার মধ্যস্থিত মধুরসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন পুষ্পে গমন করে; এবং তথায় গর্ভকেশরের সহিত পরাগ বা পুষ্পরেণুর সম্মিলন ঘটাইয়া নূতন ফল এবং বীজের সৃষ্টি করে। এইরূপ না ঘটিলে বহু উদ্ভিদের বংশরক্ষা করা সম্ভবপর হইত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উদ্ভিদ বিশেষভাবেই জীব-জগতের কাছে ঋণী।

উদ্ভিদের ঋণের পরিমাণ এইখানেই সীমাবদ্ধ নহে। তোমরা পূর্বে শুনিয়াছ যে, উদ্ভিদ এই নাইট্রোজেন-সম্বলিত খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে মাটির মধ্য হইতে। সাধারণতঃ এই নাইট্রোজেন সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন প্রকার পুরীষ ও জীবের দেহাবশেষ সহযোগে। গোময় এবং পাখীর বিষ্ঠা মাটিতে পড়িয়া, নানারূপ জীবাণুর সাহায্যে পরিবর্তিত হইয়া, উদ্ভিদের উপযোগী নাইট্রোজেন পদার্থ উৎপাদন করে। নানা প্রকার মৃত প্রাণীর দেহ হইতেও উদ্ভিদের উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত হয়; বিশেষতঃ ফস্‌ফোরাস, জীব-জন্তুর অস্থি হইতেই মৃত্তিকায় গমন করে, এবং তথা হইতে পুনরায় উদ্ভিদ দেহে আসিয়া, উহার দেহের গঠন-ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে। নভশ্চর বিদ্যুৎ শক্তিও বাতাসের অম্লজান ও নাইট্রোজেনকে পরিবর্তিত করিয়া উদ্ভিদের উপযোগী খাদ্য পদার্থে পরিণত করিয়া থাকে।

বিভিন্ন শত্রুর অত্যাচার হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার নানাবিধ উপায় বৃক্ষরাজি অবলম্বন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শত্রু উহার কম নাই। নানাবিধ প্রাণী, উদ্ভিদ জগৎ হইতেই উহাদিগের আহার্যবস্তু সংগ্রহ করিয়া থাকে। কেহ বা পাতা, কেহ বা

টাট্‌কা পাতাই ভক্ষণ করে; পতঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় উহারা যেমন পত্রভুক, তেমনি মধু এবং পুষ্প-রেণুও উহাদিগের নানা অবস্থায়, দেহ গঠনে সহায়তা করে। হিংস্র মাংসাশী জন্তুর কথা ছাড়িয়া দিলেও, উন্নততর স্তরের প্রত্যেক প্রাণীই, উদ্ভিদের সাহায্যে দেহের পুষ্টি সাধন করে দেখা যায়। গাছের ফুল, ফল, পাতা, মূল কোনওটিই একেবারে ত্যাগ করিবার বস্তু নহে।

মানব বুদ্ধিমান জীব। তাহার সেবায় যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাই নিয়োজিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ বৃক্ষের ফলই, তাহার প্রধান খাদ্য, কিন্তু পাতাও একেবারে পরিত্যক্ত হয় না। এখন তো জানা গিয়াছে যে, সবুজ পাতা, যথা লেটুস, ধনে পাতা, পুদিনা প্রভৃতি এবং টাট্‌কা ফল না হইলে জীবন ধারণের সর্ব প্রকার উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, উদ্ভিদ এবং জন্তু, ইহারা পরস্পরের উপর নিরতিশয় নির্ভরশীল, — একেকটির জীবন আর একটির সাহায্য না পাইলে অচল হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়।

উদ্ভিদ সৌরশক্তির প্রভাবেই জন্মগ্রহণ করিয়া পরিবর্ধিত হয়। উদ্ভিদ দেহের পত্র, পল্লব, পুষ্প ও ফল সমস্তই আলোকের প্রভাব ব্যতিরেকে পরিণতি লাভ করিতে পারিত না। পূর্বেই দেখিয়াছি সূর্যালোক কিরূপে উদ্ভিদ জীবনের জন্য পরম প্রয়োজনীয়। তাই যদি বলা যায় যে, উদ্ভিদ পদার্থ প্রকৃত প্রস্তাবে সৌরশক্তির দান, তাহা মিথ্যা হইবে না।

পুনরায় ইহাও এখন স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গেল যে, প্রাণীজীবন উদ্ভিদের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। আহার না হইলে প্রাণীজীবনের নড়িবার বা চলিবার শক্তি থাকে না। কাজেই প্রাণীজীবনের শক্তি উদ্ভিদ দেহ হইতে প্রাপ্ত খাদ্যের পরিবর্তন দ্বারা উদ্ভূত হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। এইজন্যই ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সৌর-শক্তি পরিবর্তিত আকারে উদ্ভিদ দেহে পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে, তাহাই দেহে প্রবেশ করিয়া পুনরায় প্রাণীর প্রত্যেকটি অঙ্গ চালনায় ব্যঞ্জনা লাভ করে। আশ্চর্য এই বিশ্বস্রষ্টার বিধান! কত রকমে শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাই, কিন্তু একটু যত্ন সহকারে চিন্তা করিলে এই সমস্ত শক্তির উৎস ঐ বিরাট শক্তিমান সূর্যে ন্যস্ত রহিয়াছে, বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

তৃতীয় পর্ব

নরদেহের ইতিকথা

"নগণ্য এক বিন্দুরে নিয়া
জমাট বাঁধা করিনু তারে,
জমাটের পরে পরিবর্তিনু
ক্ষুদ্র এক পিণ্ডাকারে,
তুচ্ছ পিণ্ডরে অর্পিয়া অস্থি
পরানু তাহারে মাংসভার
দিনু পুনঃ তারে সৃজনীশক্তি
অন্যেরে যেন পারে সৃজিবার।"

— পবিত্র কোরান

মানবদেহের পরিচয়

মানবের দেহ বিশ্বস্রষ্টার একটি বিশিষ্ট এবং আশ্চর্য সৃষ্টি। দেহের বহিরাবরণ দর্শন করিয়া উহার অভ্যন্তরভাগের কোনও ধারণা করিতে পারা যায় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার বৈচিত্র্য অভ্যন্তরভাগেই নিহিত রহিয়াছে। আমরা দেখি, মানবের দেহ সমস্ত দিবস ধরিয়াই নানা কার্য করিয়া চলিয়াছে, এবং দিবাশেষে ক্লান্ত দেহ যখন বিশ্রাম-আশায় ঘুমে অচেতন হইয়া পড়ে, তখনও দেহের মধ্যভাগে স্রষ্টার বিচিত্র যন্ত্র নিজ কার্য করিয়া চলে। এই জন্য ঘুমন্ত মানব দেহের উপর দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাই, তাহার বক্ষদেশ নিরন্তর উঠিতেছে ও নামিতেছে। বক্ষ-স্পন্দন হইতে বুঝিতে হয়, তাহার হৃদ্‌যন্ত্র কাজ করিয়াই চলিয়াছে। ইহার সহিত আরও অনেকগুলি যন্ত্র এমনভাবে সংযুক্ত যে, তাহারাও উহার সঙ্গে কাজ করিয়া থাকে। দেহের এই বিভিন্ন অংশের একটু বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন।

দেহের বহির্ভাগ দর্শন করিয়া তাহাকে যত সুন্দর বলিয়া আমাদিগের ধারণা হয়, তাহার অন্তর্ভাগের পরীক্ষায় সেই সৌন্দর্যের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। মানবের

বৈশিষ্ট্য প্রকৃতপক্ষে উহার বহিরাবরণের জন্য; দেহের অন্তরভাগ প্রায় সকলেরই একরূপ। দেহের বিশ্লেষণ করিলে উহাকে প্রধানতঃ তিনটি অংশে ভাগ করা যায়, — প্রথম ইহার বহিরাবরণ চর্ম, দ্বিতীয় মাংস ও পেশী সমুদয়, এবং তৃতীয় অস্থি। এই অস্থি প্রকৃতপক্ষে দেহের কাঠামো, এবং ইহারই উপর মাংস এবং পেশীসমূহ যথাযথ বিন্যস্ত হইয়া দেহ গঠন করে। নিম্নে মানবদেহের বিভিন্ন চিত্র দেওয়া হইল। প্রথম চিত্রে দেহের কাঠামো বা কঙ্কাল মাত্র রহিয়াছে, এবং দ্বিতীয় চিত্রে কঙ্কালের উপরিভাগে পেশীগুলি বিন্যস্ত রহিয়াছে। ইহারই উপর ত্বকের আবরণ দিলে মানব দেহের সম্পূর্ণ রূপ দেখা যায়।

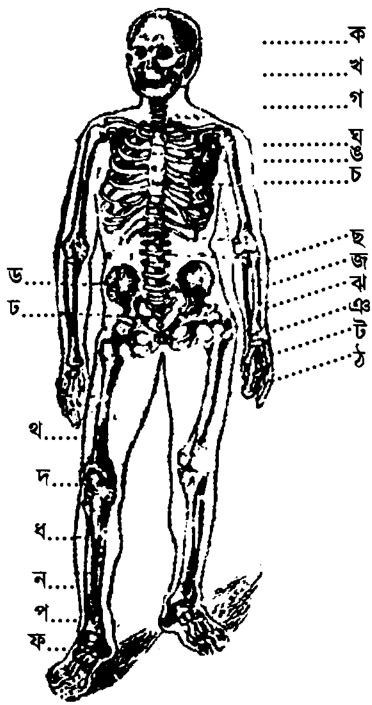

নর-কঙ্কাল

পেশীসমূহ

প্রথম চিত্রের মধ্যে দেহের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা গিয়াছে। (ক) চিহ্নিত অংশ; অবশ্য না বলিলেও বুঝিবে যে, ইহাই মস্তকের করোটি, খর্পর বা খুলি। প্রকৃতপক্ষে করোটি কতকগুলি বিভিন্ন অস্থিখণ্ডের সংযোগে নির্মিত, কিন্তু তাহার সবিশেষ বর্ণনা তোমাদের তেমন মনোরম হইবে না। (খ) চিহ্নিত অংশের কথা জানা প্রয়োজন। এই অংশটি করোটির সঙ্গে যুক্ত হইলেও উহাকে সহজে পৃথক করা

যায়। ইহাই চোয়ালের হাড় বা হম্বস্থি নামে অভিহিত। মস্তকের সহিত দেহ সংযুক্ত হইয়াছে সারভিকাল (গ) নামীয় অস্থি সাহায্যে — স্কন্ধদেশে রহিয়াছে ক্লাভিক্যাল অস্থি-খণ্ড (ঘ) এবং উহারই পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত স্ক্যাপিউলা (ঙ), স্কন্ধাস্থি বা অংসফলক অবস্থিত। ইহারই পুরোভাগে পশ্চাতের মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত, কতকগুলি অস্থি একটি খাঁচার সৃষ্টি করিয়াছে; ইহারাই পঞ্জরাস্থি নামে অভিহিত। ইহাদিগের একদিক যেমন মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি বক্ষস্থলের মধ্যস্থানে বুকাস্থি বা স্টারনামের (চ) সহিত সংযুক্ত। পঞ্জরের পার্শ্বে হস্তের অভ্যন্তর ভাগে, উপরে হিউমেরাস (ছ) অবস্থিত, এবং ইহারই সহিত নিম্নভাগের আলনা (জ) এবং রেডিয়াস (ঝ) সংযুক্ত রহিয়াছে এবং উহাদের নীচে কব্জি অস্থি বা কারপাল (carpal) (ঞ) ও মেটাকারপাল (metacarpal) (ট) এবং অঙ্গুলির অস্থিগুলি (ঠ) অবস্থিত। পঞ্জরাস্থির তলদেশে দেহের দক্ষিণ এবং বামপার্শ্বে দুইটি অস্থি (ড) কেবলমাত্র পশ্চাতে মেরুদণ্ডের সহিত যুক্ত হইয়া ভাসমান অবস্থায় রহিয়াছে। নিজের পাঁজরের নীচে শ্বাস-গ্রহণের সময় হস্ত রাখিলেই, এই দুইটি অস্থি খণ্ডের চলাচল অনুভব করিতে পারিবে। পঞ্জরের নিম্নে মেরুদণ্ডের তলদেশে অবস্থিত (ঢ) লাম্বার মেরুর অস্থি নামে অভিহিত এবং ইহা (ণ) চিহ্নিত দাবনা অস্থি পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহারই পশ্চাদ্ভাগে প্রায় মধ্যস্থলে রহিয়াছে ত্রিকাস্থি বা সেকরাম (ত) পাদদেশে জঙ্ঘার মধ্যে রহিয়াছে ফিমার (থ) এবং ইহার নিম্নে হাঁটুর উপর পাটেলা (দ), এবং পরে আঁকড়া (ধ) ও বিম্বস্থি (ন), এবং উপর ও নীচে যথাক্রমে মেটাটারসাল (প) এবং পদাঙ্গুলির অস্থিরাজি (ফ) বিদ্যমান।

মানবদেহের কঙ্কালের পরিচয় দিতে গিয়া বিভিন্ন অস্থিখণ্ডের যে বিচিত্র নাম লিখিত হইল, প্রথম দর্শনে উহা শ্রুতিকটু এবং মনে রাখা একটু কঠিন বলিয়া ঠেকিলেও পূর্ব চিত্রটি সম্মুখে রাখিয়া দুই-একদিন উহার বিভিন্ন অংশ দেখিতে থাকিলে সহজেই ইহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারিবে। তোমরা সকলেই হয়তো চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিতে চাহিবে না। কিন্তু তবুও নিজ দেহের বিবরণ কতকটা জানা দরকার, এবং তাহা ছাড়াও, ইহাদিগের নামের উল্লেখ প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া এখানে ইহাদিগের সামান্য পরিচয় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হইল।

এই সকল বিভিন্ন অস্থি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে দ্বিবিধ উপায়ে। ইহাদিগের একটি সম্পূর্ণ সংযোগ (perfect joint) এবং অপরটি অসম্পূর্ণ সংযোগ (imperfect joint) নামে অভিহিত। পূর্ববর্ণিত মস্তকের অস্থিময় আবরণটি একখণ্ড অস্থি দ্বারা প্রস্তুত নহে। কতকগুলি বিভিন্ন আকারের অস্থি এমনভাবে একত্র সংযুক্ত হইয়া উহা নির্মাণ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে সহজে স্থানচ্যুত করা সম্ভব নহে। আবার মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অস্থিও এমনভাবে সংযুক্ত যে, তাহাদিগকে অধিক মাত্রায় নাড়াচাড়া করিবার উপায় নাই। এইরূপ সংযোগগুলিই অসম্পূর্ণ সংযোগ নামে অভিহিত। কিন্তু স্কন্ধদেশের স্ক্যাপিউলার সহিত বাহুর উপরিভাগের হিউমেরাস, অথবা হিপবোন বা দাবনার সহিত ফিমারের যেরূপ সংযোগ তাহাতে হস্তপদ উভয়ই যথা ইচ্ছা আমরা নড়াইতে পারি; এই জন্যই এই সকল সংযোগ সম্পূর্ণ সংযোগ নামে পরিচিত। শরীরের অন্যান্য অংশ যেরূপ অতি ক্ষুদ্র সেলের সমষ্টিমাত্র, অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ক্ষুদ্র একখণ্ড অস্থির পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অস্থি-সেলগুলির মধ্যভাগ চুন বা ক্যালসিয়ামের

ফসফেট এবং কার্বনেটের ন্যায় কঠিন পদার্থ দ্বারা পূর্ণ, কিন্তু পেশীগুলি নরম মাংসল সেল দ্বারা নির্মিত। শিশু অবস্থায় এই সকল অস্থিমধ্যে তখনও যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম জমিতে পারে না বলিয়া অস্থিগুলি তখন অপেক্ষাকৃত নরম ও নমনীয় থাকে, ইহাই তরুণাস্থি (cartilage) নামে পরিচিত। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত কঠিন পদার্থ অধিকতর পরিমাণে জমিতে থাকায় তরুণাস্থিগুলি কঠিন হইয়া যায়। অস্থিগুলির মধ্যে অসম্পূর্ণ সংযোগ যেখানেই হইয়াছে, সেখানেই ইহারা পরস্পরের সহিত এমন কাপে কাপে যুক্ত হয় যে, উহাদিগকে কোনওরূপেও নাড়ান যায় না। কিন্তু সম্পূর্ণ সংযোগের বেলায় বিভিন্ন অস্থি টেনডন-এর পেশী দ্বারা যুক্ত হয়। শরীরের যে সকল অস্থিময় অংশ আমরা ইচ্ছামতো নড়াচড়া করিতে পারি, তথায় এই টেনডেন সাহায্যেই অস্থি সংযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ পেশীর মধ্যে বিশেষভাবে দুই-একটির উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে।

নিম্নের চিত্রে বাহুর চলাচল দেখান হইয়াছে। বাহু যখন সরলভাবে লম্বমান থাকে, তখন মাংসল ঐ পেশীটি সরল দীর্ঘ অবস্থায় থাকে; কিন্তু হস্তের পুরোভাগ উঠাইলে ঐ পেশীটি তাহার স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আকার গ্রহণ করে এবং তখন ইহাকে অধিকতর পুষ্ট বলিয়া মনে হয়। এইটাই বাইসেপ্‌স পেশী নামে পরিচিত এবং ব্যায়াম দ্বারা ইহাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করা সম্ভবপর। এইরূপ হস্তের অন্য অংশে, পাদদেশে, উদরে এবং আরও অন্যান্য অংশের ভিন্ন ভিন্ন পেশী শরীর পরিচালন দ্বারা যথেষ্ট পুষ্ট হয় এবং তখন দেহের প্রতি চাহিতেই আনন্দ হয়।

ইচ্ছাধীন (voluntary) ও স্বেচ্ছাপেশী (involuntary muscles)

বাইসেপ্‌স প্রভৃতি পেশীগুলি আমরা ইচ্ছামতো পরিচালনা করিতে পারি। ইচ্ছাধীন ও স্বেচ্ছাপেশী তোমরা ব্যায়াম-বীরদিগের পেশী পরিচালনায় হয়তো দেখিয়াছ। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এইসকল মাংসপেশীর পরিচালনা আমাদের ইচ্ছাধীন; এই জন্যই ইহারা ইচ্ছাধীন মাংসপেশী নামে পরিচিত। কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও একপ্রকার পেশী দেহমধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে; যাহাদিগের চলাচল সম্বন্ধে আমরা সর্বদা সজাগ নহি। কারণ, সেই সকল পেশী আমাদিগের ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়াই নিজ কার্য করিয়া চলিয়াছে। এইরূপ পেশী দ্বারাই হৃদ্‌যন্ত্র নির্মিত। হৃদয় তাহার কাজ নিরন্তর করিয়া চলে, সে কখনও আমাদিগের ইচ্ছার অধীনতা স্বীকার করে না। মনে হয়, তাহার এই গতি, যেন কোনও অদৃশ্য কর্তার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহারই ইচ্ছায় একদিন ইহার চলাচল আরম্ভ হইয়াছিল এবং আর একদিন তাহারই ইচ্ছাক্রমে ইহা স্থির হইয়া যাইবে। এই জাতীয় পেশী স্বতঃক্রিয় বা স্বেচ্ছাপেশী নামে পরিচিত।

স্নায়ু (nerves) ও রক্তবাহী শিরা (blood vessels)

মানবের সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া রক্তবাহী শিরা-উপশিরা ব্যতীত আরও একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় স্নায়ুতন্তু ছড়াইয়া রহিয়াছে। এবং ইহারাই পরস্পর যুক্ত হইয়া অবশেষে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। দেহের মধ্যে ইহারা বিদ্যুৎবাহী তারের ন্যায় কার্য করিয়া থাকে। মস্তিষ্কই মানবদেহের ইচ্ছাকেন্দ্র। এই ইচ্ছাকেন্দ্র হইতে যাবতীয় আদেশ ঐ তন্তুগুলির দ্বারা শরীরের বিভিন্ন স্থানে বাহিত হয়, ইহারাই স্নায়ুমণ্ডলী নামে পরিচিত। স্নায়ু ব্যতীত আরও এক প্রকার রক্তবাহী সূক্ষ্ম নল সমস্ত দেহে ছড়াইয়া রহিয়াছে; ইহাদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইহাদেরই এক শ্রেণী হৃদ্‌পিণ্ড হইতে রক্ত বহন করিয়া দেহের বিভিন্ন অংশে লইয়া গিয়া থাকে এবং অন্য শ্রেণী দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে রক্ত লইয়া হৃদ্‌পিণ্ডে আনিয়া উপস্থিত করে। ইহাদিগের আলোচনা পরে করিব। ইহাদিগের সহিত দেহের আর একটি যন্ত্র — ফস্‌ফুস্‌ বিশেষভাবে জড়িত। নাসিকার মধ্যে দিয়া যে বায়ু আমরা প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, তাহা রক্তের সহিত মিলিত হইয়া তথায় রক্ত পরিষ্কার করিয়া দেহের কিঞ্চিৎ মলিনতা নিঃসৃত করিয়া আনে। সেকথাও পরে একটু বিশদভাবে আলোচনা করিব। এই নল-বাহিত রক্ত-কণা, ইহারা প্রস্তুত হইতেছে আমাদিগের খাদ্য হইতে। খাদ্য-বস্তু মুখের মধ্য দিয়া উদরে প্রবিষ্ট হয়, এবং ইহার একাংশ রক্তে পরিণত হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে। এবং অন্য অংশ দেহ হইতে ঘর্ম, মল, মূত্রাদি রূপে নির্গত হইয়া যায়। এই খাদ্য-বস্তুর ক্রমপরিবর্তনের কথাই প্রথমে বলিব।

খাদ্য এবং উহার ক্রমপরিবর্তন

ক্ষুধা (hunger)

পরিশ্রমের ফলে ক্লান্তি আসে, দেহের অংশবিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহারই পূরণের জন্য দেহ নূতন বস্তু বাহির হইতে গ্রহণ করিতে চাহে; এই ব্যাপারই ক্ষুধা নামে অভিহিত। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আমরা আহার করি। যে সকল খাদ্য-বস্তু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহার বিশিষ্ট পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং এই পরিবর্তনের ফলে যে নূতন রস প্রস্তুত হইতেছে, তাহাই রক্তস্রোতে মিশ্রিত হইয়া দেহ গঠনের সহায়তা করে; খাদ্যের এইরূপ পরিবর্তন পাচন-প্রথা নামে অভিহিত; এইবার সেই সম্বন্ধেই একটু আলোচনা করিতে চাই। কিন্তু এই আলোচনার পূর্বে খাদ্য-বস্তু হিসাবে আমরা কোন কোন পদার্থ গ্রহণ করি, তাহার একটু পরিচয় প্রথমেই দিব।

খাদ্যের উপকরণ (constituents of diet)

আমরা বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত; কিন্তু ইহার সহিত আরও কতকগুলি পদার্থ আমরা আহার করিয়া থাকি; যথা — মৎস্য, মাংস, তরকারী, তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি। পাকিস্তানের লোকেরা ভাতের তেমন ভক্ত নহে; তাহারা রুটি, চাপাতি প্রভৃতি অধিকতর পছন্দ করে। আরও পশ্চিমে দেখা যায় পাঁউরুটির প্রচলনই অধিক। তবে সে সকল দেশে এই রুটির সহিত মাংস, ঘৃত অথবা অনুরূপ স্নেহ-পদার্থ সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সকল বিভিন্ন খাদ্য-বস্তু, রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে তিনটি বিশেষভাবে বিভক্ত হইয়াছে, যথা — আমিষ বা প্রোটিন, শ্বেতসার বা স্টার্চ এবং স্নেহ-পদার্থ বা তৈল ও চর্বি।

ভাতে আমিষের পরিমাণ অল্প, শ্বেতসারই অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বর্তমান, রুটির মধ্যে শ্বেতসারের সহিত অল্পমাত্রায় আমিষ পদার্থ রহিয়াছে কিন্তু ভাতের তুলনায় তাহা অধিক; এইজন্যই ভাত অপেক্ষা রুটি দেহের পক্ষে অধিকতর উপাদেয়। ঘৃত, তৈল প্রভৃতি শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল পদার্থ ব্যতীত অতি অল্প পরিমাণে লবণ এবং ঐ জাতীয় অন্য পদার্থও দেহের জন্য প্রয়োজন। ঠাণ্ডা শ্বেতসার পানিতে গুলিবে না, তবে ফুটন্ত পানিতে ইহাকে দ্রবীভূত করা যায়। তোমরা অসুখের সময় বার্লি কখনও কখনও খাইয়া থাকিবে; বার্লিই শ্বেতসারের সুন্দর উদাহরণ। দেহ কিন্তু বার্লির এই জলীয় দ্রবণ রক্তস্রোতে মিশাইতে পারে না। এই শ্বেতসার দেহমধ্যে চিনি জাতীয় পদার্থে পরিবর্তিত হয়, এবং তখনই ইহা দেহের কার্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে।

আমাদের খাদ্যের উপকরণগুলি অধিকতর ক্ষেত্রে রন্ধনের পর সহজে শরীর গ্রহণ করিতে পারে। কাঁচা অবস্থায় উহারা সুপাচ্য বা মুখরোচক হয় না। রন্ধনকালে উহাদের দানাগুলি নরম হইলে তবেই তখন তাহা সহজে পাচিত হইতে পারে।

ভাত খাইবার সময় চিবাইবার কষ্ট অনেকেই স্বীকার করেন না, কিন্তু উহা ভালরূপে চিবাইয়া খাওয়া প্রয়োজন; রুটি কিন্তু না চিবাইলে চলে না। ছোট একটি পাঁউরুটির টুক্‌রা মুখে দিয়া একটু বেশী সময় ধরিয়া চিবাইলে দেখিবে, উহা হইতে চিনির আস্বাদ পাওয়া যাইতেছে। সত্যই উহার মধ্যস্থিত শ্বেতসার মুখ-নিঃসৃত লালার সাহায্যে রূপান্তরিত হইয়া চিনিতে পরিণত হয়। আমিষ পদার্থও এইরূপে আকার পরিবর্তন করে। সে সকল কথা পরে বলিতেছি।

খাদ্যের পরিমাণ দেহের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যাহারা অধিকতর পরিশ্রমে অভ্যস্ত, তাহাদের খাদ্যের পরিমাণও অধিক। শিশুকালে দেহের সংগঠন কার্য চলিতে থাকে। সে সময় পুষ্টিকর খাদ্য অতিশয় প্রয়োজন। কিন্তু শিশুদিগের হজম করিবার ক্ষমতা তীক্ষ্ণ নহে বলিয়া সহজ-পাচ্য খাদ্য তাহাদিগকে দিতে হয়। যৌবনে দেহ অধিকতর পরিশ্রম করিতে থাকে। এই সময় সেই জন্য অধিক পরিমাণে খাদ্যও প্রয়োজন হয়। যাহারা কায়িম পরিশ্রম অধিক করে, তাহারা যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিবে, বসিয়া যাহারা অফিসের কাজে অভ্যস্ত, তাহারা সেই পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবে না। বয়োবৃদ্ধির সহিত কার্য করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। এই জন্য বৃদ্ধ ব্যক্তিরা অতি সামান্য পরিমাণে আহার গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রয়োজনের অধিক খাদ্য গ্রহণ করিলে অসুখ অবশ্যম্ভাবী।

ভিটামিন (vitamin)

পূর্ববর্ণিত আহার্যগুলির সূক্ষ্মতর পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, উহাদিগের মধ্যে পূর্বোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ ছাড়াও আরও কতকগুলি উপকরণ বিদ্যমান। ইহাদিগের ব্যবহার অতিশয় অল্প পরিমাণেই যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে। ইহারাই খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন নামে অভিহিত। খাদ্যে ইহাদের অভাব ঘটিলে শরীরে ব্যাধির সঞ্চার হয়। এই খাদ্যবস্তু এমনভাবে নির্বাচন করা প্রয়োজন, যাহাতে এই ভিটামিন অন্ততঃ অল্প পরিমাণেও দেহ গ্রহণ করিতে পারে — পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভিটামিন কতকগুলি বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্ত। ইহারাও রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ, আজিও সকলগুলির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় নাই। হয়তো একদিন তাহাদের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে সকল রাসায়নিকের আলোচনার বিষয়। আমি এখানে তোমাদিগকে ইহাদিগের গুণের পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইব। মনে রাখা দরকার যে, রন্ধন করা খাদ্যে ইহাদের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়, এইজন্য কোনও কোনও সব্জি ও ফল আমরা রন্ধন না করিয়াই খাইয়া থাকি।

ভিটামিনগুলির বিভিন্ন নাম এখনও স্থির হয় নাই। তাহাদিগকে এ,বি,সি,ডি এবং ঈ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

ভিটামিন 'এ' তৈল জাতীয় পদার্থে পাওয়া যায়। কড্ নামীয় একটি সামুদ্রিক মৎস্যের যকৃৎ নিঃসৃত তৈল ইহার জন্য প্রসিদ্ধ। তবে বর্তমানে হ্যালিবাট নামীয় আর একটি সামুদ্রিক মৎস্যের যকৃৎ-তৈলে ইহা আরও অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশের ইলিশ মাছের তৈলে, টাট্‌কা দুগ্ধে, মাখন, ঘৃত প্রভৃতির মধ্যেও এই পদার্থটি পাওয়া যায়। দেহে ইহার অভাব ঘটিলে শরীরের স্বাভাবিক সংগঠন প্রতিহত হয়। এই জন্য বিশেষতঃ শৈশব অবস্থায় ইহার প্রয়োজন অধিক। যদি প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্য দিয়া ইহা গ্রহণ করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে কড্‌লিভার তৈল অথবা হ্যালিভেরোল প্রভৃতির শরণ লইতে হয়।

ভিটামিন 'বি'-এর অভাবে শরীরে রক্তাল্পতা, স্নায়ুর দুর্বলতা এবং অন্ত্রের গোলমাল উপস্থিত হইয়া থাকে। বেরি-বেরি নামক মারাত্মক রোগ ইহারই অভাবে আবির্ভূত হয়। সুতরাং দেহের সুস্থতার জন্য এই ভিটামিনটিও কম প্রয়োজনীয় নহে। খাদ্য-বস্তুর মধ্যে ডিম, পশুর যকৃৎ, মৎস্যের ডিম, গমের আটা, ঢেঁকি ছাঁটা চাউল, মটরশুঁটি, সীম প্রভৃতির মধ্যে ইহা পাওয়া যায়। কলে ছাঁটা চাউলের উপর হইতে অতি পাতলা আবরণটি সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হয় বলিয়া, এই ভিটামিনও তখন আর পাওয়া যায় না। এইজন্য কলে ছাঁটা চাউল না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। টাট্‌কা দুগ্ধেও অল্প পরিমাণে এই দ্রব্যটি রহিয়াছে। শিশুর জন্য কিছু দিন পর্যন্ত দুগ্ধই যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'বি' সরবরাহ করিয়া থাকে। পানিতে ইহা গুলিয়া যায়, সব্জি তরকারী পানিতে ফুটাইবার সময় প্রধানতঃ ইহা পানির মধ্যে আগমন করে, এবং পরে অধিকতর উত্তাপের ফলে নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই ভাজা তরকারীর মধ্যে দ্রব্যটি মোটেই পাওয়া যায় না। ভিটামিন 'বি' এখন কয়েকটি বিভিন্ন আকারে পাওয়া গিয়াছে।

ভিটামিন 'সি', 'বি'-র ন্যায় সহজেই উত্তাপের ফলে বিনষ্ট হইয়া যায়। বায়ু সংযোগেও ইহা নষ্ট হয়। এইজন্য টাট্‌কা ফলমূল হইতে ইহাকে সংগ্রহ করিতে হয়। কাগজী লেবু, কমলা, পাকা আম, টমাটো প্রভৃতি নানাবিধ ফল, লেটুসের ন্যায় শাক ইত্যাদি হইতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। ইহার অভাবে দেহে স্কার্ভি নামক যন্ত্রণাদায়ক চর্মরোগের আবির্ভাব ঘটে।

ভিটামিন 'ডি', ভিটামিন 'এ'-এর গুণ-সম্বলিত। ইহার অভাবে দেহের অস্থিগুলি নিয়মিতভাবে পরিপুষ্ট হয় না। শিশুর খাদ্যে ইহার অভাব ঘটিলে দেহে রিকেট রোগের সূচনা হয়। দুগ্ধ হইতে ইহা পাওয়া যায়। তবে প্রধানতঃ সূর্যালোক সাহায্য দেহের মধ্যে ইহার সংগঠন ঘটিতে পারে। বাংলাদেশের মেয়েরা শিশুদিগকে যে রৌদ্রস্নান করাইয়া থাকেন, তাহারই কল্যাণে এদেশে রিকেট দেখা যায় না। ইংলন্ডের ন্যায় প্রায়-আলোকহীন দেশে শিশুরা এই রোগে বহুল পরিমাণে আক্রান্ত হয়। আরগেস্‌টেরোল নামীয় একটি দানাদার পদার্থ সূর্য রশ্মি, অথবা আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে পরিবর্তিত হইয়া ভিটামিন 'ডি'-তে পরিণত হয়। কড্‌লিভার তৈল, হ্যালিভেরোল প্রভৃতি পদার্থ হইতে ইহা অধুনা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভিটামিনগুলির এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ইহাদিগের একটি অন্যটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে না। দেহ সুস্থ রাখিতে হইলে এই বিভিন্ন ভিটামিনের প্রত্যেকটিই অল্প পরিমাণে প্রয়োজন। পূর্বে বলিয়াছি যে, উত্তাপ সহযোগে ইহাদিগের কোনও কোনওটি বিনষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য রন্ধন-কার্য যথেষ্ট সাবধানতা

সহকারে করা দরকার। আমাদের দেশীয় প্রথায় রন্ধনকালে অধিক সংখ্যক তরকারি আমরা ভাজিয়া খাই, ইহাতে কিন্তু ভিটামিনসমূহ প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। রন্ধন না করিলে শ্বেতসার বা আমিষ জাতীয় পদার্থ সহজে দেহগঠন কার্যে লাগে না, অথচ রন্ধন কার্য সাবধানে না করিলে ভিটামিনের মতো প্রয়োজনীয় দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়।

খাদ্যের পরিবর্তন

পূর্বোক্ত খাদ্য-বস্তু আমরা মুখে ফেলিয়া দন্ত সাহায্যে চর্বণ করি, এবং পরে গলাধঃকরণ করিয়া থাকি। চর্বণ কালে খাদ্য-বস্তু মুখ-নিঃসৃত লালার সহিত মিশ্রিত হয়, ফলে তখনই রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়। জিহ্বার নিম্নভাগে কতকগুলি গ্রন্থি রহিয়াছে; উহারাই এই লালা নিস্রাব কার্যে সহায়তা করে। এই লালার মধ্যে একরূপ অতিক্ষুদ্র জীবাণু বিদ্যমান, যাহারা শ্বেতসারকে ভাঙ্গিয়া শর্করায় পরিণত করিতে পারে। ভালরূপে চর্বণ করিয়া কোনও পদার্থ খাইলে উহার পরিবর্তন-কার্য মুখের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া যায়। নরম পদার্থ সহজে চিবাইতে পারা যায়, যে কোনও শক্ত খাদ্যদ্রব্য অতি উত্তমরূপে চর্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করা উচিত।

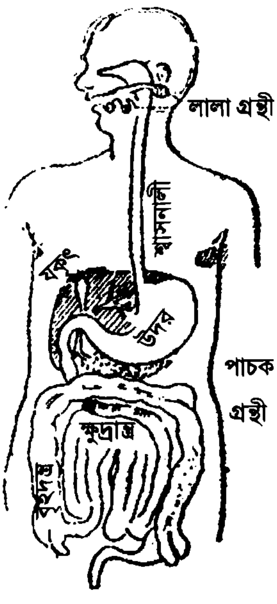

খাদ্যবাহী চক্র

এইবার পরবর্তী পরিবর্তনের কথা ভালরূপে বুঝিতে হইলে পরিপাক চক্রের বিভিন্ন যন্ত্রের কতকটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। পার্শ্বের চিত্রে এই যন্ত্রগুলি দেখান হইয়াছে।

মুখ-গহ্বর হইতে চর্বিত পদার্থমাত্রই জিহ্বার সাহায্যে ফ্যারিংস বা গল-নালীর মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। ফ্যারিংস বা গল-নালী মুখগহ্বরের পশ্চাতে ও অন্ননালী বা ইসোফেগাসের উপরে অবস্থিত পেশীময় একটি থলে বিশেষ। ইহারই নিকট ফুসফুসের মধ্যে বায়ু গমনাগমনের জন্য আর একটি পথ রহিয়াছে, উহার পরিচয় পরে দিব। এই বায়ু-নালীর উপরিভাগে এপিগ্লটিস নামে একটি পর্দা বিদ্যমান। তাহারই সাহায্যে খাদ্য-বস্তুর গমন-পথ নির্দিষ্ট হইয়া বায়ুনালীর পরিবর্তে অন্ননালীর মধ্যে প্রেরিত হয়। কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ যদি কোনও একটি খাদ্যকণা বায়ুনালীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখনই ঐ কণাটিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া দিবার যে চেষ্টা স্বাভাবিক উপায়ে আরম্ভ হয়, তাহার ফলই বিষম-লাগা বলিয়া পরিচিত।

খাদ্য-বস্তু অন্ননালীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই উহার উপরিভাগ সঙ্কুচিত হইয়া প্রসারিত নিম্নভাগ খাদ্য-বস্তুকে প্রেরণ করিয়া থাকে, পরে এই নিম্নভাগ সঙ্কুচিত হওয়ায় আরও নিম্নে প্রসারণ ঘটিয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত খাদ্যনালী ব্যাপিয়া যে সঙ্কোচন এবং প্রসারণ-ক্রিয়ার ফলে খাদ্যবস্তু ক্রমে পাকস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই পেরিস্টলসিস্ (peristalsis) বা কৃমিগতি নামে পরিচিত। পাকস্থলী হইতে অন্ত্রমধ্যে পরিচালিত হইবার সময়ও খাদ্যবস্তু এইরূপ কৃমিগতির সাহায্যেই অগ্রসর হইয়া থাকে।

পাকস্থলীর চিত্র হইতে বুঝিতে পারিবে উহার একাংশ অপেক্ষাকৃত স্ফীত। এই অংশ হৃদ্‌যন্ত্রের নিকট অবস্থিত বলিয়া ইহাকে পাকস্থলীর কার্ডিয়াক সীমা (cardiac end) বলা হইয়া থাকে এবং অন্ত্রের নিকটবর্তী অংশ পাইলরিক সীমা (pyloric end) নামে পরিচিত। এই দুই প্রান্তের দুইটি পেশীময় পর্দার সাহায্যে উহার মধ্যে খাদ্যের আগমন এবং বহির্গমন যথাক্রমে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে পাকস্থলীর শেষ প্রান্তবর্তী পেশীময় পর্দাটি স্ফিংটার বা পাইলোরাস (pylorus) বলিয়া পরিচিত। সমস্ত পাকস্থলীর অন্তরভাগ ব্যাপিয়া একটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucous membrane) বর্তমান। এই ঝিল্লির নিম্নে রক্তবাহী নল, এবং অতিশয় ক্ষুদ্র অনেকগুলি গ্রন্থিও রহিয়াছে। এই গ্রন্থি হইতে একরূপ রস নিঃসৃত হইয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই রসের সাহায্যে অধিকাংশ জলীয় পদার্থ, উহার মধ্যে সামান্য পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অম্ল এবং পেপসিন নামক জীবাণু বর্তমান। ইহার মধ্যে অম্লের পরিমাণ শতকরা ৪ অংশ মাত্র, কিন্তু তাহারই ফলে মুখ-নিঃসৃত লালায় বিদ্যমান টায়ালিনের ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়; অর্থাৎ পাকস্থলীতে শ্বেতসারের কোনও পরিবর্তন ঘটে না, পরন্তু আমিষ পদার্থ এই পাচক রসের (gastric juice) সহিত মিশ্রিত হইয়া ভাঙ্গিয়া পানিতে দ্রবণীয় পেপটোন পদার্থে পরিণত হয়।

পাকস্থলীর মধ্যে যে সঙ্কোচন-ক্রিয়া চলিতে থাকে, তাহার ফলে মথন বা আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তাহাতে খাদ্য-বস্তুর সহিত পাচক রসের সংমিশ্রণ সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়, এবং এখানেই পাচন-কার্য যথেষ্ট অগ্রসর হইয়া, পরে এই মিশ্রিত পদার্থকে ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে, পূর্ববর্ণিত পর্দা বা স্ফিংটারের সাহায্যে প্রেরণ করে। পাকস্থলী কৃমিগতির ফলে, যতই শূন্য হইতে থাকে, আমরা ততই ক্ষুধার অনুভূতি লাভ করি। কেহ কেহ বলেন, রক্ত ধারায় খাদ্য হইতে প্রাপ্ত গ্লুকোজ চিনির পরিমাণ কমিতে থাকিলে, তখন ক্ষুধার অনুভূতি আইসে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরিভাগ ডিউডিনম্ নামে অভিহিত। এই অংশ যকৃৎ এবং পাকস্থলীর নিম্নে পাচন গ্রন্থির (pancreas) সহিত নল দ্বারা সংযুক্ত। খাদ্যবস্তু ক্ষুদ্র অন্ত্রে আগমন করিবামাত্রই, যকৃতের সহিত সংযুক্ত পিত্ত কোষ (gall bladder) হইতে পিত্ত (bile) আসিয়া ঐ অর্ধ বা আংশিকভাবে জীর্ণ খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রণের ফলে, পাকাশয়ের অম্ল পদার্থগুলি, ক্রমে ক্ষার গুণ প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় টায়ালিনের কার্য আরম্ভ হইয়া যায়। ইহার পর কেবল শ্বেতসার নহে, স্নেহ পদার্থও ভাঙ্গিয়া থাকে, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।

এই ক্ষুদ্র অন্ত্র প্রায় ত্রিশ ফিট ব্যাপিয়া প্রসারিত। এই সুদীর্ঘ নলটি সোজাভাবে প্রসারিত হইতে অনেক জায়গার প্রয়োজন ঘটিবে। এইজন্যেই ইহাকে গুটাইয়া, পর্দার সাহায্যে ধরিয়া রাখা হইয়াছে। এই পর্দাই মেসেন্ট্রি নামে পরিচিত। এই অন্ত্রের মধ্য দিয়া খাদ্যবস্তু যতই অগ্রসর হয়, ততই জীর্ণ হইতে থাকে এবং সেই অন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য ভিলাই এবং ল্যাকটিয়াল নামক উদ্যত অংশগুলির সাহায্যে জীর্ণ খাদ্য, দেহের মধ্যে শোষিত হইয়া যায় এবং ক্রমে রক্তস্রোতে মিশ্রিত হইয়া দেহের শক্তি বর্ধন করে এবং বিভিন্ন অংশের পেশীও গঠন করিতে থাকে। খাদ্যের যে অংশ জীর্ণ হইতে পারে না, তাহাই ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে নিঃসৃত হইয়া বৃহদন্ত্রে জমে এবং তথা হইতে মলরূপে নির্গত হইয়া যায়।

দেহের উত্তাপ সংরক্ষণ (maintenance of body heat)

খাদ্য-বস্তু দেহের মধ্যে পরিবর্তিত হইবার সময় যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপই শরীরের তাপ রক্ষা করিতে সাহায্য করে। তোমরা হয়তো অনেকেই জান যে, শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ, তাপ-মাপ যন্ত্রে ৯৮·৪ ডিগ্রি (ফারেনহাইট) বলিয়া প্রতিপন্ন হাইয়াছে এবং বরাবর এই উত্তাপ দেহ মধ্যে বিদ্যমান থাকে। আমরা জানি যে, উত্তপ্ত দ্রব্য রাখিয়া দিলেই তাপ হারাইয়া শীতল হয়, কিন্তু দেহের উত্তাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও এই নব উদ্ভূত উত্তাপ দ্বারাই সে ক্ষতি পূর্ণ হইয়া যায়। আরও অন্য উপায়েও উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেমন ফুস্‌ফুসের সাহায্যে অম্লজান সহযোগে অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময় ঘটে। এই সকল উপায়েই দেহের উষ্ণতা রক্ষা হয়।

খাদ্যের সাহায্যেই দেহের ক্রমবর্ধন ঘটে, খাদ্যের অভাব ঘটিলে দেহ পুষ্টি পায় না, মানুষ শক্তি হারাইতে থাকে এবং ক্রমশঃ শরীর ক্ষীণ হইয়া যায়। মন্বন্তর খাদ্যের অভাবেই ঘটে, তাহার ফলাফল সকলেরই জানা আছে।

শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া

নিঃশ্বাস বায়ুর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the exhaled air)

দেহের জন্য আহার্যের প্রয়োজন সন্দেহ নাই; কিন্তু বায়ু আহার্য অপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজনীয় পদার্থ। বায়ুর অভাবে অতি অল্পকাল মধ্যে মানবের মৃত্যু ঘটে। এই বায়ু শরীরের কি প্রয়োজন পূর্ণ করে, কিরূপেই বা আমরা ইহাকে ব্যবহার করি, সে কথাটি জানাও দরকার। তোমরা রসায়ন শিক্ষার ফলে জানিতে পারিয়াছ যে, বায়ু কতকগুলি বাষ্পীয় পদার্থের সংমিশ্রণে প্রস্তুত। আমরা দেহের জন্য বায়ু মধ্য হইতে, কেবলমাত্র অম্লজান বাষ্পই গ্রহণ করিয়া থাকি। নিঃশ্বাসের সহিত যে বায়ু দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়, তাহার সহিত প্রশ্বাস বায়ুর অল্প পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, পরীক্ষায় ইহা আমরা প্রমাণ করিতে পারি।

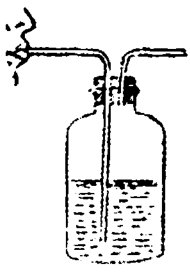

নিঃশ্বাস বায়ুর পরীক্ষা

নিঃশ্বাস বায়ু শীতল কাচের উপর পতিত হইলে, দেখিতে পাইবে কাচের উপরে একটি পাতলা জলীয় স্তর জমিয়া যায়। যে বায়ু আমরা নিরন্তর প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, তাহাতে কিন্তু এইরূপ জলীয় স্তর কাচের উপর না জমিলেও বরফপূর্ণ গ্লাসের গায়ে কিয়ৎ পরিমাণে এইরূপ পানি জমিয়া থাকে; সুতরাং বলিতে হয় যে, নিঃশ্বাস বায়ু প্রশ্বাস বায়ু অপেক্ষা অধিকতর জলসিক্ত।

উপরে প্রদর্শিত মতো একটি যন্ত্র লইয়া উহার ক্ষুদ্রতর নলটি নাসিকার সহিত যুক্ত কর। পাত্র-মধ্যে-অল্প পরিমাণ চুনের পানি রাখা হইয়াছে। ঐ নলের মধ্য দিয়া প্রশ্বাস টানিলে, বাহিরের বাতাস অন্য নলের সাহায্যে চুনের পানির মধ্য দিয়া আসিয়া নাসিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। এই সময় নিঃশ্বাস বায়ু বাহিরে ছাড়িতে থাক, অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রশ্বাসের সময় ঐ নলটি তোমার নাসিকার সহিত যুক্ত করিবে। দুই-তিন মিনিট এইরূপে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলেও, ঐ পানির মধ্যে বিশেষ কোনও পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না। এইবার প্রশ্বাস লইয়া, নিঃশ্বাস বায়ু চিত্রে প্রদর্শিত মতো মুখের সাহায্যে দীর্ঘতর দ্বিতীয় নলের মধ্য দিয়া পরিচালিত কর। দেখিবে দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই ঐ নির্মল চুনের পানি ঘোলাটে হইয়া যাইবে। ইহার কারণ এই যে, নিঃশ্বাসের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ (carbon di-oxide) আমরা ত্যাগ করিয়া থাকি। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছ যে, দেহের মধ্য হইতে নিঃশ্বাসের সহিত আমরা জলীয় বাষ্প এবং অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ ত্যাগ করি। প্রশ্বাস বায়ুর এই পরিবর্তন কিরূপে সাধিত হইতেছে, সেই কথা এইবার বুঝাইয়া বলিব।

শ্বাসনালী (Trachea)

আমরা সাধারণতঃ নাসিকার সাহায্যেই প্রশ্বাস গ্রহণ করি। কিন্তু সর্দির প্রভাবে নাসিকা বন্ধ হইলে সময় সময় আমরা মুখ দিয়াও প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। সুতরাং এই দুইটি পথই শ্বাসনালীর সহিত সংযুক্ত বলিতে হইবে। পূর্বে বলিয়াছি যে, মুখগহ্বর দিয়া খাদ্য পাকস্থলীতে গমন করিবার সময় কখনও কখনও বিষম লাগিয়া থাকে, ঐ ব্যাপার ঘটিবার একমাত্র কারণ এই যে, অসাবধানতা প্রযুক্ত কখনও যদি শ্বাস-নালীর মধ্যে কোনও খাদ্য-বস্তু গমন করে তাহাকে বাহির করিবার জন্য যে চেষ্টা তথায় হইয়া থাকে, তাহারই ফলে বিষম লাগে। অন্ননালী গলার পশ্চাৎ ভাগে রহিয়াছে। ইহার পুরোভাগে যে কণ্ঠনালী দেখিতে পাও, উহাই শ্বাসনালীর উপরিভাগ। এই স্থানে স্বরযন্ত্র (larynx) অবস্থিত; উহা হইতে স্বর নির্গত হইয়া থাকে। এই শ্বাসনালীর উপরিভাগে গ্লটিস নামে ছিদ্র বিদ্যমান। এই ছিদ্রটির উপর এপিগ্লটিস নামক তরুণাস্থি, উহাকে সব সময় বাহিরের পদার্থের প্রবেশ-সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিতেছে। নাসিকার পথে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া গ্লটিসের মধ্য দিয়া শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে। ঐ শ্বাসনালী অল্প দূর গিয়াই দুইটি ব্রঙ্কিআই-এ বিভক্ত হইয়াছে; ইহার পরে উহা ক্ষুদ্রতর শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পরিশেষে ফুস্‌ফুসে পরিণত হইয়াছে। এপিগ্লটিস এবং শ্বাসনালীর প্রায় সমস্ত অংশই তরুণাস্থি (cartilage) দ্বারা সংগঠিত। কিন্তু ব্রঙ্কিআই-এ এই অস্থি, অধিকতর নরম হইয়া ফুস্‌ফুসে আসিয়া, একেবারে পেশীতে পরিণত হইয়াছে।

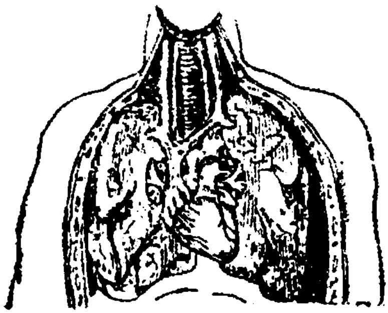

শ্বাস যন্ত্র

ফুস্‌ফুস্ (lungs)

ফুস্‌ফুসের আকৃতি অনেকটা আঙ্গুরের গুচ্ছের ন্যায়। পেশীময় কোষগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে। কখনও সুবিধা ঘটিলে কোনও জন্তুর ফুস্‌ফুস্ লইয়া পরীক্ষা করিলেই ব্যাপারটি ভালরূপে বুঝিতে পারিবে। এইগুলি বায়ুকোষ নামে পরিচিত। ফুস্‌ফুসের মধ্যে অসংখ্য বায়ুকোষ বিদ্যমান। প্রশ্বাস গ্রহণ করিলেই বায়ু দ্বারা ইহা স্ফীত হইয়া উঠে এবং নিঃশ্বাস পরিত্যাগকালে পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। রবারের বেলুনের ন্যায়, ইহারা স্থিতিস্থাপক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ মাত্র।

এই কোষের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য রক্তবাহী নল বর্তমান। আমরা যখন প্রশ্বাস গ্রহণ করি, তখন দেহের দূষিত বায়ু এই ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষগুলির মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় রক্ত কণিকারা (blood corpuscles) বাতাস হইতে অম্লজান গ্রহণ করে এবং রক্তের দূষিত অংশ অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ (carbon di-oxide) বাষ্প ঐ বাতাসের মধ্যে ত্যাগ করিয়া যায়। এই সময়ও দেহে কিছু তাপের উদ্ভব ঘটে। এই পরিষ্কৃত রক্ত ফুস্‌ফুস্‌ হইতে ফিরিয়া পুনরায় হৃদ্‌যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত দেহময় ছড়াইয়া পড়ে। বায়ু নাসিকার মধ্য দিয়া গমন করিবার সময় উহার মধ্যস্থিত ঝিল্লিময় আবরণের উপর দিয়া যাইতে থাকে ও এই সময় যথেষ্টরূপে জলীয় বাষ্প সিক্ত হইয়া যায়। পরে এই সিক্তবায়ু নির্গত হইয়া, দেহ হইতে জলীয় বাষ্প কিয়ৎ পরিমাণে অনবরত লইয়া যাইতেছে। ফুস্‌ফুস্‌ অপলাপ বা pleura নামীয় রস-ঝিল্লি দ্বারা আবৃত। বক্ষঃস্থলের অন্তরভাগে সিরাস্‌ মেমব্রেন (serous membrane) নামক অন্য একটি রস-ঝিল্লি, প্লুরা এবং পঞ্জর প্রদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত; এই দুইটি ঝিল্লির মধ্যভাগ সর্বদাই রস দ্বারা সিক্ত থাকে এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে ফুস্‌ফুস্‌দ্বয় যেরূপ চলাচল করে তাহাতে ইহাদিগের মধ্যে একটি সংঘর্ষ অনবরত সংঘটিত হয়, কিন্তু এই রসসিক্ত ঝিল্লি বিদ্যমান থাকায় পঞ্জরাস্থির অপেক্ষাকৃত কঠিন তলের সহিত সংঘর্ষে ইহার কোনওরূপ ক্ষতি হয় না।

নির্মল বাতাসের আবশ্যকতা

খাদ্য এবং পানীয় বস্তুর সহিত যেরূপ বিষাক্ত পদার্থ দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা, সেইরূপ বাতাসের সহিত বিষাক্ত বায়ু ফুস্‌ফুস গমন করিলে, পীড়া এবং মৃত্যু উভয়ই ঘটিতে পারে। এই জন্য নির্মল বায়ু সেবন করা প্রয়োজন। অনেক বায়বীয় পদার্থের বিশিষ্ট গন্ধ রহিয়াছে। নাসিকার পশ্চাদ্‌ভাগে গন্ধ অনুভব করিবার জন্য সৃষ্টিকর্তা যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে গন্ধযুক্ত বায়বীয় বিষ-পদার্থ সম্বন্ধে আমরা কতকটা সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারি। কিন্তু দৃষ্টির অন্তরালে কতকগুলি ভীষণ রোগ-জীবাণু নিরন্তর বায়ু-স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, ইহাদিগের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করা যায়? নাসিকার মধ্যে এক রূপ চুল রহিয়াছে। উহার দুই পার্শ্ব সর্বদাই সিক্ত থাকে। এই ব্যবস্থায় রোগ-জীবাণু এবং বায়ুস্থিত ধূলিকণা বহুল পরিমাণে নাসিকার মধ্যেই ধরা পড়িয়া যায়। কিন্তু কখনও কখনও ফুস্‌ফুসের মধ্যেও উহারা গমন করিতে পারে। এইজন্য সেবনীয় বায়ু নির্মল হওয়া বাঞ্ছনীয়; ধূলা, ধূম প্রভৃতি হইতে সর্বদা সাবধান থাকা প্রয়োজন।

রক্তবাহী চক্র

রক্তের প্রবাহ (circulation of blood)

সুদূর অতীতে, প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে, শরীরের মধ্যে রক্ত-স্রোতের প্রবাহ-কথা, পশ্চিমের লোক জানিত না। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে হারভি সর্বপ্রথম এই সত্যের প্রচার করেন যে, দেহমধ্যে রক্ত-স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। তখনও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার ঘটে নাই এবং লোকে এই রক্ত চলাচলের কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হয় নাই। এই প্রত্যক্ষ দর্শনের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াও হারভি এই মহাসত্য প্রচার করিতে দ্বিধা করেন নাই। তিনি বলেন যে, হৃদ্‌যন্ত্র হইতে নির্গত হইয়া রক্ত ফুস্‌ফুসের সাহায্যে পরিষ্কৃত হয়, ও পরে পুনরায় ঐ যন্ত্রের সহায়তায় সমস্ত দেহে প্রবাহিত হইতে থাকে। অল্পকাল পরেই এক ইতালীয় বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে রক্তবাহী অতি সূক্ষ্ম শিরাগুলিকে দেহের ফুস্‌ফুস্‌-মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এইরূপে হারভির আবিষ্কার পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তুমিও ইচ্ছা করিলে সহজেই এই রক্ত-প্রবাহের কথা প্রমাণ করিতে পার। দেহের কোনও অংশ, ধর — যেমন হস্ত বা পায়ের অংশবিশেষ কিছুক্ষণের জন্য টিপিয়া ধরিলে বা বাঁধিয়া রাখিলে ঐরূপে আবদ্ধ হৃদ্‌যন্ত্র হইতে অধিকতর দূরে অবস্থিত অংশে আর রক্ত চলাচল হয় না; ঐ স্থানে ক্রমেই রক্তহীন হইয়া পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে ও শীতল হইতে থাকে। বহুক্ষণ ঐরূপ আবদ্ধ থাকিলে ঐ স্থানের পেশী মরিয়া যায় ও উহা পচিতে আরম্ভ করে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে খুলিয়া দিলেই পুনরায় রক্ত চলাচল আরম্ভ হয় এবং উহা স্বাভাবিক রূপ গ্রহণ করে।

রক্ত-প্রবাহ দেহের সুস্থতার জন্য নিরতিশয় প্রয়োজন। হৃদ্‌যন্ত্র হইতে নির্গত হইয়া তাজা রক্ত দেহের বিভিন্ন স্থানে উহার প্রয়োজনীয় পদার্থ লইয়া যায়। আবার শিরা দিয়া ফিরিবার সময় দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে পরিত্যক্ত আবর্জনা বহন করিয়া নানাভাবে উহাকে দেহ হইতে নিঃসারিত করিয়া দেয়, এবং হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্‌ সাহায্যে পুনরায় তাজা রক্তে পরিণত হয়। ঐরূপেই রক্তধারা দেহের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

হৃদ্‌যন্ত্র (heart)

দেহের কোনও স্থান হঠাৎ কাটিয়া গেলে দেখা যায়, সেই স্থান হইতে রক্ত ক্রমাগত নির্গত হইতে থাকে। ত্বকের নিম্নে একটু গভীরতর ক্ষত হইলে রক্তস্রাব এত বেশী হয় যে, মানুষ রক্ত হারাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রক্তের নির্গমন ঠিক একই বেগে হয় না। পরন্তু, রক্ত-নির্গমন ক্রিয়া সবিরামভাবে ঘটিতে থাকে। অর্থাৎ একবার বেগে নির্গত হইয়া, অল্পকাল বিরামের পর পুনরায়

অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। ইহাতে মনে হয় যে, দেহমধ্যে কেহ কোনও বিশেষ শক্তির সাহায্যে রক্তকে মাঝে মাঝে ঠেলিয়া দিতেছে। এই চাপের ফলেই রক্ত সবিরাম গতিতে (intermittently) নির্গত হয়। কোনও ব্যক্তির রক্ত-নির্গমন এইরূপভাবে ঘটিলে আহত মানুষটিকে বাঁচাইবার প্রধান উপায় হইতেছে, উহার ঐ ক্ষতস্থানে অন্ততঃ অঙ্গুলির চাপ দিয়া এই রক্ত-প্রবাহ বন্ধ করা। যদি কোনও দিন এই ব্যাপার নিজেরা প্রত্যক্ষ কর, তাহা হইলে হাতটি পরিষ্কার করিয়া অঙ্গুলি সাহায্যে ক্ষতস্থানটি চাপিয়া ধরিবে বা বাঁধিয়া ফেলিবে এবং ডাক্তারের সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান ছাড়িবে না।

এই যে রক্ত, দেহাভ্যন্তরের কোনও চাপের ফলে নির্গত হইতেছে, এই চাপটি হৃদ্‌যন্ত্রের দ্বারাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। তোমাদের বক্ষস্থলের বাম পার্শ্বে পঞ্জরের নীচের দিকে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী রাখিলে, বুঝিতে পারিবে উহার নিম্নে কোনও একটি যন্ত্র ক্রমাগত নড়িতেছে। এই যন্ত্রই হৃদয়, ইহা একটি বিশিষ্ট প্রকার পেশীময় যন্ত্র; উহার আকার এবং অন্তর ভাগের অল্প পরিচয় নিম্নের চিত্র হইতে বুঝিতে পারিবে।

হৃদয়ের নিম্নভাগ, অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্ফীত পেশী দ্বারা নির্মিত; কিন্তু উপরিভাগের পেশীগুলি তত মোটা নহে। উহার অন্তরভাগ ফাঁকা এবং সর্বদাই রক্ত দ্বারা পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে উহার মধ্যভাগ চারি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত নিম্নের দুই প্রকোষ্ঠ ভেন্ট্রিকল্ (ventricle) বা নিলয় এবং উপরের প্রকোষ্ঠ দুইটি অরিকল্ (auricle) বা অলিন্দ নামে অভিহিত। ইহাদিগের মধ্যে বাম পার্শ্বের ভেন্ট্রিকল্ রক্তবাহী ধমনীর সহিত সংযুক্ত, এবং বাম অরিকল্ দ্বারা পরিষ্কৃত শিরাপ্রবাহী রক্ত, হৃদয়-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দক্ষিণপার্শ্বের অরিকল্ মধ্যে অপরিষ্কার রক্ত সমস্ত দেহ হইতে আসিয়া জমিয়া থাকে, এবং তথা হইতে দক্ষিণ ভেন্ট্রিকলে উপস্থিত হয়। অরিকল্ এবং ভেন্ট্রিকল্ পরস্পরের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত যে, উপর হইতে রক্ত অনায়াসে গড়াইয়া নীচে নামিতে পারে; কিন্তু এই নিম্নভাগের ভেন্ট্রিকল্ হইতে রক্ত যখন বিতাড়িত হয়, তখন আর উহা অরিকলে যাইতে পারে না। ঐ পথের পর্দা দুইটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায় এবং পার্শ্বের নল দ্বারা এই রক্ত বাহিত হইতে থাকে। দক্ষিণ ভেন্ট্রিকল্ হইতে এই অপরিষ্কার রক্ত ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং তথায় পরিষ্কৃত হইয়া পুনরায় বাম অরিকলে আসিয়া জমে। অরিকলে রক্ত জমিলেই উহা একটু স্ফীত হইয়া উঠে এবং যখন ঐ রক্ত তলদেশের ভেন্ট্রিকলে নামিতে থাকে তখন এই ভেন্ট্রিকল্ স্ফীত হইয়া উঠে। বাম ভেন্ট্রিকল্ কুঞ্চিত হইলে ঐ রক্ত পার্শ্বের নল

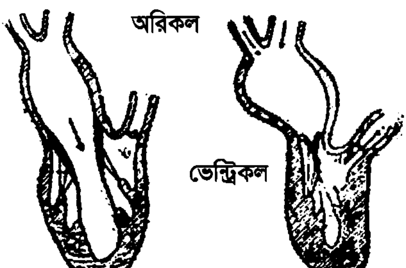

হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া

দ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে, হস্তে এবং পাদদেশে গমন করিয়া থাকে। হৃদয়ের এই কুঞ্চন এবং প্রসারণের ফলেই আমরা বক্ষঃস্থলে হৃদয়ের চলাচল অনুভব করিয়া থাকি। যাবৎ মানব জীবিত থাকে, তাবৎ তাহার হৃদ্‌যন্ত্র অনবরত চলিতে থাকে। তবে কখনও বা উহা দ্রুততালে চলে, কখনও বা অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিয়া থাকে। আমরা যখন চলাফেরা করি, দণ্ডায়মান থাকি, অথবা ব্যায়াম করি, তখন হৃদয় দ্রুততর গতিতে চলিতে থাকে; কিন্তু শুইয়া বিশ্রাম করিলে, তখন ইহার চলাচল মন্দ গতিতে হয়। পীড়ার সময় দেহে প্রদাহ হইলে তখনও ইহার গতি দ্রুত হয়।

নাড়ী (pulse)

অসুখ হইলে কবিরাজ মহাশয় তোমার হাতের কব্জিটি অঙ্গুলী দ্বারা অনুভব করিয়া থাকেন। এখানে তিনি কি দেখেন, কখনও শুনিয়াছ কি? হয়তো শুনিয়া থাকিবে তিনি এইরূপে তোমার নাড়ী পরীক্ষা করেন। নাড়ী কি? পূর্বে তোমাদের রক্তবাহী ধমনীর কথা বলিয়াছি। হৃদয়ের বাম ভেন্ট্রিক্‌ল্ হইতে নির্গত হইয়া একটি বৃহৎ ধমনী কতকগুলি শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। উহাদের একটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি হাতে গিয়াছে, এক অংশ ঊর্ধ্বমুখে ধাবিত হইয়া পরে মস্তকে গমন করিয়াছে, এবং অন্য অংশ নিম্নভাগে, শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পদদ্বয়ে চলিয়া গিয়াছে। দেহের মধ্যভাগেও ইহার অন্যান্য শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। ভেন্ট্রিক্‌লে রক্তের চাপ বাড়িতেই রক্তধারা এই বৃহৎ ধমনীটির মধ্যে দিয়া প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হয়। হৃদয়ের গতি সবিরাম, অর্থাৎ একবার চাপ পড়িয়া পরে একটু স্থির হয় এবং পুনরায় চাপ পড়ে। এই চাপের পরিবর্তন রক্তবাহী ধমনীর যে কোনও শাখা এবং প্রশাখা হইতে ধরা পড়িবে। হাতের কব্জির মধ্যে ধমনীর যে শাখাটি বিদ্যমান, উহার মধ্যেও এই রক্তের গতির কথা জানিতে পারা যায়। সুতরাং অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিয়া, এই স্থান হইতে কবিরাজ হৃদয়ের অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক বার্তা অবগত হইতে পারেন। তোমরাও এ কথা যদি কিছু জানিতে চাও, নিজের এক হাত দিয়া অন্য হাতের নাড়ী পরীক্ষা করিলেই দেখিবে উহার মধ্যে এই হৃদয়ের গতির ছন্দই ধরা পড়ে। হৃদয়ের গতিবেগও এইরূপে জানা যায়। তবে হৃদয়ের স্পন্দনটি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না কারণ হৃদয় হইতে হস্ত পর্যন্ত আসিতে রক্তের ঢেউগুলি অল্প একটু সময়

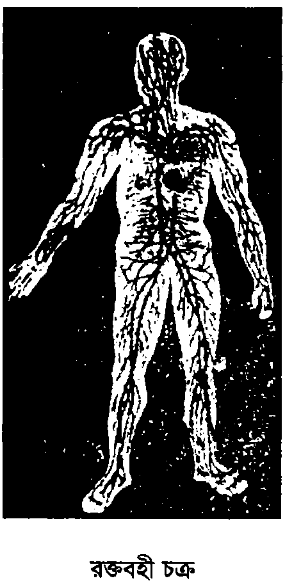

রক্তবহী চক্র

লইয়া থাকে; এইজন্য হৃদয়ের স্পন্দনের (beat) অল্পক্ষণ পরেই হাতের নাড়ী চলিবে। কোনও বন্ধুর দুই হাতের নাড়ী দুই হাত দিয়া টিপিলে কিন্তু দেখিবে ঐ দুই হাতের নাড়ি একই সময় চলিতেছে।

ধমনী দিয়া রক্ত, দেহের বিভিন্ন স্থানে গমন করিতেছে, এবং নিজের মধ্যে যে পুষ্টিকর পদার্থ আছে, তাহা দান করিয়া শিরার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ধমনী এবং শিরার গঠনবিধিতে একটু পার্থক্য রহিয়াছে। ধমনী একেবারে সাদাসিদা, কিন্তু শিরার মধ্যভাগে চিত্র-প্রদর্শিত মতো কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলি বা valve বিদ্যমান। ইহারা আছে বলিয়াই শিরার মধ্য হইতে রক্তস্রোত বিপরীত দিকে চালিত হয় না। ধমনীর মধ্যে রক্তের যে চাপ বর্তমান, শিরার মধ্যে গিয়া তাহার পরিমাণ কমিয়া যায়। এই জন্য এই থলিগুলি তথায় না থাকিলে, রক্ত হৃদয়ের দিকে না গিয়া বিপরীত পথে আসিতে পারিত। রক্ত দেহের বিভিন্ন স্থানে সমস্ত কার্য সম্পাদন করার ফলে, অম্লজান হারাইয়া অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ গ্রহণ করতঃ একটু ঘোরতর বর্ণ ধারণ করে, এই জন্য শিরাগুলিকে দেখিতে নীল বর্ণের মনে হয়। ফুস্‌ফুসের সাহায্যে এই নীলাভ লালবর্ণের শিরাবাহী রক্ত নূতন অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ধারণ করে। কোনওরূপে ধমনী ছিন্ন হইলে অধিকতর চাপের ফলে তথা হইতে অধিক পরিমাণ রক্ত নষ্ট হইবে, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই জন্যই বিধাতার বিচিত্র বিধানে ত্বকের ঠিক নিম্নে রহিয়াছে শিরাগুলি, কিন্তু ধমনী আরও নিম্নে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে অবস্থিত।

ধমনী শিরা

ধমনী ও শিরার দ্বিখণ্ডিত চিত্র

রক্ত-কণিকা (Blood corpuscles)

এই যে বিভিন্ন ধমনী মধ্যে প্রবহমান রক্ত, ইহা প্রকৃতপক্ষে কি? ক্ষত স্থান হইতে রক্ত ক্ষরণ দেখিয়াছ। উহা লোহিত বর্ণের একটি তরল পদার্থ বিশেষ। বায়ুর সহিত সংস্পর্শ হইলে, অতি অল্পকাল মধ্যেই এই রক্ত জমিয়া যায়। রক্ত জমিলে উহাকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা সম্ভবপর — একটি তরল জলীয় পদার্থ, উহাই প্লাজমা (plasma) বা লসীকা নামে পরিচিত, এবং অপর অংশটি ফাইব্রিন (fibrin)। রক্ত জমিবার পূর্বে উহাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন্ত কণিকা বিদ্যমান দেখা যায়। কিন্তু ইহাদিগকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখিলে দেখা যায়, এই কণিকাগুলি দ্বিবিধ। একটি বৃত্তাকার, ফিকা লাল রং-এর এবং উহারা দুই পার্শ্বে একটু চেপ্টা; দ্বিতীয় শ্রেণীর কণিকাগুলি শ্বেত কণিকা নামে পরিচিত। ইহাদিগের সকলের কোনও বিশিষ্ট আকার নাই এবং ইহারা সংখ্যাও অল্প। শরীরের মধ্যে কোনও রোগবীজাণু প্রবেশ করিলে, এই শ্বেত কণিকাগুলিই তাহাদিগের সহিত

যুদ্ধে নিযুক্ত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জয়ী হইয়া বীজাণুগুলিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। কিন্তু যদি বীজাণুগুলির শক্তি অধিকতর হয়, তাহা হইলেই মানব পীড়াগ্রস্ত

রক্ত ও শ্বেত কণিকা

হইয়া কষ্ট পাইতে থাকে, এবং একদিন মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে পারে। রক্তের এই কণিকাগুলি মিলিয়াই জমাট রক্তের ফাইব্রিন প্রস্তুত করে। এই যে রক্ত-মধ্যে ত্রিবিধ পদার্থ, ইহারা প্রস্তুত হইতেছে বিভিন্ন উপাদান হইতে। খাদ্যদ্রব্য পাচিত হইয়া প্লাজমা বা লসীকা রূপে রক্তস্রোতে মিশ্রিত হয়, এবং অস্থিগুলির মধ্যে যে মজ্জা রহিয়াছে তাহা হইতেই এই কণিকাগুলি উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহারা চিরকাল বাঁচিয়া থাকে না, প্রায় পক্ষকাল মধ্যেই উহাদিগের মৃত্যু ঘটিলে, নূতন কণিকা নির্মিত হয়। এই কণিকা মধ্যে লোহিত বর্ণের কণিকাগুলি অস্থি-মধ্যস্থ লোহিত বর্ণের মজ্জা হইতে প্রস্তুত হইতে থাকে, এবং শ্বেত কণিকাগুলি অস্থিমধ্যে নিহিত ঈষৎ পীতবর্ণের অন্য একরূপ কণিকা হইতে উদ্ভূত হয়। রক্তের লোহিত বর্ণ হিমগ্লোবিনের জন্যই দেখা যায়; এই পদার্থটি লৌহ হইতে ঐ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল কণিকা ছাড়াও আরও একরূপ বিষ-প্রতিষেধক পদার্থ (anti-toxin) রক্তে বিদ্যমান। তাহার সাহায্যেও বিষ এবং রোগবীজের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

মানুষের মস্তিষ্কই তাহার দেহের সমস্ত কার্যবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। হৃদয়ের চলাচলও ঐ একই শাসন-কর্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। মস্তিষ্ক তাহার যাবতীয় কার্য টেলিগ্রাফের তারের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম সূত্র-সদৃশ স্নায়ুতন্তুর সাহায্যে সম্পাদন করে। হৃদয়ের ঐরূপ তন্ত্রী সাহায্যে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। এই স্নায়ুমণ্ডলীর পরিচয় পরে দিব।

স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য

মস্তিষ্ক (Brain)

দেহের যাবতীয় যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যই মস্তিষ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার বিভিন্ন অংশ হইতে দেহের বিভিন্ন অংশের কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ইহার যে অংশ অবস্থিত, তথা হইতে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া একটি দীর্ঘ সূত্র-সদৃশ পদার্থ নিম্নে নামিয়া গিয়াছে, এবং তথা হইতে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা নির্গত হইয়া সমস্ত শরীরময় একটি স্নায়ু-সূত্রের জাল বিস্তার করিয়াছে। ইহাই স্নায়ুমণ্ডলী নামে অভিহিত হয়। এইবার ইহাদের সামান্য পরিচয় লিপিবদ্ধ করিব।

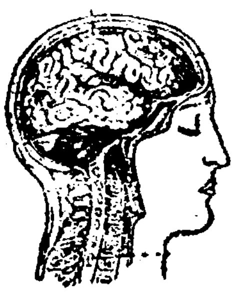

মস্তিষ্ক

মস্তিষ্ক কয়েকটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। এই সকল বিভিন্ন স্থান হইতে দেহের একটি যন্ত্রের কার্য নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। পার্শ্বের চিত্রে সমস্ত মস্তিষ্কই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; উহার বিভিন্ন অংশ দেহের বিভিন্ন কার্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া করে। মস্তিষ্কের নিম্নভাগ দিয়া যে স্নায়ুসূত্র নির্গত হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহাই পরে বিভক্ত হইয়া, দেহময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হইতে নানা আদেশ এই সকল স্নায়ুসূত্রের মধ্য দিয়া গিয়া স্থান বিশেষের পেশীগুলিকে কার্যে নিযুক্ত করে।

স্নায়ু (nerve)

স্নায়ুসূত্রগুলি দ্বিবিধ। প্রথম শ্রেণীর স্নায়ুসূত্রের শেষ অংশ প্রত্যেক দেহযন্ত্রের প্রায় উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এইগুলি সংজ্ঞাবহ (sensory বা afferent) স্নায়ু নামে পরিচিত। দেহের কোনও অংশ আহত হইলে অথবা অন্য কোনওরূপে আক্রান্ত হইলে, এই স্নায়ুসূত্র সাহায্যেই সেই স্থানীয় পেশীকে কার্যে উদ্দীপিত করিবার আদেশ বাহিত হইয়া আইসে। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নায়ুগুলি চেষ্টা-বহা (motor বা efferent) স্নায়ু নামে পরিচিত। ধর, তোমাকে কেহ আঘাত করিয়াছে; তোমার দেহে আঘাতের স্পর্শ হইবামাত্র আহত স্থানের ক্ষতিপূরণ মানসে সংজ্ঞা-বহা (afferent) স্নায়ুর আদেশক্রমে

সেই স্থানে রক্তসঞ্চালন অধিকতর পরিমাণে হইতে থাকিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার মস্তকের অন্য অংশ হইতে হস্তদ্বয়ের উপর আদেশ প্রচারিত হইল যে, এই আঘাতের প্রতিশোধ নাও। প্রতিশোধের চিন্তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তির অধিকতর উৎকর্ষ দ্বারা আমরা অনেক সময় এই স্বাভাবিক প্রচেষ্টাকে নিবারিত করিয়া থাকি। কখনও কখনও শরীরের মধ্যে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া থাকে, যেগুলিকে আমরা এই সংজ্ঞা-বহা স্নায়ুর দ্বারা বাহিত বলিয়া বুঝিতে পারি না। কিন্তু চেষ্টা-বহা স্নায়ুর আদেশ মস্তিষ্ক হইতে হইয়াছে বুঝা যায়; এইগুলিই স্বতঃপ্রবৃত্ত (spontaneous) উত্তেজনা বলিয়া কথিত। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

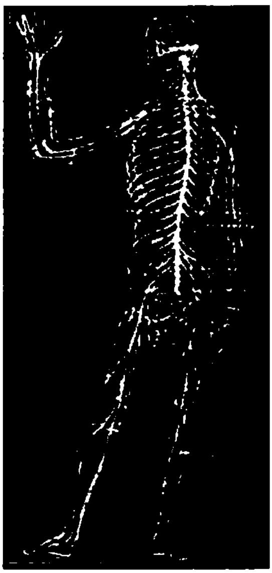

স্নায়ুমণ্ডলী

ধর, একটি অতিশয় উত্তপ্ত পদার্থের উপর হঠাৎ না জানিয়াই তুমি হাত রাখিয়াছ; ফলে তোমার হাতের উপর একটি এমন ধাক্কা অনুভব কর যে, ঐ উত্তপ্ত পদার্থ হইতে তোমার হাত দ্রুত সরিয়া আসে। এত দ্রুত এই ঘটনা সংঘটিত হয় যে, অল্প সময়ের মধ্যে সংজ্ঞা-বহা (afferent) স্নায়ু এই বিপদ-বার্তা বহন করিয়া যাইয়া নূতন আদেশ লইয়া আসিতে পারে না। এইরূপ ক্রিয়াই স্বতঃপ্রণোদিত বলিয়া মনে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, একস্থানের সংজ্ঞা-বহা (afferent) স্নায়ু একটি বিশেষবার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া তথা হইতে অন্য স্থানের পেশীকে উত্তেজিত করিয়া থাকে।

তুমি কখনও কোনও কারণে হঠাৎ লজ্জিত হইয়াছ কি? যদি হঠাৎ লজ্জা পাইয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয় জান যে, ইহার ফলে অকস্মাৎ মুখমণ্ডলের মধ্যে রক্ত চলাচলের বাহুল্য ঘটে। অন্য উত্তেজনায়ও এই ব্যাপারটি কখনও কখনও ঘটিয়া থাকে। লজ্জার উদ্রেক হইতে পারে এইরূপ কোনও কথা শুনিলে কানের মধ্যে দিয়া সংজ্ঞা-বহা (afferent) স্নায়ু যে বার্তা বহন করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায়, তাহারই ফলে সমস্ত মুখাবয়বে অধিকতর রক্তের সমাগম হয় এবং ফলে লাজুক ছেলেটি বা মেয়েটি সমস্ত মুখ রাঙ্গা করিয়া তোলে; সে সময় মুখ, এমনকি কর্ণমূল পর্যন্ত উত্তপ্ত মনে হয়। দুষ্ট ছেলেরা পরীক্ষা-গৃহে নকল করিতে যাইয়া ধরা পড়িলেও কানটি তার লাল হইয়া উঠে একই কারণে। অধিক পরিমাণে রাগান্বিত হইলেও এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অধিকতর আনন্দজনিত যে ভাব দেহমধ্যে প্রকাশ পায়, তাহার ফলে সমস্ত লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠে, ইহাই রোমাঞ্চ বলিয়া কথিত।

সংজ্ঞা-বহা (afferent) স্নায়ুর দ্বারা কোনও বার্তা মস্তিষ্কে যাইলেও আমরা ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে চেষ্টা-বহা (efferent) স্নায়ুকে কার্যে নিযুক্ত করিতে পারি। ইচ্ছা হইলে হস্ত উত্তোলন করিব, চেষ্টা-বহা (efferent) স্নায়ুর সাহায্যে এই আদেশ মস্তিষ্ক হইতে গমন করিতেই হস্ত উত্তোলিত হইল। বাম হস্তকে কার্যে নিযুক্ত করিতে মস্তিষ্কের দক্ষিণাংশে ইহার কেন্দ্র রহিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ হস্তকে কার্যে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মস্তিষ্কের বাম অংশে ইহার কেন্দ্র অবস্থিত।

যদি কেহ তোমাকে আঘাত করে, সংজ্ঞা-বহা স্নায়ু তোমার মস্তিষ্কে সেই বার্তা লইয়া যায় তাহার ফলে দুইটি কার্য ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ আঘাত-প্রাপ্ত স্থানে অধিকতর রক্ত চলাচল হয়, দ্বিতীয়তঃ মস্তিষ্কের তখন ইচ্ছা হয় চেষ্টা-বহা স্নায়ুকে কার্যে উদ্দীপ্ত করিয়া ঐ আঘাতকারীকে প্রত্যাঘাত করা।

কর্ণ (ear)

শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত মস্তিষ্কের যে যোগ স্নায়ুর সাহায্যে ঘটিয়াছে, তাহারই ফলে আমরা বাণী শ্রবণ করিয়া থাকি। এই ইন্দ্রিয়টির সামান্য একটু বিবরণ দরকার। কর্ণ দুইটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, — একটি বহির্ভাগে এবং অপরটি অন্তর্ভাগে অবস্থিত। একটি পাতলা পর্দা এই দুইটি প্রকোষ্ঠকে পরস্পর হইতে পৃথক করিতেছে, এই পর্দাটি টিমপ্যানিক পর্দা (tympanic) নামে পরিচিত। পর্দার ভিতর দিকে যে প্রকোষ্ঠটি রহিয়াছে, উহাই নলের আকারে আসিয়া মুখ-গহ্বরের পশ্চাদ্ভাগে মিশিয়াছে, এবং এই প্রকোষ্ঠের উপরিভাগে কুণ্ডলী পাকাইয়া স্নায়ুমণ্ডলী একটি ক্ষুদ্র পাত্রে একরূপ তরল পদার্থ মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে। কর্ণের বাহিরে ও ভিতরে বাতাস উপস্থিত থাকায় কর্ণ-পটহের (tympanic membrane) আন্দোলনকে, ইহার সহিত সংযুক্ত তিন খণ্ড অস্থির সাহায্যে ঐ পূর্বোক্ত তরল পদার্থের মধ্যে লইয়া গিয়া, তথায় আলোড়ন উপস্থিত করে এবং ইহাই ক্রমে স্নায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে গেলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই। স্নায়ুমণ্ডলী প্রত্যেকটি কর্ণের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম জালের সৃজন করিয়াছে, ইহারা হারমোনিয়ম বা পিয়ানোর

কর্ণের অভ্যন্তর

রীডগুলির সহিত উপমিত হইতে পারে। চিত্রে কর্ণের অভ্যন্তরভাগ কতকটা পরিষ্কারভাবেই দেখান হইয়াছে।

কর্ণ-পটহের বহির্দিকে কতকগুলি গ্রন্থি অবস্থিত; তথা হইতে একরূপ মোমের ন্যায় পদার্থ নির্গত হইয়া, সর্বদাই ঐ বায়ুর গমন-পথ, নলটিকে পরিষ্কার রাখে। ইহার ভিতর দিকের নলটিও বাতাসে পূর্ণ রহিয়াছে, সর্দির সময় আমরা এই ভিতরের নল-পথ বন্ধ হওয়ার দরুন কানে শুনিতে কষ্ট পাই।

চক্ষু (eye)

চক্ষু শরীরের একটি বিস্ময়কর যন্ত্র; ইহার প্রস্তুতবিধি কতকটা ক্যামেরার ন্যায়। উহার সম্মুখভাগে চক্ষু-তারকার পশ্চাতেই যে পরকলাটি (lens) অবস্থিত, তাহারই সাহায্যে পদার্থের ছবি, চক্ষুর মধ্যে পিছনের পর্দার পড়িয়া থাকে, এবং তথা হইতে স্নায়ু সাহায্যে ইহার বার্তা মস্তিষ্কে গিয়া উপস্থিত হইলে আমরা পদার্থ দেখিতে পাই। চক্ষুর মধ্যে যে বিভিন্ন পেশী অবস্থিত, তাহারাই পদার্থের চিত্রটিকে যথাস্থানে লইয়া যাইতে সহায়তা করে। কিন্তু এই পরকলা বা লেন্সটি যদি দুষ্ট হয়, তখন ঐ পদার্থের ছবি ঠিক পিছনের পর্দাটির উপর পড়ে না; বরং হয় তাহারও পশ্চাতে, অথবা সম্মুখে পতিত হইতে থাকে, তখনই আমরা চোখে কম দেখি। চশমার সাহায্যে এই ছবি যথাস্থানে ফেলা হয় বলিয়া, সঠিক চশমা দ্বারা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাই। ছবিটি যখন চক্ষুর পিছনে, রেটিনা নামীয় পর্দার উপর পতিত হয়, তখন উহা উল্টাভাবে পড়ে, এই বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছাইলে তথায় ইহার সঠিক অবস্থান নির্ণীত হইয়া থাকে। উপরের চিত্র হইতে চক্ষু-মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন অংশের পরিচয় পাইতে পারিবে।

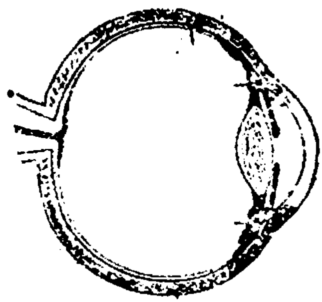

চক্ষুর অভ্যন্তর

মলবাহী যন্ত্র

দেহ হইতে গ্লানি এবং উচ্ছিষ্ট পদার্থ কতকগুলি বিশেষ পথ বাহিয়া নির্গত হয়। এই সকল মলবাহী পথ এইরূপ, যথা — নিঃশ্বাস বায়ুর সহিত দেহের জলীয় অংশ এবং দেহের বিভিন্ন স্থানে উদ্ভূত অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ বাষ্প নির্গত হইয়া অনবরত দেহকে সুস্থতর রাখিতেছে। ইহার বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। দেহ হইতে ভুক্ত পদার্থের যে অংশ দেহ পুষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় নাই, তাহা ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে বৃহদন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় জলীয় অংশ হারাইয়া, ক্রমে নাতি-কঠিন আকারে দেহ হইতে নির্গত হইবার নিমিত্ত, পূর্ব-বর্ণিত সেই কৃমি-গতির সাহায্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, এবং পরিশেষে মলরূপে গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায়। দেহের তরল ময়লা মূত্ররূপে ও ঘর্মরূপে নির্গত হইয়া থাকে।

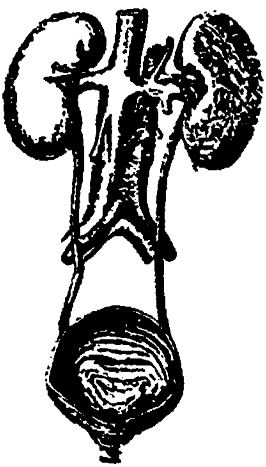

বৃক্কযন্ত্র ও মূত্রথলি

বৃক্কযন্ত্র (kidney) ও মূত্রথলি (bladder) — রক্তবাহী শিরা হইতে রক্ত গিয়া মেরুদণ্ডের তলদেশে উহার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত বৃক্ক-যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; তথায় একরূপ ছাঁকন ক্রিয়ার ফলে রক্তের কণিকাগুলি এক পার্শ্বে লসীকা-প্রবাহে রহিয়া যায়, এবং অন্য পার্শ্বে অপ্রয়োজনীয় জলীয় অংশ দেহ হইতে লবণ, ইউরিক এসিড প্রভৃতি নানারূপ রাসায়নিক পদার্থসহ নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দেহযন্ত্রের চলাচল এবং ক্ষয়ের ফলে নানা স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া রক্ত-স্রোতে বাহির হইতেছিল, এখন বৃক্ক সাহায্যেই উহাকে দেহ হইতে পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইল। এইরূপ ছাঁকন কার্যের পর ঐ জলীয় দ্রবণ আসিয়া বৃক্কের সহিত সংযুক্ত দুইটি নল-পথে বাহিয়া নিম্নে মূত্রথলির মধ্যে জমিতে থাকে। এই মূত্রথলি তিনটি নলের সহিত সংযুক্ত। ইহাদিগের মধ্যে দুইটি নল (ureter) দ্বারা বৃক্ক হইতে মূত্র আসিয়া ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং তৃতীয়ের সাহায্যে ঐ পদার্থ মূত্রনালীর (urethra) দ্বারা দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

ত্বক (skin)

দেহ হইতে আরও একটি পথ দিয়া, অনবরত জলীয় বাষ্প, অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ এবং অন্য পদার্থও নির্গত হইয়া থাকে, ইহাই আমাদিগের দেহাবরণ বা ত্বক। ত্বক-দেশ প্রকৃতপক্ষে দুই অংশে বিভক্ত। ইহাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেই উহার তিন অংশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ইহার একখণ্ড পরীক্ষা করিলে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝা যায়। ত্বকের বহির্ভাগ অধিত্বক (epidermis) এবং অন্তর্ভাগ অধত্বক (dermis) নামে কথিত। ইহারই চিত্র এতৎ নিম্নে রহিয়াছে। পেশীসমূদয় এপিডারমিস বা অধিত্বকের মধ্যে রক্তবাহী কোনও শিরা বা উপশিরা নাই। তবে ইহার মধ্যে স্নেহ পদার্থ থাকে, এবং লসীকা পদার্থও অল্প পরিমাণে ইহার মধ্যে প্রবাহিত হয়। ত্বকের উপরিভাগে আঁচড় লাগিলেই একটি জলীয় পদার্থ অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। উহাই এই লসীকা পদার্থ ও ইহা অধিত্বকের মধ্য হইতে বাহির হয়। মৃত জন্তুর চর্ম ছাড়াইবার সময় এই অধিত্বকই ছাড়াইয়া ফেলা হয়। ইহারই নিম্নে অধত্বক (dermis) রহিয়াছে; উহার মধ্যে রক্তবাহী শিরা-উপশিরাগুলি অবস্থিত এবং স্নায়ুসূত্রগুলিও ইহার মধ্যে জালের ন্যায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক স্নায়ুসূত্রের শেষ অংশ কুণ্ডলীর আকারে অধিত্বকের ঠিক নিম্নে অবস্থিত। পার্শ্বের চিত্রে এই সকল অংশ বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। ইহারই মধ্যে চর্ম-গ্রন্থিগুলি অবস্থিত। এই চর্ম-গ্রন্থি হইতে সূক্ষ্ম নালীপথ, অধিত্বকের উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত; এই পথ বাহিয়া ঘর্ম শরীর হইতে নিঃসৃত হয়। গ্রীষ্মকালে বিশেষতঃ বাতাস যখন আর্দ্র, তখন বাহিরের আর্দ্রতার আধিক্য বশতঃ দেহ-নিঃসৃত ঘর্ম দ্রুত শুকাইতে পারে না, ফলে ঐ সময় অধিক পরিমাণে ঘর্ম নির্গত হইতে থাকে; এবং উহার সহিত দূষিত পদার্থও পরিত্যক্ত হয়। এই পথ দিয়াই আর একরূপ স্বেদ ও স্নেহ পদার্থ অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। এই স্নেহ পদার্থ উপরে আসিয়া চর্মকে মসৃণ ও কোমল রাখে। লোমগুলিও অধত্বকের মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া সূক্ষ্ম নালী বাহিয়া অধিত্বকের উপরে আসে। এই পথ দিয়াও শরীরের পরিত্যক্ত বাষ্পীয় পদার্থ, অন্য নানাবিধ দ্রব্যের সহিত উঠিয়া বাহিরে আসে। এই সকল পদার্থের মধ্যে লবণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই জন্যই শরীর-নিঃসৃত ঘর্ম লবণ-আস্বাদ যুক্ত। ইহার সহিত এইরূপ জৈব পদার্থ অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে; উহার বিশেষ একরূপ দুর্গন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, ঘর্মসিক্ত বস্ত্রাদিতে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

ত্বকের কর্তিত রূপ

স্বাস্থ্য সুন্দর রাখিতে হইলে, চর্মের উপরিভাগ পরিষ্কার রাখা দরকার। তথায় অবস্থিত লোম-কূপগুলি কোনও রূপে বন্ধ হইয়া গেলে দেহের দূষিত পদার্থ নিয়মিতভাবে বাহিরে আসিবে না, ফলে অসুখ করিতে পারে। নখ এবং চুলও এই অধিত্বকের অংশবিশেষ। ঐ সকল স্থানের নিম্নে অধিক পরিমাণ রক্ত চলাচল হয় বলিয়া নখ এবং চুল প্রতিনিয়তই বাড়িতেছে। ইহাদিগকে কাটিলে পুনরায় উহারা বাড়িয়া চলে। পুরাতনের স্থান নূতন পদার্থ দিয়া পূর্ণ হয়।

রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার

আহারে নিয়মানুবর্তিতা

নাসা-পথ দিয়া আমরা যেমন অনবরত বাতাস গ্রহণ করিতেছি, মুখ-পথ দিয়াও তেমনি প্রত্যহ কিছু পরিমাণ খাদ্য এবং পানীয় দেহের প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করিয়া থাকি। দেহের প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া অধিক দ্রব্য আহার করিলেই, অথবা অত্যধিক পানীয় গ্রহণ করিলেই, পাচন-যন্ত্রের অসুবিধা উপস্থিত হয়। এই অসুবিধা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিলে, শরীর অসুস্থ হয়। কিন্তু যদি আমরা উহা সহ্য করিতে পারি তাহা হইলে দেহের পুষ্টির মাত্রা বাড়িতে পারে, ফলে দেহ পুষ্ট হইয়া উঠে। খাদ্য-বিশেষে দেহের পেশীবিশেষ অধিকতর পুষ্ট হয়। শরীরকে নীরোগ রাখিতে হইলে কিন্তু, উহার প্রয়োজন মতো খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। খাদ্য সম্বন্ধে "অধিকন্তু ন দোষায়" কথাটির প্রয়োগ চলিতে পারে না। এই কথাটি মনে রাখিলে পেটের অসুখের সম্ভাবনা অল্প হইবে।

অধিক আহার সাময়িকভাবে দেহ সহ্য করিতে পারিলেও চিরকাল তাহা সহ্য করিবে না। এই জন্য দেখা যায়, অল্প বয়সে যাহারা অধিক আহার করেন, বয়স বাড়িলে অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা পেটের অসুখে ভুগিতে থাকেন। আবার ইহাও দেখা যায় যে, যাহারা অল্প আহার করে, অর্থাৎ দেহের প্রয়োজন মতো আহার গ্রহণ করে না, তাহারা অল্পাহারে ক্রমে দুর্বল হইয়া নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। সুতরাং তোমরা সুস্থ এবং সবল হইয়া বাঁচিতে চাহিলে নিয়মিত এবং পরিমিত আহার করিতে ভুলিবে না।

আহার্যের পরিমাণ সম্বন্ধে যেরূপ নির্দিষ্ট নিয়ম রক্ষা করা প্রয়োজন, আহারের সময় সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়মের অধীন থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। অতীত ও বর্তমানের লোকদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া যাহারা বাঁচিয়া ছিলেন, তাহাদিগের প্রত্যেকে খাওয়ার পরিমাণ এবং সময় সম্বন্ধে চিরকালই সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। আজকাল আমাদিগের খাইবার সময়ের কোনওরূপ নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় স্বাস্থ্য ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সুস্থ শরীরে থাকিতে হইলে সকালে একবার দিনের মধ্যভাগে একবার, অপরাহ্ণে অল্প একটু এবং রাত্রে শেষবার আহার গ্রহণ করা কর্তব্য। স্কুল কলেজে মধ্যাহ্ন ছুটির ব্যবস্থা করিয়া সকলের আহারের আয়োজন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষুধা না হইলে না খাওয়াই উচিত।

রোগ-বীজাণু (bacillus of a disease)

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, বিশেষ নিয়মের অধীন থাকিয়া আহার গ্রহণ করিতে থাকিলেও শরীর নানারূপ ব্যাধির আক্রমণে জর্জরিত হইয়া পড়ে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই সকল ব্যাধির প্রকৃত কারণ হইতেছে বিশিষ্ট প্রকারের রোগ বীজাণু। নিম্নে চিত্রে কতকগুলি বিভিন্ন রোগের বীজাণুর রূপ বড় করিয়া দেখান হইল।

ডিপথিরিয়া কলেরা প্লেগ টাইফয়েড

এই বীজাণুগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র জীবন্ত কণা। জীবের সাধারণ নিয়মানুযায়ী ইহারা আহার্য পাইলে বাড়িতে থাকে। দেহের মধ্যে উহাদের আহার্যের অভাব ঘটে না; তবে আহার্যের সহিত উহাদিগের শত্রু রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি দল বাঁধিয়া উহাদিগকে আক্রমণ করে এবং এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের উপর দেহের স্বাস্থ্য নির্ভর করিয়া থাকে। শ্বেত কণিকার জয় হইলে অবশেষে মানুষ পীড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়; কিন্তু বীজাণুর শক্তি অধিক হইলে যন্ত্রণা তো বাড়েই, অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যু আসিয়া যন্ত্রণা লাঘব করে। এই বিভিন্ন রোগ-বীজাণুগুলি আমাদের অজ্ঞাতে খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যের সহিত দেহে প্রবেশ করে এবং তথায় রক্ত-স্রোতে ঢুকিয়া মহা বিপদের সূচনা করে।

যে সকল রোগ এই বিভিন্ন রোগের বীজাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহারাই স্পর্শানুক্রমিক বা ছোঁয়াচে রোগ নামে অভিহিত। রোগীর সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকিলেও, অন্যভাবে এই রোগ-বীজাণুগুলি বাহিত হইয়া সুস্থ দেহকে আক্রমণ করে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি রোগের উল্লেখ করিতেছি।

টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক জ্বর অত্যন্ত ভীষণ রোগ। এই রোগের কারণ টাইফয়েড বীজাণু। এই বীজাণুগুলি সাধারণতঃ মাছি দ্বারা বাহিত হইয়া সুস্থ লোকের খাদ্যে এবং পানীয়ে ছড়াইয়া পড়ে। কোনও বস্তু ফুটন্ত পানি মধ্যে কিছুকাল বসাইয়া রাখিলে, উহার মধ্যে যাবতীয় রোগ-বীজাণু মরিয়া যায়। এই জন্য রন্ধন-করা খাদ্যে বীজাণু থাকে না, কিন্তু ঐ খাদ্য কোনও স্থানে খোলা অবস্থায় থাকিলে, মাছি আসিয়া তাহাকে অপবিত্র করে। এই জন্য মাছি মানবের প্রধান শত্রু। মাছির স্পর্শ হইতে যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য সযত্নে রক্ষা করা কর্তব্য। কলেরা রোগও স্পর্শানুক্রমিক। ইহার বীজাণুও মাছির দ্বারা বাহিত হইয়া আসিতে পারে। পানীয় জলের মধ্য দিয়াও টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত খোলা

পুষ্করিণীর পানি পান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এরূপ পানি ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া পান করা উচিত। ঢাকার ন্যায় বড় সহরের পানি, কলে আসিবার পূর্বে বীজাণু শূন্য হইয়া আসে। কিন্তু তবুও দেখা যায়, এই পানি সময় সময় পথিমধ্যে রোজ-বীজাণু দ্বারা দূষিত হইয়া ঢাকার স্থানবিশেষে নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। এরূপ ক্ষেত্রে পানীয় জল ফুটাইয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ। প্লেগ অথবা ডিপথিরিয়ার বীজাণুও মাছি প্রভৃতির দ্বারা বাহিত হইয়া সুস্থ দেহে বিপদ ঘটায়।

ম্যালেরিয়া রোগও বিশেষ রোগ-বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই বীজাণুর বাহক কিন্তু একরূপ বিশিষ্ট শ্রেণীর মশা, যাহাকে আমরা এনোফিলিস বলিয়া জানি। ম্যালেরিয়ার বীজাণু রোগীর রক্তমধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। এই সময় মশা রোগীকে কামড়াইয়া যে রক্ত গ্রহণ করে, তাহারই মধ্যে ম্যালেরিয়ার বীজাণু আসিয়া, মশক-দেহে অবস্থান করে; এবং ঐ মশাই পরে কোনও সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিলে রোগ-বীজাণু গিয়া সুস্থ ব্যক্তির রক্তে প্রবিষ্ট হয়। পরের কথা আর না বলিলেও চলে। মশাও এই জন্য মানবের ঘোরতর শত্রু। তাহাদিগকে একটি একটি করিয়া মারা অসম্ভব, এইজন্য উহার উৎপত্তিস্থান বাহির করিয়া, তথায় কেরোসিন ছড়াইলে সবগুলিই মারা যাইবে। কুইনিন এই রোগ-বীজাণুর পক্ষে বিষবৎ। এই জন্যই ইহা ম্যালেরিয়া রোগীকে সেবন করান হয়, এবং ইহার ইন্‌জেক্‌সন রক্তস্রোত মধ্যে ম্যালেরিয়া বীজাণুকে ধ্বংস করে। পীতজ্বরের বীজাণুগুলিও আর এক প্রকার মশা দ্বারা বাহিত হয়। এই জন্য সর্বদাই এই সকল ক্ষুদ্র শত্রু হইতে সাবধান থাকা কর্তব্য। মশারির ভিতর পরিষ্কার বিছানায় শয়ন করিলে ঐ সকল উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

যক্ষ্মার বীজাণু বাতাসে ভাসিয়া সুস্থ দেহকে আক্রমণ করে। উহারা বায়ুর সহিত দেহাভ্যন্তরে যাইয়া ফুস্‌ফুস্‌ গাত্রে স্থান লয়, এবং ক্রমে ফুস্‌ফুস্‌ বিদীর্ণ করিয়া দেহকে জর্জরিত করিয়া তোলে। ফুস্‌ফুস্‌ হইতে তখন রক্তস্রাব হয় এবং রোগীর জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ আসিয়া জুটে; এই ভীষণ ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এরূপ জায়গায় বাস করা দরকার, যেখানে প্রচুর পরিমাণে সূর্যালোক এবং প্রবহমান বায়ু রহিয়াছে। সূর্যরশ্মি এই বীজাণুর পরম-শত্রু, তাই রৌদ্র-স্নানে এই রোগ-বীজাণু নষ্ট হইয়া থাকে। বায়ু চলাচলের ফলে পুরাতন বীজাণুপূর্ণ বায়ু তাড়িত হইয়া নূতন বায়ু আগমন করে এবং রোগ-বীজাণুও দূরে সরিয়া যায়।

ভ্যাকসিন (vaccine)

এই সকল রোগের বীজাণু আবিষ্কৃত হইবার পর নানারূপ পরীক্ষায় নির্ণীত হইয়াছে যে, বসন্ত প্রভৃতি পীড়ার বীজাণু সুস্থ প্রাণীদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া, উহার দূষিত রক্ত হইতে একরূপ ভ্যাক্‌সিন প্রস্তুত হইতে পারে। উহাই সুস্থ দেহের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, সে রক্তে রোগের বীজাণুর সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি বাড়িয়া যায়; ফলে আর সুস্থ শরীরকে ঐ রোগ জীবাণু আসিয়া আক্রমণ করিলেও আহত করিতে পারে না। এই জ্ঞান লাভ করিবার পর সুবিখ্যাত রাসায়নিক পাস্তুর, সুস্থ মেষ-দেহে এনথ্রাক্‌স্‌ রোগ-

বীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহার রক্ত হইতে ঐ রোগের প্রতিষেধক সিরাম প্রস্তুত করেন। পরে এই সিরাম দ্বারা হাজার হাজার মেষ, এনথ্রাক্সের আক্রমণ এবং তৎফলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পায়। অধুনা ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের যে ইন্‌জেক্সন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাও এই একই মূলতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াই হইয়াছে। এই সকল পদার্থের আবিষ্কার ফলে কত লোক অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। নানা রোগের বীজাণু রক্তের রহিত মিশ্রিত হইবার জন্য সর্বদা উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। দেহের কোনও স্থান কাটিয়া গেলে তথায় এইরূপ বীজাণুবর্গ গমন করিয়া বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করে। এরূপ ক্ষেত্রে বীজাণু নষ্ট করিবার জন্য টিংচার আয়োডিন প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোনও স্থান কাটিয়া গেলে তথায় অল্প একটু আয়োডিন লাগাইতে ভুলিবে না। কারবলিক এসিড, বোরিক এসিড, প্রভৃতিও বীজাণুনাশক পদার্থ।

হরমোন (hormone)

এইস্থানে আর একটি কথা না বলিলে, দেহে রোগের আবির্ভাব সম্বন্ধে সব কিছু বলা হইবে না। দেহ-মধ্যে বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি নালীহীন গণ্ড বর্তমান; ইহা হইতেই একরূপ রস নিঃসৃত হইয়া দেহকে বিবিধ পীড়া হইতে রক্ষা করে। পাচক-গ্রন্থি হইতে পাচন-রস ব্যতীত আরও একটি পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, কখনও উহার অভাব ঘটিলে শরীরের শর্করা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগে না, তখন ইহার অনেক অংশ প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই রোগ বহুমূত্র (diabetes) নামে পরিচিত। এখন ডাক্তারেরা বহুমূত্র রোগে ইন্‌সুলিনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধরূপে ব্যবহার করেন।

বৃক্ক-যন্ত্রের উপরেই সুপ্রা-রেনাল গণ্ড হইতে এড্রিনেলিন নির্গত হইয়া দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এইরূপ গলগ্রন্থি হইতে থাইরক্সিন এবং মস্তিষ্ক নিম্নে অবস্থিত পিটুইটারী গণ্ড হইতে পিটুইট্রিন নির্গত হইয়া দেহ গঠনে সহায়তা করে। এই সকল গণ্ড-নিঃসৃত রস হরমোন নামে পরিচিত এবং ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি অধুনা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিয়া মানবের সাহায্যে নিযুক্ত করা হইতেছে। এই সকল পদার্থ ছাড়াও কত নূতন নূতন আশ্চর্যজনক পদার্থ মানবের সহায়তার জন্য রাসায়নিক নিত্য প্রস্তুত করিতেছেন, তাহার ইতিবৃত্ত যেমন বিস্ময়জনক, তেমনই মনোরম। সে সকল কথা তোমরা বড় হইয়া জানিতে পারিবে।